আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহমদী

The Ahmadi Fortnightly

জলসা বিশেষ সংখ্যা

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১৪-১৫তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২৫ রবি. সানি., ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ তবলিগ, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ঈসাব্দ

"শান্তি – এটাই হবে তাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের কাছ থেকে সাদর সম্ভাষণ"
[সূরা ইয়াসীন : ৫৯]

৯১তম সালানা জলসা ২০১৫ মুবারক হোক

জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের জন্য
হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

"যেসব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন, তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকালে তাঁর সে সব বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করুন, যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা-ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ-যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন!"

(মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃ-৩৪২)।

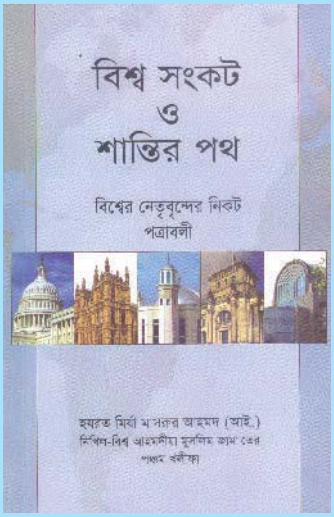

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯১তম জলসা সালানা ২০১৫ সফল হউক

আহমদীয়তের সত্যতার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু জলসা সালানা আহমদীয়তের সত্যতার এমন এক বাস্তব ও আন্তর্জাতিক নিদর্শন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এটা অস্বীকার করতে পারেন না। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে আহমদীয়তের ৭৫ জন বিদগ্ধ মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অজানা অচেনা নিভৃত এক জনপদ কাদিয়ান থেকে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিলো। এখন কেবল জলসা গাহে হাজার হাজার উপস্থিত পাগলপারা আহমদীদের মধ্যেই এ জলসা সীমাবদ্ধ নয়, MTA-এর সম্প্রচারে সারা বিশ্বের ২০৬টি দেশের কোটি কোটি মানব হৃদয়ের পিপাসা মেটাতে অমৃত সুধা বিতরণে সঞ্জীবিত ও বিমোহিত করে চলছে এ জলসা।

এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও রং-এর মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে উপস্থিত হলেও জলসায় মহা-মিলনের মোহনায় একাত্ম হয়ে থাকেন। সালানা জলসার এই যে মনোহারী রূপ তা আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্ তাআলা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ ***ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক*** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তাআলা এ জামা'তকে বাড়িয়ে চলছেন। জামাত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বক্ষেত্রে।

কাদিয়ানের বাইরে যে লোককে কেউ চিনতো না জানতো না ঐশী সুসংবাদসমূহ যথাসময়ে তাঁকে এতই ইজ্জত ও সম্মান দিয়ে চলছে যে কেবল উপমহাদেশেই নয় বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ২০৬টি রাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, *"আমার নিকট তো এ নিদর্শনই যথেষ্ট যে, এত-এত লোক এখানে আসে, যাদের প্রত্যেকে এক একটি নিদর্শন আর খোদা তাআলা এদের সকলকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছেন আর এসব সাহায্য ও সমর্থন যা কিনা আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা এসব ব্যাপারে আগেই আমাদের সাথে অঙ্গীকার করে রেখেছেন। কিন্তু যে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনাকারী হয় খোদা কখনও তাকে সাহায্য করেন না। বরং উল্টো ধ্বংসই করে দেন"* (মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, নবরূপে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮)।

তিনি (আ.) আরও বলেন, বারাহীনে লিখা রয়েছে ***"ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ওয়া ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক" এ নিদর্শনকে যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে স্বীয়স্থানে এটা দশ লক্ষ নিদর্শনের সমান প্রতিভাত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনিই নবাগত অতিথি হয়ে আসছেন তিনি এ নিদর্শন পুরো করে চলছেন। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে চিঠি পত্র আসছে, আসছে উপহার সামগ্রীও.... এত কিছুর পরও এটা কি কেবলই ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখবার বিষয় হতে পারে?'*** (মলফূযাত, ২য় খন্ড, নবরূপে মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৫৩২)। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় আমাদের দেশেও এ জলসা নিয়মিত হয়ে আসছে আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের সত্য-সাক্ষ্য প্রদান করে চলছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

৬, ৭ এবং ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শতাব্দির প্রথম জলসা, ইনশাআল্লাহ্। এটি বাংলাদেশের ৯১ তম জলসা সালানা। বরকতপূর্ণ এই জলসা সকলের অংশগ্রহণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আধ্যাত্মিক এক নব-উন্মেষের সূচনার কারণ হোক আর আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবনেও প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনুক।

জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলে আধ্যাত্মিক মিলনের সুমধুর শুধায় সঞ্জীবিত হোন।

মুবারক জলসায় সকলকে জানাই সুস্বাগতম।

সূচিপত্র

৩১ জানুয়ারি ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

৯১তম ন্যাশনাল সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর বাণী ৬

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ওয়াকফে জাদীদ সম্পর্কে প্রদত্ত ৯ই জানুয়ারি, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা** ৭

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮২, মসজিদ আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জলসা সংক্রান্ত **জুমুআর খুতবা** ১৬

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণ এবং এথেকে মুক্তির উপায়
মওলানা মুবাশ্বের আহমদ আইয়াজ ২২

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ২৮

জলসা সালানায় যোগদানকারী মেহমান ও মেজবানদের জন্য উপদেশ
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ৩১

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-প্রদত্ত ভাষণ ৩৪

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ৪১

ইসলাম ধর্মই হৃদয়কে জয় করবে
আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া ৪৪

দেশে দেশে সালানা জলসা ৪৫

মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-প্রদত্ত ভাষণ ৫৩

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে ইসলাম সম্মত নয়
মাহমুদ আহমদ সুমন ৬০

বার্ষিক সালানা জলসা ও আমাদের করণীয়
মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৬৩

কুরআন করীমের প্রভাব
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন ৬৮

উত্তম আদর্শই মানুষকে জীবিত রাখে
মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ৭১

ইবাদতই কল্যাণলাভের সহায়ক
মৌ. এনামুল হক রনি ৭৩

ইসলাম ও মানবাধিকার
সিবগাতুর রহমান ৭৫

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শৈশব কালের পাক-পবিত্র দিনগুলো
মৌ. লুৎফর রহমান ৭৭

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি দরবেশ তৈয়ব আলী
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৮০

স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল কিছু ঘটনা
সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত ৮২

পাঠক কলাম– ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব
ফারহানা মাহমুদ তন্বী, আনোয়ারা বেগম, লাকী আহমদ ৮৩

সংবাদ ৮৬

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৯৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হিজ্‌র-১৫

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। সে বললো, 'আমার মেয়েরা এখানে (রয়েছে)। তোমরা যদি কোন কিছু করতেই চাও (তবে এ বিষয়টি মনে রেখো)'।

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। (আল্লাহ্ ওহী করে বললেন,) তোমার জীবনের কসম! নিশ্চয় এরা নিজেদের উন্মত্ততায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এরপর সকাল হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আযাব এদের ধরে ফেললো।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٥﴾

৭৫। অতএব আমরা এ (শহরকে) লন্ডভন্ড করে দিলাম এবং এদের ওপর কঙ্করজাত পাথর বর্ষণ করলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। নিশ্চয় অনুসন্ধানীদের[১৫১৪] জন্য এ (ঘটনায়) রয়েছে অনেক নিদর্শন।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٧﴾

৭৭। আর এ (জনপদটি) নিশ্চয় এক স্থায়ী[১৫১৫] মহাসড়কের পাশে (অবস্থিত) রয়েছে।

১৫১৪। 'মুতাওয়াসসেমীন' মুতাওয়াস্‌সেমির বহু বচন। তাওয়াস্‌সামা মূল থেকে এর উৎপত্তি এবং এর অর্থ কোন ব্যক্তি কোন কিছু সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা-ভাবনা করে, এবং সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভের জন্য বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (আকরাব)।

১৫১৫। তখনই কোন রাস্তা 'মুকিম' বলে অভিহিত হয়, যখন তা পথচারীদের চলাচলের যোগ্য থাকে। এখানে ইঙ্গিতকৃত পথ, যা আরবকে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, তা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে এভাবে এ আয়াতে ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকাশ করেছে। এ পথ মৃত সাগরের বরাবর বা পাশাপাশি চলে গেছে, স্থানীয়ভাবে তা লূতের সাগর নামে পরিচিত।

হাদীস শরীফ

ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন, যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান, যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন।

এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী-আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায়, তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমার ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌না করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচ্‌না করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌না করছিল'।

আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না, তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না, তারা তা দেখে নি।'

তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচ্‌না করেছে, তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল, তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম, কিতবুয্ যিক্‌র)।

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল। তিনি বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।"

অমৃতবাণী

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন-

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামা'তে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে।

> **"এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।"**

আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

৯১তম ন্যাশনাল সালানা জলসা উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর বাণী

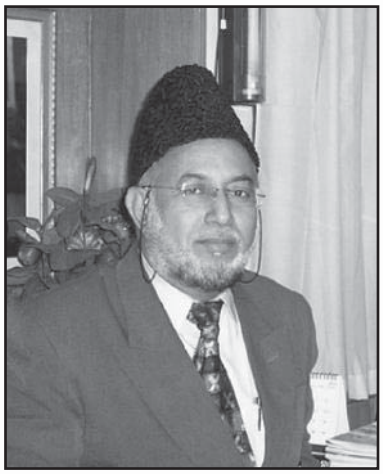

বাংলাদেশের দূর-দূরান্ত থেকে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সবুজ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাই-বোনেরা ও মেহমানবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেমে আপ্লুত হয়ে এখানে এসেছেন। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাদেরকে অবশ্যই তাঁর রহমতের ছায়ায় আবৃত রাখবেন, আর আপনাদেরকে তাঁর হেফাজতে রাখুন এটাই একান্ত কাম্য।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আধ্যাত্মিক চর্চার এক মিলন মেলার সূচনা করেছিলেন 'জলসা সালানা' নামে। কাদিয়ানের নিভৃত এক গ্রাম থেকে যে জলসা শুরু হয়েছিল, আজ সেই জলসার কার্যক্রম বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে হাজারো স্থানে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ লোক সমাগমে বিশেষ ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয় আসছে। এই জলসার প্রধানতম উদ্দেশ্য হল ইসলামের সত্যতাকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া। অনেক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রবর্তিত সালানা জলসাকে কেউ বন্ধ করতে পারে নি এবং ইনশাআল্লাহ পারবেও না। মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশও এক, দুই, তিন করে আজ ৯১তম সালানা জলসায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্! দিনের পর দিন এই জলসার পরিধি বেড়েই চলেছে। আগের থেকে অনেক বেশি লোক সমাগম হচ্ছে। আর আমরা আশা করি যে, এই সংখ্যা বাড়তেই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এই জলসায় মু'মিনগণের পারস্পরিক সাহচর্য লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা থাকে যা থেকে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারেন সহজেই। জলসায় যোগদানের ফলে সৎকাজের প্রতিযোগিতার প্রেরণা হৃদয়ে জাগে এবং একজন আরেকজনের চাইতে অধিক ইবাদত, অধিক কুরবানীতে উৎসাহিত হয়। পুরনো আহমদী বুযুর্গদের সাহচর্য লাভ করা যায় আর নতুন ভাইদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এই জলসার মাধ্যমে ঘটে।

জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দোয়া করেছেন– **"যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের ওপর দয়াপরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন যাদের ওপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারে স্থলাভিষিক্ত হোন। হে খোদা! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।"** (বিজ্ঞাপন: ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২) জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে দোয়া করেছেন মহান খোদা তা'লা তা কবুল করুন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা নিজ নিজ দেশের তথা সমাজের সবচেয়ে সুশীল নাগরিক। আপামর জনসাধারণের জন্য আমাদের রয়েছে সবচেয়ে বেশী সহানুভূতি ও ভালোবাসা এবং তাদের জন্য আমরা সবসময় দোয়া করি।

আমরা বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের শত বছর উদযাপন করছি, এর কার্যক্রম হিসাবে ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে নতুন মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং অনেকগুলোর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে। এসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার জন্য সবার কাছে দোয়ার আহ্বান করছি।

হযরত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যান্বেষী মেহমানরা এবং ৯১তম ন্যাশনাল সালানা জলসায় আগমনকারী সকলের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ্ যেন সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, তাদের দোয়া যেন কবুল হয়, তারা আরও অনেক বেশী বিনয়ী, আত্মসমর্পণকারী ও মু'মিন হিসাবে নিজ নিজ স্থানে মডেল হিসাবে পরিণত হয়। আর সকলেই যেন নিজেদের গন্তব্য স্থানে নিরাপদে ফেরৎ যেতে পারেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত সালানা জলসা বরকত মন্ডিত হোক এবং মহান আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে জয়যুক্ত করুন। যারা জলসা সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। সবাইকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অফুরন্ত ভালোবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান খোদা তা'লা সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং রহমতের ছায়ায় আবৃত রাখুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জুমুআর খুতবা

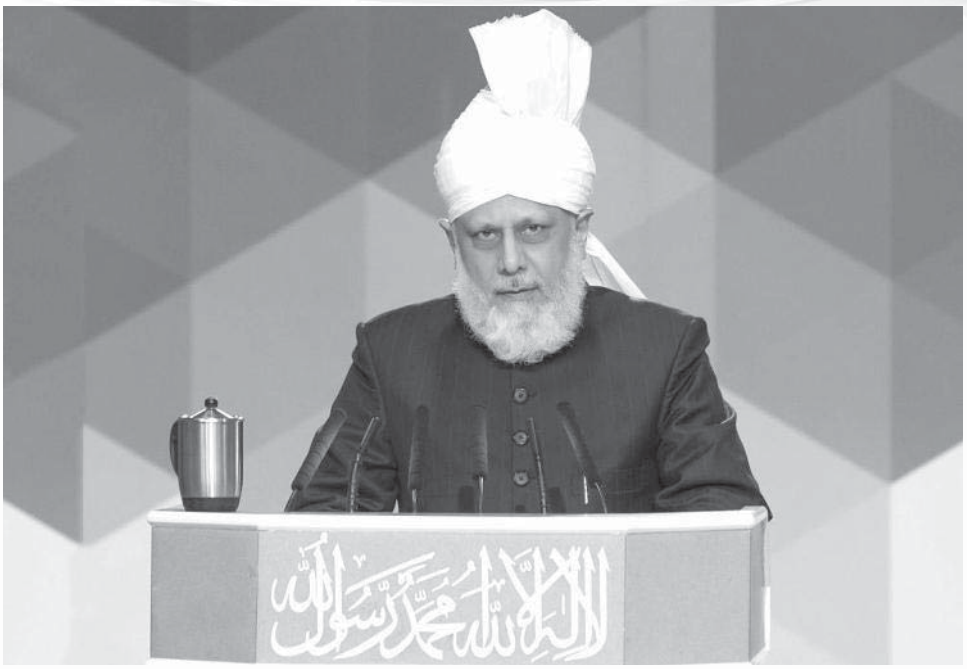

ওয়াকফে জাদীদ-এর নতুন বছরের ঘোষণা এবং আল্লাহ্‌র পথে খরচ

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ই জানুয়ারি, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

অনুবাদ: সুতরাং তোমরা সাধ্যানুসারে আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং শুন আর আনুগত্য কর এবং তাঁর পথে খরচ কর, এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যাদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয় তারাই সফলকাম হবে। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে উত্তম ঋণ প্রদান কর তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু। [সূরা আত্ তাগাবুন: ১৭-১৮]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছেন যে, তাক্বওয়া অবলম্বন কর আর পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন কর। আল্লাহ্‌র অগণিত নির্দেশের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা বা আর্থিক কুরবানী করা। তাই মু'মিনকে আর্থিক কুরবানী করার সময় কখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়, কেননা এই আর্থিক কুরবানী যা মু'মিনরা করে থাকে তা এক পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তই সেই জামা'ত যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, তাঁর খাতিরে মহান উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক কুরবানী করে থাকে এবং এই কুরবানীর একাগ্র বাসনা পোষণ করে। ইসলামের তবলীগ, মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ, বই-পুস্তক ছাপানো এবং প্রচার করা, কুরআন শরীফ মুদ্রণ এবং প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, মিশন হাউস নির্মাণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে রেডিও স্টেশন স্থাপন করা, যেখান থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার হয়ে থাকে, হাসপাতাল নির্মাণ এবং অন্যান্য মানবসেবা মূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

এককথায় এমনই আরও নানা ধরনের কাজ রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথেও সম্পর্ক রাখে। আজ পৃথিবীর মানচিত্রে কেবলমাত্র আহমদীয়া জামা'তই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এ কাজ করে যাচ্ছে। আর এটি এজন্য যে, আমরা যুগ ইমামকে মেনে এসব কাজের প্রকৃত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করেছি। আমরা সেই সকল লোক যারা হৃদয়ের কার্পণ্যকে পরিহার করে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার রীতি শিখেছি যারা 'মুফলেহুনদের' অন্তর্ভুক্ত। 'মুফলেহুন' এর অর্থ কেবল সফলতা বা সফলকাম নয় বরং এর অর্থ হলো, এমন মানুষ যাদের স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। এর অর্থে ব্যাপকতা রয়েছে। এর অর্থে সফলতার চেয়েও ব্যাপকতা রয়েছে আর তাহলো, তারা এমন মানুষ যারা স্বাচ্ছন্দ্য রাখে, যারা সাফল্য অর্জনকারী, যারা নিজেদের নেক বা পুণ্য বাসনা পূরণকারী, তারা এমন মানুষ যারা সুস্থ-সুন্দর জীবনের বাসনা রাখে, এমন জীবন যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে অতিবাহিত হয়, যাদের জীবন খোদা তা'লার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এসে যায়, যাদের স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়ে থাকে, চিরস্থায়ী হয়ে যায়, যারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রশান্তি লাভকারী, যাদের ওপর খোদার অনুগ্রহ এ পৃথিবীতেও এবং পরকালেও স্থায়ীভাবে বর্ষিত হতে থাকে।

অতএব যারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাফল্য লাভ করে তাদের সফলতা সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আমি যেমনটি বলেছি, এসব সাফল্যের গন্ডির কোন সীমা নেই। অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা এমন সফলতা লাভ করে। এরপর খোদার পথে আর্থিক কুরবানীকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এদের কাছে শুধু আর্থিক কুরবানীর দাবিই করা হচ্ছে না বরং এই কুরবানীকারী অর্থাৎ তোমরা (শোন)! এই খরচ বা আর্থিক কুরবানী হলো কুরবানীকারীদের সফলতার একটি মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা কারও ঋণ (ফেরত না দিয়ে) রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সকল আর্থিক কুরবানীকে এমন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং এমনভাবে মূল্যায়ন করেন যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে কোন 'করযায়ে হাসানা' দিয়েছ। আর যখন ঋণ পরিশোধের সময় আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা তা বর্ধিতরূপে ফেরত দেন। আর শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এই কুরবানীর কারণে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং শুধু পাপই ক্ষমা করবেন না বরং অধিক পুণ্য কর্মের তৌফিক দান করবেন।

সুতরাং খোদা তা'লা যে কীভাবে মূল্যায়ন করেন তা তোমরা ভাবতেও পার না। খোদার মূল্যায়নের বিষয়টি 'মুফলেহুন' শব্দের ব্যাখ্যায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান মানুষ যারা খোদার কৃপাবারী থেকে এভাবে কল্যাণ লাভ করে থাকে। আর আমি যেমনটি বলেছি, আজকের যুগে পৃথিবীর মানচিত্রে একমাত্র আহমদীরাই আল্লাহ্‌র পথে খরচের প্রকৃত মর্ম ও অর্থ বুঝে। আর এ কারণে কেবল আহমদীরাই এই কল্যাণবারী থেকে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে। এটি শুধু কোন ফাঁকা বুলি নয়, এমন শত-শত বরং সহস্র-সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় আমার সামনে আসে। যারা আর্থিক কুরবানী করে তারা নিজেরাই এসব বর্ণনা করেন বা লিখেন এবং এক গভীর ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার সাথে তারা এই আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। যদি এই আর্থিক কুরবানী বা খোদা তা'লার পথে খরচ করার প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ জানা না থাকে তবে এমন আন্তরিক উৎকণ্ঠার সাথে কে এভাবে অর্থ খরচ করতে পারে? আর শুধু এরাই নয় বরং এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যারা এই আর্থিক কুরবানীর অব্যবহিত পরে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বহুগুণ বর্ধিতরূপে তাদেরকে তা ফেরত দিয়ে থাকেন, সে সংক্রান্ত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও তারা অতিবাহিত হন। এরপর খোদা তা'লার এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের এত গভীর প্রভাব তাদের ওপর পড়ে যে, খোদার দেওয়া সেই বর্ধিত সম্পদকে তারা পুনরায় তাঁর রাস্তায় খরচ করে। আর এভাবে তারা আর্থিক দিক থেকেও উত্তরোত্তর খোদার কৃপাধন্য হতে থাকে আর অন্যান্য কল্যাণরাজী এবং সার্থকতাও তারা লাভ করে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আহমদীরা গভীর আবেগের সাথে বর্ণনা করেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর ফযল করেছেন,

আজকের যুগে পৃথিবীর মানচিত্রে একমাত্র আহমদীরাই আল্লাহ্‌র পথে খরচের প্রকৃত মর্ম ও অর্থ বুঝে। আর এ কারণে কেবল আহমদীরাই এই কল্যাণবারী থেকে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন।

কীভাবে তারা আর্থিক কুরবানীর সুযোগ পেয়েছেন আর কিরূপে আশাতীতভাবে তারা খোদা তা'লার কৃপাধন্য হয়েছেন। এমনই কিছু ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

বেনিন থেকে আমাদের জামা'তের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, কোতোনু শহরে এক বয়স্ক আহমদী বসবাস করেন যার নাম সালেমান সাহেব। তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। ডিসেম্বর মাসে বেনিনের জলসা সালানায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত বাবদ যে ১৫০০ সিফাহ্ খরচ হয় তা ব্যয়ের সামর্থ্যও তার ছিল না। জলসায় অংশগ্রহণের জন্য যখন তাকে বলা হয় এবং জোর দেয়া হয় তখন তিনি অনেক চেষ্টা করে একপথের খরচ জোগাড় করে জলসাগাহে পৌঁছেন কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। পরবর্তীতে এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তিনি জলসার পর ঘরে ফিরে আসেন। চার পাঁচ দিন পর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহকারীরা চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তার ঘরে যান এবং বলেন, আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার যে ওয়াদা করেছিলেন, এখনও এর কিছু বকেয়া আছে। সেই সালেমান সাহেব তখন সানন্দে তাদেরকে ঘরে স্বাগত জানান এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার কথা শুনে ঘরের ভেতরে যান আর ৬০০০ ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ এনে তাদের হাতে তুলে দেন। লেখক বলেন, তার সামর্থের নিরিখে এটি অনেক বড় অঙ্ক ছিল। তখন আমাদের মুহাস্‌সেল শহুদ সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, এত টাকা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, আপনি চাইলে আরো কম দিতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য কিছু বাসায় রেখে দিন। এটি আপনার জন্য সাধ্যাতীত অঙ্ক। তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে এ টাকা দিয়েছেন তখন তাঁর পথে কেন ব্যয় করব না। এটি আমার টাকা নয় বরং খোদা তা'লার আমানত। আমার কাছে তো জলসায় যাওয়ার মতোও কোন অর্থ ছিল না। বড় কষ্টে এক পথের খরচ জোগাড় করে গিয়েছিলাম। ফেরার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এতটাই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি সানন্দে তাঁর পথে এই টাকা খরচ করতে চাই। এরপর তিনি আরও বলেন, দু'দিন পর আপনারা পুনরায় আসুন, আমি আরও চাঁদা দিব এবং দু'দিন পর তিনি আরও দুই হাজার সিফাহ্ চাঁদা দেন।

এরপর তাঞ্জানিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের আহমদ মানৌফে সাহেব, যিনি নতুন বয়আতকারী, মাত্র দু'বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি বারবার একথা উল্লেখ করেছেন, আমি দেখেছি যে, আমরা ওয়াক্‌ফে জাদীদ বা তাহরীকে জাদীদ খাতে যা-ই খরচ করি না কেন আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত আকারে তা ফেরত দেন। আর জামা'তভুক্ত হওয়ার পূর্বে টাকা-পয়সা কোথায় যেত তা বুঝতেই পারতাম না। কিন্তু যখন থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি তখন থেকে হৃদয়ে এক প্রকার শান্তি পাই আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত।

এরপর বুরুন্ডির মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ লিখেন, সেখানে এক ব্যক্তি বসবাস করেন যার নাম হলো, আবু বকর সাহেব। অত্যন্ত দরিদ্র এক নতুন আহমদী। সামান্য বেতনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। নিজের পিতা-মাতাকেও সাহায্য করেন। তিনি বলেন, তার কাছে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহ করতে যাই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু চাঁদা দেন এবং বলেন, তার পিতা তিন মাস যাবত পায়ের ক্ষতের কারণে গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন। কবিরাজি চিকিৎসাও করিয়েছেন। এখন ডাক্তাররা তার পা কেটে ফেলার কথা ভাবছেন। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, দুই সপ্তাহ পর আবু বকর সাহেব জুমুআয় আসেন এবং সর্বপ্রথম নিজের ওয়াক্‌ফে জাদীদের অবশিষ্ট চাঁদা পরিশোধ করেন এবং অত্যন্ত বেদনা বিধুর শব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করে বলেন, যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের সামান্য চাঁদা দিয়েছিলাম, কিছু চাঁদা তিনি পূর্বেও দিয়েছিলেন, তখন এর ফলাফল যা পেয়েছি তাহল, আমি যেখানে কাজ করতাম সেখানে আমার মালিক আমার বেতন বাড়িয়ে দেন আর তার চেয়েও বড় লাভ যা হয়েছে তাহলো, আমার পিতা আরোগ্য লাভ করতে আরম্ভ করেন। ইতোপূর্বে তিনি লাঠির ওপর ভর করে হাঁটতেন। এখন লাঠি ছাড়াই হাঁটা শুরু করেছেন। আর এসবই চাঁদা দেয়ার কল্যাণ। এরপর তিনি বলেন, আমাকে আয় অনুপাতে চাঁদায়ে আম এর হিসাবও বলুন যেন আমি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করতে পারি।

এরপর তাঞ্জানিয়ার লিন্ডি অঞ্চল থেকে

সোলেমানী সাহেব নিজেই লিখেছেন, আমি একজন দোকানদার। গত বছর আমার ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমি তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর ওয়াদা কম হতে দেইনি এবং রমযানুল মুবারকেই নিজ ওয়াদার চেয়ে অনেক বেশি পরিশোধ করেছি যেন খলীফাতুল মসীহ্‌র দোয়ার ভাগী হতে পারি এবং এই লোকসান থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এতটাই ফযল করেছেন যে, তখন আমার একটি দোকান ছিল আর তাতেও লোকসান হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমার চাঁদায় এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন আমার দু'টো দোকান রয়েছে। খোদা তা'লা বলেন, তিনি কারও ঋণ রাখেন না বরং বহুগুণ বর্ধিত রূপে ফেরত দেন।

এরপর তাঞ্জানিয়া বাটওয়ারা অঞ্চলের আরেকজন নতুন বয়আতকারী শাংগোয়ে যোবায়রী সাহেব বলছেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু জামা'ত ছেড়ে দেই। স্থানীয় মুয়াল্লিমের প্রচেষ্টায় আমি পুনরায় জামাতে ফিরে আসি। যখন আমি জামা'তের ব্যবস্থাপনার বাইরে ছিলাম, বড় কষ্টে দিনাতিপাত হত। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ছিলাম। আমার কাছে একটি সাইকেল ছিল এবং ছোট একটি ব্যবসা ছিল, সাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করতে যেতাম। আর কখনও কখনও সারাদিনে কিছুই বিক্রি হতো না। কিন্তু যখন থেকে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়েছি, বিভিন্ন খাতে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি, স্বল্প সময়ের ভেতর আমার অর্থনৈতিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা দেয়ার কল্যাণে এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন আমি সাইকেলের পরিবর্তে মটরসাইকেল ক্রয় করেছি এবং পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে আছি।

এরপর কঙ্গোর ব্রাজবিল থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক দরিদ্র আহমদী বন্ধুর নাম হলো, আলিপা সাহেব যিনি শ্রমজীবি মানুষ। প্রত্যেক মাসে রীতিমত চাঁদা দেন। আমরা যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার ঘোষণা দেই, তিনি বলেন, আমার কাছে শুধু দুই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ ছিল আর কোথাও কাজও পাচ্ছিলাম না। আমি মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল পড়লাম। এই দরিদ্র শ্রমজীবি আহমদী বলেন, এরপর সেই দু'হাজার ফ্রাঙ্ক যা আমার কাছে ছিল তা চাঁদা হিসেবে সদর সাহেবের হাতে তুলে দেই। তিনি বলেন, সেদিনই সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি আমাকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ পাঠিয়ে দেয়, আসলে দীর্ঘদিন পূর্বে আমি তার কাজ করেছিলাম কিন্তু সে আমার পারিশ্রমিক আমাকে পরিশোধ করেনি; এটি সেই টাকা। তিনি বলেন, আমি মনে করি চাঁদার বরকতে আমাকে আমার পারিশ্রমিক ফেরত দিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাধ্য করেছেন। আর এইভাবে দশগুণ বর্ধিত রূপে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এরপর বেনিনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, সেখানকার এক আহমদীর নাম হলো, কান্ডে সাহেব যিনি গোগোরো জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তিনি সম্প্রতি বয়আত করেছেন এবং একই সাথে বিভিন্ন খাতে চাঁদা দেয়াও আরম্ভ করেন। তিনি নিজের ভেতর এক অসাধারণ পরিবর্তন অনুভব করেন। এবার যখন তার কাছ থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা নেওয়া হয় তখন তিনি সানন্দে চাঁদা দিতে গিয়ে বলেন, যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমার ব্যবসা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে আর আমার কাজে অসাধারণ বরকত দেখতে পাচ্ছি। আমি মনে করি এ সবকিছু আহমদীয়াত গ্রহণ এবং চাঁদা দেয়ারই কল্যাণ।

এরপর সিয়েরালিওনের কেনামা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব হাজী শেখু সাহেব সম্পর্কে বলেন, পূর্বে আমি আমার বাচ্চাদের পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা নিজেই দিয়ে দিতাম। কিন্তু এবার আমি আমার মেয়েকে বললাম, সে যেন নিজের ওয়াদা নিজেই লেখায় এবং নিজেই যেন তা নিজের হাতখরচ থেকে পরিশোধ করে। সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ সাহেব যখন চাঁদার ওয়াদা নেয়ার জন্য যান, তখন ডক্টর হাজী শেখু সাহেব নিজের মেয়েকে বলেন, তোমার ওয়াদা লেখাও। তখন সেই মেয়ে বলে, সে দশ হাজার লিওন চাঁদা দেবে। ডক্টর সাহেব বলেন, আমার ধারণা ছিল সে হয়তো তিন চার হাজার লিওন লেখাবে। আমার মেয়ে যখন দশ হাজার লিওন বলল তখন তার মা বলে, এত টাকা তুমি কোত্থেকে দিবে। ডক্টর সাহেব স্ত্রীকে বলেন, তুমি চুপ থাক। সে যখন নিজের ইচ্ছায় লিখিয়েছে তাকে লেখাতে দাও। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই ডক্টর সাহেবের কিছু আত্মীয় স্বজন দেখা করতে আসেন এবং ফেরত যাওয়ার সময় তারা সেই মেয়েকে পনের হাজার লিওন (তোহফা) দেয়। সেই মেয়ে তখনই ডক্টর সাহেবকে দশ হাজার লিওন দিয়ে বলে যে, এই হলো আমার ওয়াদাকৃত চাঁদা।

এমন সুদূর মফস্বলে বসবাসকারী আহমদীদেরকেও এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা অশেষ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং তারা চাঁদার গুরুত্বকে অনুধাবন করে। তাদের হৃদয়ে এই প্রেরণা কে সঞ্চার করে? নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই বস্তু জগতের অন্ধরা এটি দেখতে পায় না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। একথাও স্মরণ রাখবেন, নবাগতরা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় খুব দ্রুত উন্নতি করছে। পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার যে চেতনা সেদিকে পুরোনো আহমদী এবং পুরোনো পরিবারগুলোরও মনোযোগী হওয়া উচিৎ এবং খুবই সচেতনতার সাথে তা করা উচিৎ।

এরপর আমাদের কিনশাসার মুবাল্লিগ লিখেন, সেখানকার এক আহমদী বন্ধুর নাম হলো, ইব্রাহীম সাহেব। তিনি গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং কোন লাভ হতো না। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। চাঁদার কল্যাণে তার ব্যবসা ক্রমশঃ উন্নতি করতে থাকে। তিনি একথা স্বীকার করেন যে, এ সব উন্নতি সেই আর্থিক কুরবানীরই ফসল যা জামা'তভুক্ত হওয়ার পর তিনি করেছেন।

কঙ্গো কিনশাসারই মুবাল্লিগ সাহেব বাকুঙ্গু প্রদেশ থেকে লিখেন, মুবানযা গোঙ্গু জামা'তের মুস্তফা সাহেব এ বছর রমযানে বয়আত করেছেন। এরই মাঝে তার বোন যিনি খ্রীষ্টান ছিলেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার চিকিৎসার জন্য বেশ মোটা অঙ্ক খরচ হতে থাকে। একই মাসে তিনি যখন মসজিদে আর্থিক কুরবানির তাহরীক শুনেন তখন চাঁদা দেন আর নিজের বোনের পক্ষ থেকেও তার রোগ নিরাময়ের জন্য দোয়ার অনুরোধ করে চাঁদা প্রদান করেন। এরপর তার বোন সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি স্বয়ং বলেন, এসব কিছুই সেই আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'লার পথে করেছি।

এরপর মালির আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, সেখানকার এক আহমদী মোহাম্মদ জারা সাহেব জামা'তী চাঁদা দেয়ার পূর্বে খুবই

অসচ্ছল ছিলেন। যখন থেকে তিনি জামা'তী চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছেন তার দারিদ্র্য দূর হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় মালিতে এখন অনেকেই বড় উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানী করছেন। কিছুকাল পূর্বে এক যুবক দাউদ সালেফ সাহেব যিনি এক দরিদ্র মিস্ত্রী। প্রথম দিকে তিনি সপ্তাহে এক হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। তার কাজ এবং আন্তরিকতায় এত উন্নতি হয় যে, কিছুদিন পূর্বে তিনি এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা আদায় করেন যা প্রায় দুই শত দুই পাউন্ডের সমান।

নতুন বয়আতকারীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় চাঁদা দেয়ার আন্তরিকতা এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় আন্তরিকতার সাথে তারা চাঁদা দিচ্ছে। একইভাবে জামা'তের আরেক নিষ্ঠাবান বন্ধুর নাম হলো, আফানা সাহেব। প্রত্যেক মাসে তিনি প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় দুই শত পাউন্ড চাঁদা দেন। সেই সকল দরিদ্র দেশসমূহের নিরিখে এগুলো অনেক বড় অঙ্ক। এছাড়াও তিনি প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় তিন শত ত্রিশ পাউন্ড যাকাত খাতেও প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমান এবং বিশ্বাসে উন্নতি করছেন।

ভারতের কাশ্মিরের ইন্সপেক্টর মাল সাহেব লিখেছেন, সম্প্রতি কাশ্মিরে যে বন্যা আঘাত হানে তার ফলে শ্রীনগরের প্রায় সকল আহমদী ঘর প্রভাবিত হয়। সেপ্টেম্বরের বন্যায় এত পানি আসে যে, দোতলা ঘর পর্যন্ত বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি যখন শ্রীনগর জামাতে সফরে যাই তখন চিন্তিত ছিলাম যে, এবার হয়তো শ্রীনগর জামা'তের চাঁদা একশত ভাগ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না কেননা, পরিস্থিতির কারণে মানুষ নিজেদের ঘরের ছাদে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের সম্পূর্ণ ঘর কাদা-পানিতে ভরে গিয়েছিল আর সব ঘরেরই অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, কোন ঘরে গিয়েই একথা বলার সাহস পেতাম না যে, চাঁদার জন্য এসেছি। তিনি বলেন, আমাকে দেখে সদস্যরা নিজ থেকেই চাঁদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং আমি এতে আশ্চর্যান্বিত হই, তারা সানন্দে নিজেদের অবশিষ্ট চাঁদা আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর এত কষ্ট সত্ত্বেও তাদের ভ্রুকুঞ্চিত করতে দেখিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামা'তে আহমদীয়া শ্রীনগরের চাঁদা পুরোপুরি সংগৃহীত হয়। এ দৃশ্য দেখে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের (রা.) কথা মনে পড়ে, যাদের কাছে খাওয়ার মতো কিছু না থাকলেও কুরবানীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা অগ্রসরমান থাকতেন। সত্যিকার অর্থে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এই প্রিয় জামা'তকে দেখেও আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়।

বেনিন থেকে আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী রীতিমত এই মানসে চাঁদা দিতেন যে, খোদা তা'লা যেন তার পরিবারের সদস্যদের আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। তিনি আহমদী হয়েছিলেন কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা আহমদী ছিল না। তিনি নিজেই বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আমার পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এ স্বপ্নের মাধ্যমে আমি তাদেরকে তবলীগ করার প্রেরণা পাই। পূর্বে তবলীগ করতেন না কিন্তু স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি তাদের তবলীগ করা শুরু করেন। তিনি বলেন, তাই আমি তাদেরকে তবলীগ করা আরম্ভ করি আর একই সাথে এই উদ্দেশ্যেও বিশেষভাবে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি, আজ আমি এ কথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, আমার পুরো পরিবার আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এটি ধর্মের পথে আর্থিক কুরবানীর কারণেই সম্ভব হয়েছে।

বেনিনের মোগোরো গ্রামের এক ভদ্রমহিলার নাম শাবিল সাহেবা। তিনি বলেন, গত বছর আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি যে কাজ বা ব্যবসাই শুরু করতাম তাতে লোকসান হতো এবং কোন কাজই লাভজনক হতো না। একদিন মুয়াল্লিম সাহেব আমাকে সততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করার এবং রীতিমত চাঁদা দেয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা! এটিও করে দেখি, সততার সাথে যে আয় হয় সেই অনুসারে চাঁদা দিয়ে কি লাভ হয়। তিনি বলেন, যখন থেকে রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আমার ব্যবসা উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। ঘরে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। আমার সকল কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি তাঁর পথে খরচকারীদেরকে ব্যাপক দানে ভূষিত করেন।

এরপর ভারত থেকেই ইন্সপেক্টর কামরুদ্দিন সাহেব বলেন, কেরালা প্রদেশে আর্থিক বছরের প্রথম দিকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেট লেখানোর জন্য একটি জামাতে যাই, সেখানে ২৬ বছর বয়স্ক এক যুবকের সাথে সাক্ষাত হয়। সেই যুবক বলেন, আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে পড়াশোনা সম্পন্ন করেছি এবং আমার পিতার সাথে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বোঝানো হলে তখনই সেই যুবক দুই লক্ষ রূপী বাজেট লিখান এবং বলেন, এখনই ব্যবসা আরম্ভ করেছি, আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কোথা থেকে এই ওয়াদা পূরণ হবে। তিনি আমাকেও চিঠি লিখেছেন এবং সেই যুবককেও বলেছেন, হুযূরকে দোয়ার জন্য লিখুন। অতঃপর ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, দ্বিতীয় বার আমি যখন চাঁদা সংগ্রহের জন্য সেখানে যাই, সেই যুবক পরম আনন্দের সাথে জানান, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বেশ কিছু ব্যাংক থেকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ পেয়েছি যার কারণে আয়-রোজগারে অনেক বরকত হয়েছে। আর সেই মুহূর্তেই তিনি তার ওয়াদাকৃত দুই লক্ষ রূপীর পুরো অর্থ প্রদান করেন।

এরপর ভারত থেকেই ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর নায়েব নাযেম মাল সাহেব লিখেছেন, উত্তর প্রদেশে চাঁদা সংক্রান্ত সফরের সময় মুহাম্মদ ফরিদ আনোয়ার সাহেব যিনি কানপুরের সেক্রেটারী মাল, তার সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তার ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা পুরোটাই দিয়ে দেন এবং একইসাথে রাতে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। রাতে তার ঘরে পৌঁছলে তিনি বলেন, তার আট বছর বয়স্কা মেয়ে দু'দিন যাবত এই অধমের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই মেয়ের নাম হলো, সাজ্জিলা। সে তখন ঘরের ভেতর যায় এবং কিছুক্ষণ পর একটা থলি হাতে ঘরের বাইরে আসে। তা এই অধমের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলে, আমি পুরো বছর চাঁদা দেয়ার জন্য এতে রূপী জমিয়েছি। আপনি এ থেকে সব টাকা বের করে নিন এবং আমাকে রশিদ দিন। তাতে সাতশত পঁয়ত্রিশ রূপী ছিল। তিনি বলেন, এটি দেখে আমি খুবই অবাক হই, একটি আট বছর বয়স্কা মেয়ে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে সে তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত, নিজের ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর ওয়াদা নিজেই লিখিয়ে সেই ওয়াদার চেয়ে বেশি পরিশোধ করেছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, বাচ্চাদের ভেতর এই

যে প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে তা কে সৃষ্টি করতে পারে? কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই শিশুদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা যোগান। কিন্তু পিতা-মাতারও দায়িত্ব হবে, ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখা এবং সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে অন্যান্য নেকী যেমন, ইবাদত ইত্যাদির পাশাপাশি চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কেও তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বোঝানো এবং তাদের হৃদয়ে তা গ্রথিত করে দেয়া। এমন ঘটনাবলীও ঘটেছে যে, বাচ্চারা চাঁদা নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, আপনার আব্বা আপনার পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। তখন সেই বাচ্চারা উত্তরে বলে যে, আব্বা যা দিয়েছেন তার সওয়াব তো তার হবে। আমরাতো আমাদের হাতখরচ থেকে নিজেরাই চাঁদা দিব।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, এক বন্ধুকে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমার কাছে এখন যত টাকা আছে তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। ঘরের সদস্যরা বলে, কিছু তো রেখে দাও। সংসার খরচ কীভাবে চলবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদার ওয়াদা আমি আগেই করেছি। এটি আমাকে অবশ্যই দিতে হবে। ঘরের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই করবেন। তিনি লিখেন, পরবর্তী মাসে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে তিনি একটি চিঠি পান যে, আপনার মেডিকেলের রিপোর্ট দেখে আমরা আপনাকে দুই বছরের খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর সে মোতাবেক তারা তিন মাসের টাকাও এর সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। সেই টাকা পাওয়ার পর আমি দেখলাম যে, তা সেই অঙ্কের একশত গুণ বেশি যা ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে আমি প্রদান করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আর্থিক কুরবানীর ফসল এক মাসের মধ্যেই তাকে ফেরত দেন।

যুক্তরাজ্যের ওয়াক্‌ফে জাদীদের লাজনার সেক্রেটারী বলেন, এখানকার এক হালকার ওয়াক্‌ফে জাদীদ সেক্রেটারী তাকে বলেন, এক ভদ্রমহিলা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল, চাঁদা দিতে পারতেন না, তারপরও সর্বনিম্ন যতটা সম্ভব ছিল তিনি তা-ই ওয়াদা লিখিয়েছেন। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, ওয়াদা লেখানোর পর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে ওয়াদা রক্ষার সামর্থ লাভের জন্য দোয়া আরম্ভ করেন। সেই ভদ্রমহিলা সেলাইয়ের কাজ জানতেন। অতএব কয়েকদিনের ভেতর তিনি সেলাই এর অর্ডার পেতে থাকেন। এরপর তিনি শুধু নিজের ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়ের যোগ্যতাই অর্জন করেননি বরং তার চেয়েও অনেক বেশি আয় হয়। তাই তিনি তার ওয়াদার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। এখানে এটিও উল্লেখ করছি যে, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদ উভয় খাতে ইউকে'র লাজনা ইমাইল্লাহ্ শুধু নিজেদের টার্গেটই পূর্ণ করেনি বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যা ওয়াদা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি তারা আদায় করেছে।

বেনিনের আমীর সাহেব লিখেন, বেনিনের উত্তরে এবং কেন্দ্রীয় বেনিনে বড় সংখ্যায় ফুলানী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। বিগত বছরগুলোতে এই গোত্রের লোকেরাও বয়আত করেছিল। এই গোত্রের তিনটি গ্রাম এলাকার মৌলভীদের বিরোধিতা এবং ভয়াবহ চাপের কারণে বয়আত করার কিছুদিন পরই পিছিয়ে যায়। বুরকিনাফাঁসো থেকে ফুলানী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মুয়াল্লিমকে বেনিনে পাঠানো হয়, যেন তিনি সেই এলাকায় যোগাযোগ করে তাদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করেন। সুতরাং তিনি এক মাস সেই অঞ্চলে কাজ করেন আর এই তিনটি গ্রামই আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পুনরায় জামা'তভুক্ত হয়। আর তাদের ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করে। এই তিনটি গ্রামের আহমদীরা নিজেরাই একটি বড় অঙ্ক পরিবহন খাতে ব্যয় করে বাসযোগে বেনিনের জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। জলসার পর নিজ-নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরই জামা'তের মুয়াল্লিম সাহেব তাদের গ্রামে যান এবং আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলেন যে, আমি বলেছি, নতুন বয়আতকারীদের কাছ থেকে যৎসামান্য নিয়ে হলেও তাদের আর্থিক কুরবানীতে অভ্যস্ত করুন। এখন ডিসেম্বর মাস আর এটি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধের শেষ মাস। তিনি বলেন, যদিও জলসার জন্য পরিবহন খাতে তারা অনেক টাকা ব্যয় করেছিলেন আর আর্থিক দৈন্যতা তো ছিলই, কিন্তু ঈমানী চেতনায় তারা এতটাই উজ্জীবিত ছিলেন যে, এই কথা শোনার সাথে সাথে এই তিনটি গ্রামের প্রত্যেক সদস্য ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতেও চাঁদা দেন। আর এভাবে এই গোত্রে, এরইমাঝে এক হাজারের কাছাকাছি নতুন বয়আতও হয়।

অতএব এই হলো আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত কিছু ঘটনা যে, কীভাবে উচ্ছাস ও পরম আন্তরিকতার সাথে মানুষ চাঁদা দেয়। আর অনেক ঘটনার মাঝে আমরা এটিও দেখেছি যে, খোদা তা'লা কীভাবে বহুগুণ বর্ধিত আকারে তা ফেরত দেন। অতএব খোদা তা'লা সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা। এই সমস্ত ঘটনাদৃষ্টে একদিকে যেখানে খোদার কালাম বা বাণীর সত্যতা প্রকাশ পায় আর স্বয়ং আমাদেরও অভিজ্ঞতা অর্জন হয় সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সাথে, তা পৃথিবীর যেই দেশেই হোক না কেন, ঐশী সমর্থনের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। আমি পূর্বেও অর্থাৎ বিগত বছরগুলোতে বলেছি যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের এই তাহরীক হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তানের বাইরের দেশসমূহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছিলেন, বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ভারতের চাহিদা মেটানোর জন্য। পূর্বে এই খাতে চাঁদা দেয়ার জন্য পাকিস্তানের বাইরের দেশগুলোর ওপর এতটা জোর দেয়া হতো না। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো বা সম্পদশালী দেশগুলো এই খাতে যে চাঁদা দেয় তা আফ্রিকায় ব্যয় হয়।

এখন আমি আপনাদের সামনে কিছুটা পরিসংখ্যান তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বর্তমানে আফ্রিকার ১৮টি দেশে ৯৫টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। আর অনেক বড় বড় মসজিদও নির্মিত হচ্ছে কেননা, সেখানে সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তবলীগেরও নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, যেখানেই ইসলামকে পরিচিত করাতে চাও, তবলীগ করতে চাও, মসজিদ বানিয়ে দাও। আফ্রিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই কাজ চলছে। আফ্রিকা সহ মোট ২৫টি দেশে, অর্থাৎ আরও ৭টি দেশ রয়েছে যেখানে এই বছর ২০৪টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। একইভাবে ১৮৪টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আফ্রিকান দেশসমূহে ব্যয় হয়। যদিও আফ্রিকান আহমদীরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক বড় আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। কিন্তু তাদের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাছে আর সেখানে বয়আতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়আতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নবাগতদের অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ার কারণে তারা পুরোপুরি নিজেদের

ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য রাখে না। তারা অবশ্যই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তারা যে কীভাবে কুরবানী করছেন তা ঘটনাবলীতে বর্ণীত হয়েছে। সেখানে মুখালেফাতের ঘটনাও ঘটে থাকে। দু'টো ঘটনা আমি এমনও বলেছিলাম যে, বিরোধীরা নতুন বয়আতকারীদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে জামা'ত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। অনেক দুর্বল মানুষও থাকে যারা পেছনে সরে যায়। কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে এমন দৃঢ় আহমদীরাও আছে যারা কোন কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করে না।

যাহোক জামা'তগুলোর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের জন্য আমি বলেছিলাম, বয়আত করানোর পর নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন আর তা উত্তরোত্তর আরও দৃঢ় করুন। সেখানে বারবার যান যেন তরবীয়তি বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের তরবীয়ত হতে থাকে। আফ্রিকান দেশগুলোতে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলও আছে যেখানে জঙ্গল অতিক্রম করে যেতে হয়। সেসব এলাকায় নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না বা বড় কষ্টে সেখানে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই কারণে দীর্ঘদিন জামা'তগুলোর সাথে বা নতুন আহমদীদের সাথে যোগাযোগ থাকে না। তাছাড়া মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদেরও ঘাটতি রয়েছে। কষ্ট করে হলেও যদি তারা বারবার যান তাহলে যোগাযোগ রক্ষা হতে পারে কিন্তু সংখ্যা যেহেতু কম তাই সবসময় যাওয়াও সম্ভব হয় না।

তাই যেমনটি আমি বলেছি, অনেক বয়আত এমনও আছে যা হারিয়ে যায়। তাই আমাদেরকে, জামা'ত সমূহকে, বিশেষ করে সেই সকল দেশের জামা'তগুলোর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ, অন্ততঃপক্ষে প্রথমে এক বছর এদিকে গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। এই উদ্দেশ্যে খিলাফতের প্রথম বছরেই আমি জামা'তগুলোকে বলেছিলাম, অগণিত বয়আত আমাদের নষ্ট হচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে যে সকল বয়আত হয়েছে অর্থাৎ পুরনো বয়আতের শতকরা সত্তর ভাগ যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনুন। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামা'তগুলো চেষ্টাও করেছে; বিশেষ করে আফ্রিকায়। আর যখন পুনরায় যোগাযোগ করা হয় তখন সেই সকল বয়আতকারীরা অনুযোগ করে যে, তোমরা বয়আত করানোর পর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তারা আন্তরিকভাবে আহমদী হয়েছিল কিন্তু আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে জানতো না। তরবীয়তের ঘাটতি ছিল।

যাহোক আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় লক্ষ-লক্ষ এমন আহমদীর সাথে যোগাযোগ বহাল হয়েছে এবং তারা ফিরে এসেছেন এবং তাদের তরবীয়তের জন্য এখন সক্রিয় সিস্টেমের সূচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যোগাযোগ পুনর্বহালের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে ঘানা। এরপর নাইজেরিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এবং যথাক্রমে আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ রয়েছে। তাঞ্জানিয়ায় এই বিষয়ে অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাদেরও অনেক চেষ্টা করা উচিৎ, তাদের সাথে যোগাযোগ বহাল করা উচিত; কেননা বলা হয়, সেখানেও একযুগে অনেক বয়আত হয়েছিল। তাদের সবাইকে খুঁজে বের করুন। ইউরোপে প্রায় বিশ বছর পূর্বে বা তারও অধিককাল পূর্বে, বসনিয়ার রাজনৈতিক সংকটের সময় জার্মানীতে প্রচুর বসনিয়ান শরণার্থী এসেছিল। বলা হয় যে, তাদের মাঝে প্রায় এক লক্ষের মত বসনিয়ান বয়আত করেছিল। কিন্তু তারা স্ব স্ব দেশে ফিরে যাওয়ার পর তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর আর জানা যায়নি যে, তারা কোথায়। এই দৃষ্টিকোন থেকে এসব দেশেও যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও বলা হয় যে, এক সময় অনেক বয়আত হয়েছিল। তাই সেখানেও সন্ধান করা প্রয়োজন।

যদি নতুন বয়আতকারীদের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে যোগাযোগও বহাল থাকে এবং ঈমানের দৃঢ়তার পাশাপাশি জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথেও তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই আমি বলেছিলাম, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার খাতে নবাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। পুরোনদের মাঝেও চেতনাবোধ জাগ্রত করুন। অনেক জামা'ত এক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গায় শৈথিল্যও রয়েছে। আমি তো বলেছিলাম, কেউ যদি বছরে দশ-বিশ টাকাও দেয় তাহলে তার কাছ থেকে তাই নিন। অন্ততঃপক্ষে এর মাধ্যমে জামা'তের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সবার জানা থাকা উচিৎ, আমাদেরকে আর্থিক

এ দিনগুলোতে দরুদ শরীফ অজস্র ধারায় পাঠের প্রতি মনোযোগী হোন। আর নিজ নিজ গন্ডিতে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যারা ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে পারে তাদেরও তা নেয়া উচিৎ।

কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আর্থিক কুরবানীকারীদের সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যতটা হওয়া উচিৎ ততটা হচ্ছেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দাতার সংখ্যা ৮৫,০০০ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্ এটি নিঃসন্দেহে জামা'তের উন্নতির একটি মাপকাঠি, প্রতি বছর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে জামা'ত উন্নতি করছে এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যদি চেষ্টা করা হতো আর এ বছর যারা বয়আত করেছে তাদের মাঝ থেকে সাবালকদের শতকরা ২০ ভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হতো তাহলে বয়আতের দৃষ্টিকোন থেকেই এক লক্ষ দশ হাজারের অধিক চাঁদা দাতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।

আল্লাহ্‌র ফযলে নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এতে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। আগামী বছর সদস্যদের চাঁদাদাতাদের তালিকায় অন্তর্ভক্ত করার টার্গেট নতুনভাবে ওকালতে মালের মাধ্যমে সবাইকে দেয়া হবে। এদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ এবং কৃপায় ব্যয়ভার কীভাবে নির্বাহ হবে বা পূরণ হবে তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা পূর্ণ করবেন কেননা, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। আমাদেরকে আরও অধিক হারে নিজেদের মাঝে কুরবানীর চেতনায় সমৃদ্ধ লোক সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীদের দোয়াও করা উচিৎ এবং একইসাথে চেষ্টাও করা উচিৎ। আর অন্যান্য সাধারণ আহমদীদেরও কাজ হবে যোগাযোগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যারা পবিত্র স্বভাবের অধিকারী আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করতে চান তারা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ফিরে আসবে। আর দুর্বলরা যদি দূরে সরেও গিয়ে থাকে তবু তাদের প্রতিও অবশ্যই আমাদের সহানুভূতি রয়েছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লার একটি পুরস্কার লাভ করার পর তারা তা হারিয়ে বসেছে। কিন্তু নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও সংখ্যার তুলনায় নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ঈমানে সমৃদ্ধ নিষ্ঠাবানদের বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এমন নিষ্ঠাবান জামা'তের ভেতর সৃষ্টি হওয়া উচিৎ।

অতএব নতুন বয়আতকারী এবং পুরোনো আহমদীদেরও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে মানোন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিষ্ঠা এবং ইখলাসের পরিচয় বহন করে এবং এথেকে তাদের আন্তরিকতার মান কেমন তা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু জামা'তী ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমকেও হারিয়ে যাওয়া লোকদের খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিৎ। ভারতেও আমি যেমনটি বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে অনেক বয়আত হয়েছিল। তাদেরকে খুঁজে বের করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিৎ যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা তাদের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ সামনে আসে। আর আগামী দিনের জন্য এসব দুর্বলতাকে দৃষ্টিতে রেখে পুনরায় তবলীগ এবং তরবীয়তের নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করা উচিৎ, যারা জামা'তভুক্ত হয় তারা যত দূরেই থাকুক না কেন তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যেন সম্ভব হয়। যোগাযোগ একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তগুলোকে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন।

জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুমুআয় ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর নববর্ষের ঘোষণা হয়ে থাকে সেই রীতি অনুসারে এখন আমি এর ঘোষণা দিচ্ছি এবং বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যানও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫৭তম বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাধন্য হয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারী থেকে ৫৮তম বছরের সূচনা হয়েছে। বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে ৬২লক্ষ ৯হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় ৭লক্ষ ৩১হাজার পাউন্ড বেশি। আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

পাকিস্তান তালিকার শীর্ষে আছে। গত বছর যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে ছিল। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, এরপর আমেরিকা, তারপর জার্মানী, এরপর যথাক্রমে কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও মাশাআল্লাহ্ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, এরপর দুবাই, বেলজিয়াম এবং এরপর একটি আরব দেশ রয়েছে।

মুদ্রার দৃষ্টিকোন থেকে যেমনটি আমি বলেছি, অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। তারা শতকরা ১২৩ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। কানাডা শতকরা ২১ ভাগ। এরপর ভারত শতকরা ১৬ বা প্রায় ১৭ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে।

মাথাপিছু চাঁদা আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে, তারা মাথাপিছু ৭৭ পাউন্ড আদায় করেছে। সুইজারল্যান্ড ৫৯, যুক্তরাজ্য ৫১, অস্ট্রেলিয়া ৫৬, এরপর যথাক্রমে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, কানাডা এবং জার্মানী রয়েছে। এই বড় জামা'তগুলোর ভেতর জার্মানী সবার শেষে আছে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ১১লক্ষ ২৯হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে মালী, বেনিন, নাইজার, বুরকিনাফাঁসো, গাম্বিয়া এবং ক্যামেরুনের জামা'তগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোট সংগ্রহের দিক থেকে আফ্রিকায় ঘানা সর্বাগ্রে রয়েছে, এরপর নাইজেরিয়া, তারপর রয়েছে মরিশাস।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্ক ও আতফালদের পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাবালকদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো, লাহোর, ২য় রাবওয়া এবং তৃতীয় হলো করাচি। জেলা ভিত্তিক অবস্থানের দিক থেকে রাওয়ালপিন্ডি প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, সারগোদা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, ওমরকোট, মুলতান, হায়দ্রাবাদ, ভাওয়ালপুর এবং পেশাওয়ার।

আতফালের তিনটি বড় জামা'ত হলো, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় করাচি এবং তৃতীয় রাবওয়া। আতফালের সংখ্যার দিক থেকে জেলাগুলোর অবস্থান হলো, যথাক্রমে শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, সারগোদা, গুজরানওয়ালা, নারোওয়াল, গুজরাত, ওমরকোট, হায়দ্রাবাদ ডেরাগাজীখান।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ইংল্যান্ডের দশটি বড় জামা'ত হলো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট, রেইনয্ পার্ক, মসজিদ ফযল, জিলিং হাম, ওস্টার পার্ক, বার্মিংহাম সেন্ট্রাল, উইম্বলডন পার্ক, নিউ মলডেন, হান্সলো নর্থ এবং চীম।

অঞ্চলভিত্তিক অবস্থানের দিকে থেকে লন্ডন রিজিওন প্রথম স্থানে, তারপর যথাক্রমে

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিন এবং এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি যেন অচিরেই নিরাপত্তায় বদলে যায়।

মিডল্যান্ডস্, মিডেল সেক্স, ইসলামাবাদ, নর্থ ইস্ট এবং সাউথ রিজিওন।

ছোট পাঁচটি জামা'ত হলো, স্পেনভ্যালী, লেমিংটন স্পা, ব্রমলে এবং লুইসাম, স্ক্যানথর্প এবং উলভার হ্যাম্পটন।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার দশটি জামা'ত হলো, সিলিকন ভ্যালী প্রথম স্থানে, এরপর যথাক্রমে ডেট্রয়েট, এরপর সিয়াটল, ইয়র্ক, হেরিসবার্গ, লস এঞ্জেলেস, বোস্টন, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ডালাস, হিউসটন এবং ফিলাডেলফিয়া।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত নিম্নরূপ: প্রথমস্থানে রয়েছে হ্যামবুর্গ, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রসগেরাউ, ডামস্টাড এবং উইযবাদেন। আর সংগ্রহের দিক থেকে শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো, যথাক্রমে রুইডোরমার্ক, নোয়েস, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, কোলন, ফ্রেডবার্গ, কোবলেনয্, মেহেদীয়াবাদ, ফুলল্ডা এবং হ্যানোভার।

সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার বড় জামা'তগুলো যথাক্রমে, এডমন্টন, ডারহাম, মিলটন, জর্জ টাউন, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে রয়েছে যথাক্রমে কেরালা, জম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, কর্নাটক, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, লক্ষদ্বীপ এবং রাজস্থান।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে কেরোলায়ী, ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, কলিকাতা, কাদিয়ান, কানোল টাউন, ষোলোর, পেঙ্গাডী, চেন্নাই, বেঙ্গালোর, কারুনা গাপলী, পাথাপ্রেয়াম এবং ক্র্যান।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি বড় জামা'ত হলো, যথাক্রমে ব্ল্যাক টাউন, মেলবোর্ন, মাউন্ট ড্রয়েট, এডিলেইড, মার্সডেনপার্ক, ব্রিসবেন, ক্যানবেরা, পার্থ, তাসমানিয়া এবং ডারউইন।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও জনবলে অশেষ বরকত দিন। শেষের দিকে এই দোয়ার প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়াতেও কয়েকদিন থেকে জামা'তের বিরোধী এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অনেক হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই তাদের দুষ্কৃতি এবং অনিষ্টের লক্ষ্যে পরিণত করুন এবং রাবওয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক। প্রশাসন এবং সরকারকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি এবং কান্ডজ্ঞান দিন যেন তারা এই বিষয় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। ফ্রান্সে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নামে আইন হাতে তুলে নিয়ে এভাবে কাউকে হত্যা করা বা মেরে ফেলার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সবসময় এটি বলে এসেছি যে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আর প্রমাণ করে আসছি যে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নামধারী মুসলমান এবং এই মুসলমান সংগঠনগুলো নিজেদের এমন অপকর্ম এবং যুলুম ও অন্যায় থেকে বিরত হয় না। এরফলে এখানে ইউরোপীয় দেশসমূহে বা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলমানদের হয়তোবা এসব দেশের স্থানীয় লোকদের অন্যায় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। আর শুধু তাই নয় বরং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই পত্রিকা যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অর্থাৎ যার সম্পাদককে হত্যা করা হয়েছে সেই পত্রিকা এবং স্থানীয় মানুষ এবং সংবাদ মাধ্যম অন্যায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর আরো নোংরা আক্রমন করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা এখানকার বিভিন্ন সরকারকে তৌফিক দিন তারা যেন এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন ঠেকাতে পারে। যে অপরাধী তাকে ধৃত করুন এবং আইন অনুসারে শাস্তি দিন। কিন্তু ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া যদি দেখানো হয় তাহলে সেই সকল মুসলমান যাদের বোঝানোর কেউ নেই তারাও অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে। আর এভাবে ফিতনা ও নৈরাজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিবে। আজ উভয় পক্ষকে যুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য দোয়া করা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদেরই দায়িত্ব।

অনুরূপভাবে এ দিনগুলোতে দরুদ শরীফ অজস্র ধারায় পাঠের প্রতি মনোযোগী হোন। আর নিজ নিজ গন্ডিতে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যারা ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে পারে তাদেরও তা নেয়া উচিৎ।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিন এবং এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি যেন অচিরেই নিরাপত্তায় বদলে যায়। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

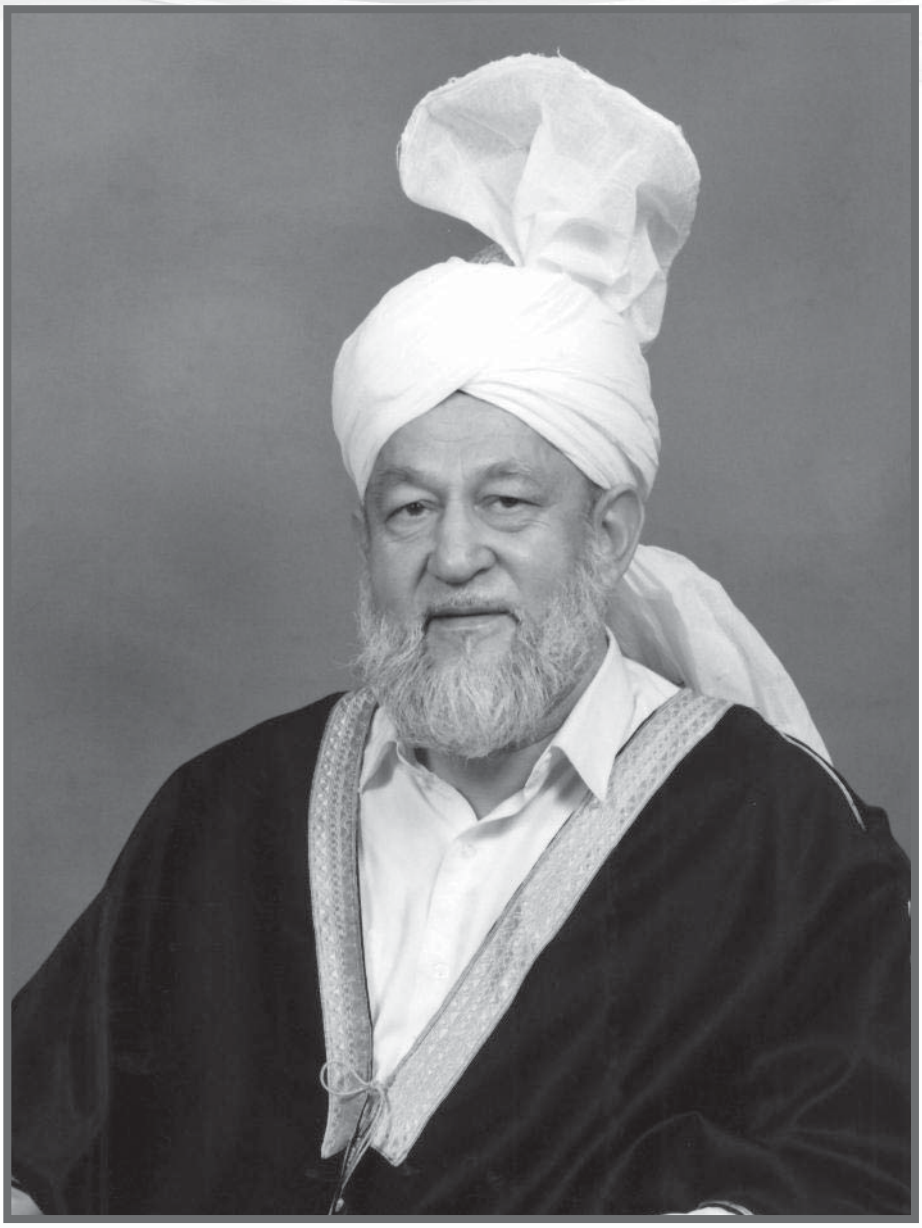

জলসা সালানার উদ্দেশ্যলাভে উপদেশাবলী এবং বন্ধুদের নিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮২, মসজিদ আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) বলেন, যতই সে জলসা কাছে আসছে, যার জন্য প্রায় সারা বছর আহমদীরা অপেক্ষমান থাকেন আর যার জন্য ব্যবস্থাপনাও সারা বছর চিন্তিত থাকেন, দায়িত্বভারের চেতনাও বাড়তে থাকে।

কিছু কাজ এমন আছে যেগুলো জলসা নিকটবর্তী হলে এতটা দীর্ঘ হয়ে যায় যে, জামা'তের এক স্বেচ্ছাসেবকদল ঐ সকল কাজে জামা'তের নেযামকে সহযোগীতা করে থাকে। সেই কাজ স্পষ্টত কোন কোন ভাবে সামনে আসে এবং এক বড় সংখ্যায় লোকদের এ কাজে অংশগ্রহনের সূযোগ হয় কিন্তু কিছু কাজ এমন আছে যা নিরবে জলসা সালানা শেষ হবার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় এবং সারা বছর বহমান থাকে। এটি কেবল রাবওয়াতে নয় বরং বাইরেও। মোটকথা কয়েকজন আহমদী ইঞ্জিনিয়ার সারা বছর নিজের সময় এ বিষয়ে ব্যয় করেন যেন লঙ্গরের রুটি বানানোর ব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় আরো উন্নত করা যায়। পৃথিবীতে আরো অনেক ইঞ্জিনিয়ারও আছেন কিন্তু কতজন এমন আছেন যারা কেবল খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেদের অবশিষ্ট সময় এভাবে একাধারে পরিশ্রমের সাথে এবং নিরবে ব্যয় করে?

তাই এমন নিরব স্বেচ্ছাসেবকও আছে যারা বছরের শুরু থেকেই জলসার প্রস্তুতির জন্য কাজ করে থাকে এবং এ ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করে।

এখন যেহেতু জলসা নিকটবর্তী হয়ে গেছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। কতজন মেহমান আসতে পারে তার কোন সঠিক আন্দাজ করা যেহেতু সম্ভব নয় আর অনেক সময় আশাতীত মেহমান উপস্থিত হয়ে যায়, তাই একটি চিন্তা অবশ্যই হয় আর দোয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় কেননা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, কী ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হতে হবে, কতটা বিশাল ব্যবস্থাপনার মুখোমুখী হতে

হবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য না পাওয়া যাবে, এ সকল প্রস্তুতি অপ্রতুল সাব্যস্ত হতে পারে। প্রকৃত বিষয় হলো যে, ব্যবস্থাপনা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, অনুমানও যদি সঠিক হয়, আগমনকারীদের বিষয়ে মানুষের আগাম জানা যদি সঠিক হয় আর সেই আন্দাজের চেয়ে অধিক ধারনা করে যদি ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সহায় না হবে, কোন ব্যবস্থাপনাই সঠিকভাবে চলতে পারে না।

আমি লঙ্গরখানায় কাজ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা আছে যে, অনেক সময় এমন ছোট ছোট বিষয় সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা বেকার হয়ে যায় আর কিছু সামনে চলে না। কখনো বৃষ্টি এসে যায়। কিছু ঐ সকল মজুর যাদেরকে আমরা বাইরে থেকে কাজের জন্য নিয়ে আসি তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে আর ঝগড়া এতোটা ভয়ংকর হয়ে যায় যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা এক দিকে থেকে যায় আর যতটা রুটি বানানোর প্রয়োজন ছিল অনেক সময় এর অর্ধেকও বানানো যায় না। তাই ভবিষ্যতে এমন শতপ্রকারের অন্ধকার আছে যেখানে মানুষের কোন হাত নেই।

তাই জলসা যতই কাছে আসছে, জামা'তের সদস্যদের খুব নিষ্ঠার সাথে আর কান্নাকাটি ও বিনয়ের মাধ্যমে দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন সকল দিক থেকে এ জলসাকে সফল এবং বরকতমন্ডিত করে। আগমনকারীদের জন্যও সমস্যা আছে। আবার যারা ফেরত যাবে তাদের জন্যও সমস্যা রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আমাদের মেহমানের এখানে আসা শুরু হয়ে গেছে। বাইরের দেশ থেকেও সদস্যদল এসে পৌঁছাচ্ছে আর এখনো তো তাদের সবাই অথবা তাদের অধিকাংশ কাদিয়ানের জলসা সালানায় অংশগ্রহনের জন্য গিয়েছে, কিন্তা তারাও অতি শিঘ্র এখানে আসতে যাচ্ছে। তাই অনেক দায়িত্বভার আছে যেগুলো রাবওয়াবাসীকে পালন করতে হবে। আর দোয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে সুন্দরভাবে এগুলো পালন করা সম্ভব নয়।

এই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মাথায় আসলো যে, শতবর্ষ জুবিলী যা খোদা তা'লার কৃপায় অনেক বড় আকারে হবে এবং বিশাল ব্যবস্থাপনা অনেক দায়িত্বভার নিয়ে আসবে, তার দায়িত্বভার আমরা কীভাবে পালন করবো। অগণিত এমন কাজ পড়ে আছে যেগুলো আজ পর্যন্ত আমরা শুরুই করি নি আর যেভাবে আমি বলেছিলাম, সেগুলোকে শেষ সীমায় পৌঁছানোর জন্য কয়েক বছরের প্রয়োজন। এরসাথে এ চিন্তাও শামিল হয়ে গেছে যে, সে টাকা কোথা থেকে আসবে যে টাকার এখন প্রয়োজন আছে আর অনেক বন্ধু মনে করছে ধীরে ধীরে শেষে আদায় করে দেবে। তাই আমি বিগত এক জুমুআর খুতবায় (৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে- অনুবাদক) আমি এ চাঁদা আদায়ের তাহরিকও করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বড় কৃপা আর তাঁর অগণিত রহমত এবং কৃপা আর দয়া যে, তিনি যত চিন্তার উদ্রেগ করেন ততই সে চিন্তা দূরীভূত করার উপকরণও সৃষ্টি করে দেন আর এ চিন্তার পরিনামে কষ্ট আসে না বরং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। ইলাহী জামা'তের সাথে এটি এমন এক নেযাম জারি আছে যে বিষয়ে চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, সমস্ত চিন্তা আল্লাহ্‌র কৃপায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

তাই গতবার আমি যখন শতবর্ষের জুবিলীর চাঁদার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, তখনও সে খুতবা পৃথিবীর সকল জামা'তে পরিপূর্ণভাবে সারা দুনিয়ার জামা'তে ভালোভাবে প্রকাশও হয় নি তখন বিভিন্ন দূর দূরান্তের জামা'তগুলো থেকেও উদাহরণসরূপ উগান্ডা আর এমনি ধরণের আরো কয়েকটি দেশের জামা'ত থেকে অধিক সংখ্যায় এ খবর আসছে যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অশেষ মনোযোগ দেয়া শুরু করেছে। না কেবল শতবর্ষ জুবিলীর চাঁদা আদায়ের বিষয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে খুব মনোযোগী হচ্ছে বরং তাহরিকে জাদীদের চাঁদাও কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের জামা'তগুলো থেকে যে খবর এসেছে তা-ও খুশি হবার মত। একটি জাগরণের ঢেউ খেলে গেছে আর সকল কর্মকর্তারা পিঁপড়ার ন্যায় দিন-রাত কাজ করে চলেছে। আর চেষ্টা করছে যে, বিগত দূর্বলতাগুলোকে দূর করার। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লা ঐ আনন্দদায়ক খবরের মাধ্যমে প্রশান্তিও দান করেন।

এককভাবেও যে পত্রাদি আমি পাই সেগুলোর মাঝেও কতক এমন পছন্দনীয় এবং উজ্জলতর উপমা সামনে আসে যে, হৃদয় খোদা তা'লার সমীপে সিজদাবনত হয়ে যায় কেননা তিনি স্বয়ং নিজ কৃপায় জামা'তে আহমদীয়াকে এমনসব মহান ব্যক্তিত্ব দান করেছেন। মোটকথা গতরাতে আমি লাহোরের এক আহমদী মহিলার পত্র পড়েছি যেখানে তিনি লিখেছেন যে, আমি এক সাধারণ গরিব মহিলা। কিন্তু আমি আমার ইচ্ছাতে শতবর্ষী জুবিলীর চাঁদা লিখিয়ে দিয়েছি। পরবর্তীতে কিছু এমন অবস্থা সামনে আসতে শুরু করে যে, আমি আমার চাঁদা সময় অনুযায়ী বছরে বছরে আদায় করতে পারি নি। এভাবে সেই দায়িত্বভার একটি পাহাড় হয়ে সামনে এসে দাড়িয়ে যায়। তিনি লেখেন যে, চাঁদা যতই ছিল, আমার মনে হলো যে, আমার এ বোঝা আমার সামর্থ্য ও সাধ্যের বাইরে। আপনি যখন মনোযোগ আকর্ষণ করলেন তখন কয়েকদিন আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

খোদা তা'লার কাছে কান্নাকাটি করি যে, তুমি-ই তো নিজ কৃপায় ওয়াদার তৌফিক দিয়েছিলে, এখন তুমি-ই তা পূর্ণ করার সৌভাগ্য দাও। তখনি আমার দৃষ্টি আমার গহনার প্রতি পড়লো আর তখনি আমার মনে পড়লো যে, যা কিছু আমার সাধ্যে আছে তা অন্তত পেশ করি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সমস্ত গহনা তা ছোট হোক বা বড়, জামা'তের সামনে রেখে দিচ্ছি যেন নিজ নিষ্ঠার প্রমান পেশ করতে পারি যে, আমার যা সাধ্য ছিল তা আমি করে দিয়েছি। কেবল তা-ই নয় বরং (তিনি লিখেছেন) যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তখন সেই গহনার প্রতি এতটা ঘৃণা সৃষ্টি হলো যে, আমার চোখে তা ছিল অসহ্য, এটি আমার হৃদয়ে বোঝা হয়ে গেছে। তাই খোদার দোহাই, এ গহনা আমার ঘর থেকে দূর করুন আর আমাকে বলুন যে, আমি তা কিসে দেব যেন আমার মন থেকে এ বোঝা নেমে যায়।

কেমন অদ্ভুত খোদা, কত অনুগ্রহকারী খোদা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে এমন সুন্দর জামা'ত দান করেছেন যে, কুরুনে উলা-এর যুগ পুনরায় জীবিত করেছেন। যখন আমি এ পত্র পড়লাম তখন আমার মন থেকে এ দোয়া বের হল যে, হে আল্লাহ্! এ মহিলাকে ইমানের অলংকারে সৌন্দর্যমন্ডিত করো যেভাবে সে স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর তার আপাদমস্তক এবং তার ভিতর-বাইর নিজ সন্তুষ্টির অলংকারে সুসজ্জিত করো।

এরপর আমি চিন্তা করলাম যে, পৃথিবীতে

কত এমন মহিলা আছে (কোটি কোটি হবে) যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অলংকারের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তাদের মাথা, তাদের হাত, তাদের গলা তাদের পা খালি পড়ে আছে। কিন্তু তাদের মাঝে কতজন এমন আছে যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের হাতগুলো, নিজের মাথাকে, নিজের গলাকে এবং নিজের হাত-পা গহনা থেকে খালি করেছে। অনেক কম উপমা এমন পাওয়া যাবে। আর যদি কোন উপমা থেকেও থাকে তবে তা কেবল জামা'তে আহমদীয়াতেই পাওয়া যাবে। পূর্বেও জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস এমন উপমা পেশ করেছে, আজও পেশ করছে আর আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ পেশ করতে থাকবে। আর আমার এ-ও জানা আছে, যে মহিলাদের এমন মহান কুরবানীর সৌভাগ্য হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এমনিতে পরিত্যাগ করেন নি। পৃথিবীতে কত মহিলা আছে (কোটি কোটি হবে) যাদেরকে খোদা তা'লা অলংকার দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মাঝে কে সেই গহনাধারী যে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের দিক থেকে সেই মহিলার মোকাবেলা করতে পারে যার হাত-পাগুলো আর মাথা এবং গর্দান কেবল খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে খালি হয়েছে। আর তারা আপাদমস্তক হিরা জহরত দিয়ে ভরে গেলেও সেই মোকাবেলায় ঐ মহিলার সৌন্দর্যের সামনে টিকতে পারবে না।

এটি খোদা তা'লার এমন কৃপা যে, তার হাতগুলোকে গহনা থেকে খালি করে সে মহিলার এ অনুভূতিও হয় নি যে, আমি তো এখন অসহায় হয়ে গেলাম, আমি বঞ্চিত হচ্ছি বরং সাথে সাথে খোদা তা'লা তার হৃদয়কে এমন এক অনুভূতি দ্বারা ভরে দিয়েছেন যে, সে গহনার প্রতি ঘৃনা করতে লাগলো আর এমন কঠিন ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করেছেন যেন ঘরে গহনা পড়ে আছে তা দূর করো, নাহলে আমি শান্তি পাবো না। এটি কেবল মাত্র খোদা তা'লার কৃপা।

তাই খোদা যখন চিন্তার উদ্রেক করেন এবং চিন্তাশীল অনুভূতি সৃষ্টি করেন, সে চিন্তাকে দূর করারও উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। এ সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার অভিপ্রায় কী? তা হলো, আহমদীরা পূর্বের তুলনায় নিজ প্রভুর সন্নিকট হয়ে যায়। এ চিন্তাসমূহের দূরীকরণের ব্যবস্থাপনা কেবল বাহানা হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন মর্যাদা থাকল না। সকল কাজ খোদাকেই করতে হবে আর তিনিই করে থাকেন। কিন্তু সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাঝে আমাদের কী অর্জন করতে হবে? আর তা হলো, নিজ প্রভুর সন্তুষ্টি। আমরা দিনে দিনে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আমাদের প্রিয় প্রেমাস্পদ, আমাদের খালেক ও মালেকের নিকটবর্তী হচ্ছি। তাই কত মহান সেই ব্যবসা যা আমরা আমাদের প্রভুর সাথে করেছি। আমাদের কিছুই খরচ করতে হয় না, আর প্রত্যেকবার আমরা পূর্বের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সম্পদে সম্পদশালী হচ্ছি।

এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমার চিন্তা পুনরায় জলসা সালানার দিকে ফেরত আসলো যা এ বছরের জলসা আর আমার বিশ্বাস হলো যে, যদি আমরা দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সকল সমস্যা দূর করে দিবেন, সকল বিপদ দূর করে দিবেন আর এ জলসাকে নিজ কৃপায় সকল দিক থেকে এক সফল জলসা প্রমাণ করবেন। কিন্তু যতদূর জলসার প্রকৃত সফলতার সম্পর্ক রয়েছে যেভাবে আমি পূর্বেও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম, তার জন্য আমাদেরকে ইবাদতের অধিকার আদায় করতে হবে। যদি আমরা ইবাদাতের অধিকার আদায় না করি তাহলে প্রকৃত সফলতা লাভ হবে না। জলসার বাহ্যিক আলো এবং বাহ্যিক বসন্ত আর বাহ্যিক সফলতা তো কোন অর্থ রাখে না। মু'মিনের উদ্দেশ্যের মাঝে ইবাদাত হল উন্নতির চরমসীমা। যদি ইবাদতের অধিকার পালন না করা হয় তাহলে এ জলসা নিজ সকল শান-শওকত সত্ত্বেও বিরান বলে পরিগনিত হবে।

তাই আমি আরো একবার জামা'তকে এই দায়িত্বভারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। ঘরগুলোতে বিশেষভাবে এ বিষয়ের চর্চা হওয়া প্রয়োজন এবং এখন থেকেই এ সংকল্প হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ নামাযের সময়গুলোতে ঘরগুলোকে খালি করে দিব এবং মসজিদগুলোকে (নামাযী দ্বারা) ভরে দিব। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনাও সাহায্য করতে পারে। প্রত্যেক মহল্লার ব্যবস্থাপনা নিজ মহল্লার প্রত্যেক ঘরকে এমন চার্ট যেন দেয় যেগুলো ঘরবাসী দেয়ালে লাগিয়ে রাখতে পারে আর এ চার্টে যেন তাদের নিকটবর্তী মসজিদের নামাযের সময়সূচী লেখা থাকে যেন সর্বদা ঘরের অধিবাসীর স্মরণ হতে থাকে। আর এটাও যেন লেখা থাকে যে,

আমার বিশ্বাস হলো যে, যদি আমরা দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সকল সমস্যা দূর করে দিবেন, সকল বিপদ দূর করে দিবেন আর এ জলসাকে নিজ কৃপায় সকল দিক থেকে এক সফল জলসা প্রমাণ করবেন।

যদি আমরা ইবাদতের অধিকার আদায় না করি তাহলে প্রকৃত সফলতা লাভ হবে না। জলসার বাহ্যিক আলো এবং বাহ্যিক বসন্ত আর বাহ্যিক সফলতা তো কোন অর্থ রাখে না। মু'মিনের উদ্দেশ্যের মাঝে ইবাদত হল উন্নতির চরমসীমা। যদি ইবাদতের অধিকার পালন না করা হয় তাহলে এ জলসা নিজ সকল শান-শওকত সত্ত্বেও বিরান বলে পরিগনিত হবে।

আপনাদের মসজিদ এতোটা দূরে অবস্থিত। যদি আপনারা নামাযের দশ-পনের মিনিট পূর্বে নিজ মেহমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন আর খাবারের সময় এমন নির্ধারণ করেন যা নামাযের ভেতরের সময়ের মাঝে না হবে তাহলে এটি অনেক বড় সেবা বলে পরিগনিত হবে এবং অনেক বড় সৌভাগ্য হবে। এভাবে জলসার সময়সূচীও যেন লেখা হয় আর সন্ধার পরের প্রোগ্রামও যেন উল্লেখ থাকে আর মনোযোগ আকর্ষণ করা হোক যে, আপনারা আপনাদের মেহমানদের দায়িত্বভার ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পবিত্রতা অর্জন সহায়ক না হবে যার উদ্দেশ্যে তারা কষ্ট করে বাইরে থেকে এখানে এসেছে আর সে উদ্দেশ্য হলো, জলসায় অংশগ্রহন করা এবং বক্তৃতাসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া। তাই যদি আপনাদের নাশতা খাওয়ানো, আর আলাপ চারিতার মজলিসগুলো তাদেরকে এ উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত করে তাহলে এ মেযবানি দ্বারা কী লাভ? তাহলে তো এটি মেযবানি হবে না বরং জুলুম হবে।

এ চার্ট নাযারাতে ইসলাহ ও ইরশাদের পক্ষ থেকে ছাপানো আকারে পাওয়া যাবে। নাযারাত মহল্লাগুলোতে সরবরাহ করতে পারে। এর সাথে একটি ছোট লিফলেট (যেভাবে আমি বলেছি) যা নামাযের সময়সূচী এবং নসিহত সম্বলিত করে প্রত্যেক ঘরে বন্টন করুন। এ ব্যবস্থাপনা ইনশাআল্লাহ্ খুব ফলপ্রসূ হবে।

এভাবে জলসার দিনগুলোতে সকালে নামাযের জন্য জাগানোর ব্যবস্থাও যেন করা হয। যেভাবে সাধারণত আতফালুল আহমদীয়া সকালে "সাল্লে আলা নাবিয়্যেনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ"-পড়তে পড়তে নামাযের জন্য জাগায়, তখনো বিশেষভাবে আতফালুল আহমদীয়ার এ দায়িত্বভার হবে যে, সে সমস্ত রাবওয়াতে এক আওয়াজ প্রতিধ্বনিত করে আর তাহাজ্জুদের সময় থেকে শুরু করে ফযরের নামায পর্যন্ত এক অদ্ভূত দৃশ্য যেন আমরা দেখতে পাই। তৃপ্ত দৃষ্টিও সৃষ্টি করুন এবং তৃপ্ত কানও। কানের জন্যও স্বাদের উপকরণ যেন সৃষ্টি হয় আর চোখের জন্যও যেন স্বাদের উপকরণ সৃষ্টি হয়, যেন ছোট ছোট বাচ্চারা দরুদ পড়তে পড়তে নামাযের জন্য জাগাতে থাকে। এ ব্যবস্থাপনাও ইনশাআল্লাহ্ খুব-ই ফলপ্রদ প্রমানিত হবে। কেবল বার বার নসিহত করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আহমদীদেরকে শুনার কান দান করেছেন এবং এমন হৃদয় দান করেছেন যা অতি দ্রত গলে যায় এবং ঝুঁকে পড়ে। সামান্য মনোযোগ আকর্ষণের ফলে আমরা অনেক বড় কল্যান পেতে পারি।

এ বিষয়ে আরো একটি বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে, জলসা সালানার জন্য কেবল মাত্র মেহনতী কাজের লোক প্রয়োজন। অফিসার জলসা সালানার এটি অভিযোগ যে, কর্মকর্তাদের মান নিম্নমানের হয়ে যাচ্ছে। যে মান এবং কুরবানী এবং আবেগ এবং রূহ-এর সাথে এক যুগে আহমদী বাচ্চারা, আহমদী যুবকরা কাজ করতো, সে মানে এখন ঘাটতি হয়েছে।

যখন আমি এমন কথা খুতবায় বলি তখন অনেকে আমাকে লেখে যে, আপনি এ কেমন অন্ধকার করে দিলেন। আপনি এ দূর্বলতা সকলের সামনে খুলে বর্ণনা করছেন। তাদের অনুযোগ-পত্রের সত্ত্বেও আমি এটা বলছি এবং এ বর্ণনা করতেই থাকবো, কেননা নিজেদের এমন দূর্বলতা লুকিয়ে রাখা যা কিনা সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন, এটি পূণ্যের কাজ নয় বরং নিজ জানের ওপর অত্যাচার। অযথা নিজের প্রশংসা করা আর অযথা নিজেদের দুর্বলতা লুকানো, প্রকৃতপক্ষে কোন নেকী নয়, বরং তাকওয়া পরিপন্থী বিষয়। তাই যে দুর্বলতা আমার জানা আছে, আমার জন্য আবশ্যক তা যেন আমি আপনাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, অনুভব করুন আর জানুন যে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এরপর তা যেন আমরা দূর করি। এটাই কওলে সাদিদের পদ্ধতি আর এর ফলে অবশ্যই সংশোধন হবে। কুরআনে লেখা আছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে থাকে। (সূরা আল আহযাব-৭১-৭২)। এতটা

যথাযথ, এতটা দৃঢ়, এতটা বিশ্বাসযোগ্য যে, কখনো এর আঘাত বেকার যায় না। তাই আপনারা কওলে সাদীদ অবলম্বন করুন। এটা হতেই পারে না যে, কওলে সাদিদের পরিনামে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে। তাই যে দুর্বলতা রয়েছে তা স্বীকার করা প্রয়োজন এবং সেগুলো দূর করা প্রয়োজন। আর যদি অফিসার জলসা সালানা অনুভব করে থাকে তাহলে অবশ্যই দূর্বলতা রয়েছে। তাই আমি জলসার সকল কর্মকর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যেন নিজেদের নিষ্ঠার মানকে আরো উচ্চ করতে পারে আর বহু গুনে সুউচ্চ করে। আমার বিশ্বাস, এরপর অফিসার জলসা সালানা-কে ইনশাআল্লাহ্ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

নিষ্ঠার সাথে কাজ করাই আসল আর সেবাদানই এক দিক থেকে তবলীগ হয়ে যায়। জলসা সালানার সময় একবার এমন হলো যে, বৃষ্টি হচ্ছিল আর ভয় ছিল যে, সকালে আমরা মেহমানদেরকে রুটি সরবরাহ করতে পারবো না। ওদিকে রুটির কারিগর হেঁসেল ছেড়ে পলায়ন করল। সে যুগে তো ছাদের ব্যবস্থা ছিল না। খুব খারাপ অবস্থা হতো। রুটি বানানোর চুলা হতো কাঁচা আর অন্যান্য উপকরণও খুব কম হতো।

. . . রুটি বানানো ওয়ালা তো পূর্বেই পলায়ন করেছিল। সে সময় আমাদের যতজন আতফাল রুটি জমা করার কাজে নিয়োজিত ছিল আর অন্যান্য কর্মকর্তা-তাদের সকলকে আমি একত্রিত করলাম। এ ছাড়াও বাইরে থেকে যত জন কর্মকর্তা পাওয়া সম্ভব ছিল তাদেরকে ডাকা হলো। তারপর আমরা কী করলাম, যা কিছু পাওয়া গেল তা নিয়ে রুটির কারিগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম যেন বৃষ্টি তাকে কষ্ট না দেয়। আর বাচ্চাদের মধ্যে যেমন-তেমন (পিড়া) যারাই বানানো জানতো, তারা তা বানালো আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের সমস্ত রাত এমনিভাবে কাটলো। সকালে নামাযের পর আমি একজন মৌলভী সাহেবকে দেখলাম যিনি সিন্ধের অধিবাসী ছিলেন আর আমার সাথে তার লারকানায় দেখা হয়েছিল। সে খুব শক্ত বিরোধী ছিলো আর জামা'তে ইসলামীর প্রথমসারির লোকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তার ওপর গভীর প্রভাব ছেয়ে গেল।

আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! আপনার কী হয়েছে? তিনি বলেন, আমি একটু আগে নামাযের পর বয়আত করে এসেছি আর সে খুশিতে কোলাকুলি করছি। আমি তাকে বললাম, আপনার বয়আত করার চিন্তা কীভাবে আসলো? তিনি বলেন, রাতে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি দেখতে এসেছিলাম যে, এখন আহমদীদের অবস্থা কী? আমি চাচ্ছিলাম যে, আপনাদের ব্যবস্থাপনা যেন বরবাদ হয়ে যায় কিন্তু রাতে আমি যে দৃশ্য দেখলাম তা খুবই অবাক হবার মত এবং ইমান উদ্দীপক ছিল অর্থাৎ ছোট ছোট শিশুরা যাদের কাছে শরীর ঢাকার মত যথেষ্ট কাপড়ও ছিল না। আর কি অফিসার আর কি কর্মচারি সকলে টুকরী-বেলচা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং রুটির কারিগরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছে যেন সে ভিজে না যায়। এটি দেখে আমার জগৎ এতটা পাল্টে গেল যে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, অবশ্যই আমি বয়আত করব। কেননা এটি মিথ্যাবাদীদের জামা'ত হতে পারে না, আর আমি মনে মনে বললাম, আপনার সাথে তখনি সাক্ষাৎ করব যখন বয়াত করব। তাই রাত খুব দুশ্চিন্তার মাঝে কাটলো আর আমি এখন আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। কেননা খোদা তা'লা আমাকে বয়আতের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

তাই নিষ্ঠার উপমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কখনো বিনষ্ট হয় না। এর ফলে খুব তবলীগ হয়। লক্ষ-লক্ষ দলিল থাকলেও, সত্য কর্মের শক্তি প্রভাবের মোকাবিলা করতে পারে না।

তাই খুব নিষ্ঠা এবং তাকওয়ার সাথে আপনারা আপনাদের কুরবানী সিলসিলার জন্য পেশ করুন এবং দোয়া করতে থাকুন আল্লাহ্ তা'লা যেন বিপদের সময়ও দৃঢ় রাখেন কেননা জলসার প্রোগ্রাম যখন সামনে অগ্রসর হয় তখন অনেক সময় বাচ্চাদের ওপর আর অন্যান্য কর্মকর্তাদের ওপর এত বেশি বোঝা অর্পিত হয় যে, মনে হয় এটি মানবীয় সামর্থের উর্ধ্বে। অনেক সময় এমন মনে হয় যে, মানুষ কাজ করতে করতে বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে-এমন অবস্থায় হয়। কিন্তু যদি মানুষ দোয়া করে। তাই আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় ঐ সকল বোঝা সহজ করে দেন।

এখন আমি দোকানাদারদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই। এখানের দোকানদারদের জন্য রুজি-রোজগারের এটি একটি বড় সুযোগ। অনেক বেচারা অপেক্ষা করে থাকবেন যে, সারা বছরের ঘাটতি জলসা সালানাতে পূর্ণ হবে। কিন্তু ঘাটতি এভাবে পূর্ণ করা উচিত যেন অন্য কোন বড় ঘাটতি রয়ে না যায়। এটি যেন না হয় যে, জাগতিক ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে নিজ পরকালের ঘাটতি হয়ে যায় আর বদ দেয়ানতির এমন পথ অবলম্বন করেন যার ফলে আপনাদের পরকাল নষ্ট হয়। লোকেরা অতি নিষ্ঠার সাথে বাইরে থেকে আসবে। বড় বড় আকাঙ্খা নিয়ে আসবে। অনেকে তো এখানে এ উদ্দেশ্যে শামিল হয় যেন রাবওয়া থেকে কিছু না কিছু তারা নিয়ে যেতে পারে। এটি বাহ্যিক ব্যাপার, যে জায়গার প্রতি ভালোবাসা থাকে আর যার ব্যাপারে মানুষ মনে করে যে, এটি নেকীর ময়দান, সেখানের বাহ্যিক জিনিসের প্রতিও তার ভালোবাসা হয়ে যায়। লোকেরা মক্কা এবং মদীনাতে যায় আর অন্যান্য পবিত্রস্থান যেমন আজমির শরীফ ইত্যাদি জায়গায় যায় এবং সেখানের নিদর্শন নিয়ে ফেরত আসে, এর এই অর্থ তো নয় যে, তাদের এমন কোন জিনিসের প্রয়োজন ছিল যা সেখানেই পাওয়া যায় বরং তারা কেবল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে সেখানের একটি নিদর্শন নিয়ে আসে। আমাদের কোন কোন আহমদী যখন হজ্জ করে আসে তখন মদীনার জায়নামায তোহফা দিয়ে থাকে আর কখনো কোন তসবিহ দিয়ে থাকে। এ জিনিসগুলো তারা কেবল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ক্রয় করে অর্থাৎ যে শহরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) চলাচল করতেন সেখান থেকে আমরা কোন জিনিস ক্রয় করবো যদিও তা জাপানে তৈরিই হোক না কেন। কিন্তু যেহেতু তা সেই পবিত্র স্থানের নামে নামকরন হয় তাই বরকত পেয়ে যায়। এর মাঝে এক মহানত্ব পাওয়া যায়। তা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়।

তাই বাইরে থেকে আগমনকারী আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা, প্রয়োজনের উর্ধ্বে থেকে এখানে কেবল এ উদ্দেশ্যে শপিং করে যে, যে জায়গাকে খোদা তা'লা আজ পৃথিবীর সর্বোত্র নূর ছড়ানোর কেন্দ্র বানিয়েছেন সেখানের জিনিস নিয়ে যাবে। তাদের মাঝে আমেরিকার মত উন্নত দেশের আহমদীরাও আছে। তাদের প্রয়োজন নেই যে এখান থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করবে বরং সারা পৃথিবী তাদের কাছ থেকে জিনিস-পত্র ক্রয় করে, তাই যখন বাইরের মেহমান

এখানে এসে শপিং করে, তা কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে এবং ইলাহী মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে এমনটি করে। এমন লোকদের সাথে যখন অনেক দোকানদার বাড়াবাড়ি করে তখন আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে, তাদের ঈমানে কতটা হোঁচট লাগতে পারে? তাদেরকে যে দাম বলা হয় তা দিয়ে দেয়। তারা এটি চিন্তাই করতে পারে না যে, একজন আহমদী দোকানদার জায়েয লাভের অধিক নেবে অথবা আমাদের দূর্বলতার সূযোগে লাভ করার জন্য আমাদেরকে বেশি দাম বলবে। কিন্তু তারা যখন অন্য জায়গায় যায় আর সেখানে অন্তত নেক দোকানদার পায় তখন তারা হোঁচট খায়। তারা বলে যে, আচ্ছা! এর দাম এমন? আমাদেরকে তো ওমুক জায়গায় এতো বলা হয়েছিল। তাই এমন ঘটনা তারা পরে বলেও থাকে।

বিগত কয়েক বছর ধরে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বাইরে থেকে আগমনকারী অনেকে যেমন আমেরিকানরা বলেছে, আমাদের এটি দেখে খুব কষ্ট হয়েছে যে, এক দোকানদারের কাছে গেলাম এবং তাকে একটি জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করলাম, তখন সে বলল পঞ্চাশ রুপি, আমরা তখনি তা দিয়ে দিলাম। কিন্তু যখন অন্য দোকানদারের কাছে গেলাম তখন সে বলল, এর দাম তো একুশ রুপিয়া। কোন সম্পর্ক তো থাকা চাই। পারস্পরিক সামঞ্জস্য তো থাকা চাই। একুশের বাইশ হতে পারে অথবা তেইশ হতে পারে বা উনিশ হতে পারে। এটি তো বোধগম্য হবার মত কথা। কিন্তু পঞ্চাশের একুশ হওয়া বা একুশের পঞ্চাশ হওয়া। এটা বোধগম্য হয় না।

তাই অবশ্যই কেউ বদ-দেয়ানতি করেছে। এটি খোদা তা'লার কৃপা যে, তাদের ঈমান ঐ চোটের চেয়ে উর্ধ্বে কিন্তু একটা ক্ষতি তো অবশ্যই হয়। তাদের আশার মাঝে এক নতুন পরিবর্তন আসে, আর তারা মনে করে যে, আমরা যতটা উচ্চ আশা করেছিলাম, এরা ততটার যোগ্য না। আর তারা যদি ঈমান থেকে দূরে সরে না-ও যায়, তবুও ঐ বিষয়গুলো দেখে তাদের নিষ্ঠার মাঝে অবশ্যই ঘাটতি হয় আর নিষ্ঠা বাড়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লা রাযেক, তার প্রতি ভরসা করুন। খোদা যতটা দেন ততটা গ্রহণ করুন আর যদি আপনারা খোদা তা'লার খাতিরে বদ-দেয়ানতি থেকে বিরত থাকেন, লাভ যথাযথ রাখেন আর উত্তম আচরণ করেন। বরং কোন ব্যক্তি যদি ভুল জিনিস নিয়ে গিয়ে থাকে এবং ফেরত দিতে আসে, যদি আপনাদের এমন নিয়ম না-ও থেকে থাকে, আপনারা যদি ফেরত নেন তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কর্মে বরকত দিবেন আর আপনাদের লোকসানকে লাভে পর্যবসিত করে দিবেন। ভরসা করুন, এরপর দেখুন আপনাদের খোদাকে, যে তিনি কেমন ধরণের খোদা। তিনি অনেক বাড়িয়ে দান করে থাকেন। কখনো সামান্য পরীক্ষায় নিপতিত করেন তখন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা তো করুন।

তাই দোকানদারদের বিশেষভাবে নিজেদের চারিত্রিক মান সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন আর দেয়ানতদারির চাহিদা পূর্ণ করা উচিত। যদি তারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে এমনটি করে তবে তাদের রিযিকে বরকত হবে, তাদের ইমানের মাঝেও বরকত হবে, তাদের সন্তানদের মাঝে বরকত হবে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি বড় কৃপাবারি করবেন।

আমি আশা করি যে, আমরা জলসা সালানাকে নিজেদের দোয়ার মাধ্যমে এবং আহাযারির মাধ্যমে খুব সুন্দর করে সাজাবো। এর বাহ্যিক সাজও হবে এবং অভ্যন্তরীন সাজও হবে। ইনশাআল্লাহ তা'লা।

(দৈনিক আলফযল রাবওয়া- ১৪ মার্চ ১৯৮৩)

ভাষান্তর: **মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান**

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯১তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী'র সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

-সম্পাদক

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণ এবং এথেকে মুক্তির উপায়

মওলানা মুবাশ্বের আহমদ আইয়াজ

[২০১৪ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝

অর্থাৎ: তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে? আমরা চাইলে তাদের ওপর আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারি, যার সামনে তাদের ঘাড় নত হয়ে যাবে। (সূরা আশ্ শো'আরা: ৪-৫)

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! খোদার মা'মুর এবং মনোনীতগণ এরূপ কোমল হৃদয়ের অধিকারী হন যে, তাঁরা মানবজাতির যে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেখেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। একজন মা তার অসুস্থ সন্তানের কষ্ট দেখে আর কতটা ব্যাকুল হন তার চেয়েও অনেক বেশি মর্মযাতনা বা মর্মপীড়া ভোগ করেন খোদার এই মনোনীত বান্দারা। আর সবচেয়ে ব্যাকুল চিত্তের অধিকারী ছিলেন মানবদরদী রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। আরশের খোদা আপন বন্ধুর উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখে বলে উঠেন, ***"লায়াল্লাকা বাখিউন নাফসাকা"*** অর্থাৎ: তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে? মানবজাতির প্রতি এরূপ সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ সেবক এবং শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ এ যুগে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন। যাতে বিশ্ববাসীর দুঃখ-দুর্দশা নিরসণ করতে পারেন আর জগদ্বাসী শান্তি-নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জান্নাতে বসবাস করতে পারে।

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণ এবং এথেকে মুক্তির উপায়

আজ আমরা দেখি, বিশ্বের সকল দেশ তা আমেরিকা হোক বা ইউরোপ, আরব বা আফ্রিকা অথবা অস্ট্রেলিয়া হোক বা এশিয়া সবাই উপর্যুপরি দুঃখ-কষ্টের সীমাহীন

আযাব ও বিপদাপদের সম্মুখীন এবং অনবরত এর লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে। একে সামাল দেয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যত চেষ্টাই করা হোক না কেন ব্যাধি বাড়ছেই। ...প্রত্যেকটি নতুন বিপদ ও সমস্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি কষ্টদায়ক ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। এক সমস্যার সমাধান সহস্র অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে। আর এমনটি হওয়ারই কথা ছিল। কেননা এর একটি মূল কারণ, এসব অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার কারণ পার্থিব নয় বরং ঐশী কোনো নিয়তি এর পেছনে কার্যকর। ঐশী আযাব এবং শাস্তি যা বৃষ্টির ফোটার মত বর্ষিত হচ্ছেই হচ্ছে। আর ব্যাধি যখন ঐশী হয় তখন চিকিৎসকও ঐশী-ই হওয়া প্রয়োজন, যিনি এসব দুঃখ-কষ্টের চিকিৎসা করতে পারেন। আজ উৎকণ্ঠিত বিশ্ববাসী এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত আর্ত-মানবতার জন্য সুংসংবাদ, উদ্ধারকর্তা বা আরোগ্যদাতা আজ তাদের মাঝে উপস্থিত আছেন।

ভাগ্যবানরাই এ ভালোবাসা লাভ করে কেননা, আরোগ্যদাতা নিজ থেকেই তাদের কাছে এসেছেন।

মানবজাতীর প্রতি সহানুভূতি এবং ভালোবাসায় আপ্লুত এই হৃদয় সেসব উৎকণ্ঠিতের চিকিৎসার প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়ে, রোগ শনাক্ত করে আরোগ্যের স্বর্ণালী নীতিমালা রূপী পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করছেন। আজ অধমের বক্তব্য নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সেসব হিতোপদেশ সমৃদ্ধ, যা তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ণনা করেছেন। কেননা আজ এই বেদনাই সেসব আহতের আরোগ্যের কারণ হবে। আর এই জ্যোতিই অস্থিরতা এবং অশান্তির অমানিশার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করবে। আর এই মসরূরই ব্যাকুলচিত্তদের দূত হিসাবে আজ খোদার পক্ষ হতে জগতে উপস্থিত আছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! শান্তি ও নিরাপত্তা সেসব বিষয়ের অন্যতম যার সন্ধানে বিশ্ববাসী সদাই তৎপর। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক দেশের সরকার শান্তির সন্ধানে রত আর তা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নামকাওয়াস্তে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তার ভিত্তি সুবিবেচনা হয় না। আন্তরিকতার সঙ্গে কৃত সুবিবেচনাই মূলত শান্তির ভিত্তি হতে পারে। পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুবিবেচনা প্রদর্শন আবশ্যক। আর সুবিবেচনা হচ্ছে, মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে যেন কোন ভিন্নতা না থাকে আর মানুষ যেন কখনো মিথ্যার আশ্রয় না নেয় বা ভুল কথা না বলে। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা সত্যের এরূপ উন্নত মান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের কোথাও দেখতে পাই না।

আমরা এই বাস্তবতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছি, কীরূপ লাগামহীনভাবে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার ওপর ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো চায়, তারা নিজেরা কয়েকটি বিশেষ দেশের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে এবং সমমনা অন্যান্য দেশের অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করবে, আর এ উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষকে স্বাধীনতা প্রদানের অথবা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাত দেখিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এভাবে মানুষের হৃদয়ের উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতাও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে

* যখন মানুষ অনুভব করে, তার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

* যখন তারা অনুভব করে, অকারণে তাদের ওপর যুলম করা হচ্ছে এবং তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে।

* এবং যখন তারা ন্যায়বিচারের কোনো কিরণ দেখতে পায় না।

* যখন ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে।

* যখন উন্নতির জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ সমতার ভিত্তিতে বন্টন করা হয় না।

* যখন শক্তিধররা নিজেদের শক্তির জোরে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে।

* যখন একটি দেশ নিজের শক্তির জোরে অন্যের ওপর চেপে বসতে আরম্ভ করে।

* যখন সাহায্যের নামে শক্তিশালী দেশগুলো অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অন্যায়ভাবে আগ্রাসন চালাতে আরম্ভ করে।

* যখন এই সোনালী নীতি উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ, নিজের জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করো।

* আর যখন এসব কর্মকাণ্ড চরমসীমায় পৌঁছে তখন শান্তির নাম-গন্ধও আর অবশিষ্ঠ থাকে না।

যদি আজ বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, একটি বিশাল শ্রেণী দারিদ্রতা ও অন্যায়-অবিচারের শিকার। পরিশেষে এসব অবিচারই ঘৃণা ও ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের শক্তিশালী জাতিসমূহের বিশ্বের সীমাহীন দারিদ্রতা ও অন্যায়-অবিচারের কোনো সমাধান খুঁজে বের না করার কারণ কী? জাতিসংঘের উচ্চকক্ষের সভা ডেকে অন্যায় ও অন্যায্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা কোনো সমাধান নয়।

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এক্ষেত্রে একটি নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করেছেন, ***"শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের হৃদয়গুলোকে ঘৃণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করো"***। তিনি (সা.) বলেন, ***"তোমার যালেম ও মযলুম উভয় ভাইকেই সাহায্য করো"***। যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, নির্যাতিত ভাইকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম। কিন্তু যালেম ভাইকে কীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, যালেম ভাইকে যুলুম করা হতে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য করো, যাতে সে খোদার অসন্তোষ হতে রক্ষা পায়। মোটকথা, পৃথিবী হতে এসব অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা দূর করতে হলে এসব বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে, অত্যাচারী শক্তিশালী নাকি দুর্বল তা দেখার বিষয় নয়। ইচ্ছা ও সংকল্প যত বড়ই হোক না কেন এর ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না একে কার্যে রূপ দেয়া হবে। বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন, এরফলেই মানুষের ভেতর অনুপ্রেরণা এবং নিজের ওপর আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকারের নিশ্চয়তা বাঞ্ছনীয়। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব ঘোঁচাতে হবে। (আল্ ফযল, ৯ই এপ্রিল ২০১০ থেকে ১৫ই এপ্রিল, ২০১০- পৃ: ১০-১১)

আরেকটি বিষয় আজ বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আর তাহলো, অনেকে মনে করে, যেহেতু তারা

ধীমান, উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাধীন তাই ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তারা আরো মনে করে, ধর্মগুরুদের নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করায় কোনো সমস্যা নেই। মনে রাখবেন! একাজ মানবীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করার নামান্তর। এমনটি করলে তা হবে হৃদয়ে পুঞ্জিভূত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দূর করার একটি ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। এটি মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ এবং এরফলে নৈরাশ্যের নতুন-নতুন পথ উম্মুক্ত হয়। (আল্ ফযল ২৭ আগস্ট, ২০১০ থেকে ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১০-পৃ: ১২-১৩)

তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি স্বাধীনতা নয় বরং স্বাধীনতার নামে মানবতার মুখে এমন এক কলঙ্ক লেপন এবং অপকর্ম যা কখনো কখনো এই কলুষিতমনা গৃহবাসী সহ ঘরগুলোকেও ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দেয়।

হে উদাসীনগণ! নবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কখনোই ভালো নয়, এথেকে বিরত হও কেননা, তারা হয় ব্যাঘ্রদের আস্তানা।

আহমদীয়া জামা'তের ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধান করতে গিয়ে বলেন, 'কোনো ধর্মের প্রবর্তক বা ধর্মীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কথা বললে তা সমাজে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং শান্তি বিনষ্ট করে। বর্তমান সময় বিশ্ব এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর কারণে পূর্বেই বিভিন্ন অস্থিরতা বিরাজমান আর এই অবস্থাই মূলতঃ নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ। এসব সমস্যার মধ্যে ধর্মকে যুক্ত করা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। অথচ আমরা জানি, অনেকে নিজ হীন স্বার্থের কারণে সর্বদা নৈরাজ্য সৃষ্টির সুযোগ খুঁজতে থাকে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে পরস্পরের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।' (আল্ ফযল, ইন্টারন্যাশনাল ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১০-পৃ: ১০)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে UNO অর্থাৎ জাতীসংঘ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী এই চতুর্দেয়ালের ছত্রচ্ছায়ায় সেসব কাজ হচ্ছে তা দ্রুতগতিতে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে সুবিচারের দাবি পূর্ণ করার তাগিদ প্রদান করে নির্দেশ দেয় যে, যদি তোমাদেরকে নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও কোনো সাক্ষী দিতে হয় তবুও তোমরা ন্যায়ের ভিত্তিতে সাক্ষী দাও। কিন্তু আজ কত বিষয় এমন আছে যা এইসব সংস্থার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এই উদ্দেশ্যেই যেসব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তারা যেন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে ভবিষ্যতে বিশ্বকে কখনোই এমনসব বিভীষিকার সম্মুখীন হতে না হয়। যদি বড় বড় পরাশক্তি ভুক্তভোগী মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয় তবেই এক্ষেত্রে সংশোধন হতে পারে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময়ই যেন নিজেদের ভুল স্বীকার না করার সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল এবং পাঁচটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে রেজুলেশন পাশ হবার পূর্বেই তা প্রত্যাখ্যান করার অর্থাৎ ভিটো প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে এই সংস্থা কীভাবে অন্যকে সুবিচার প্রদান করতে পারে। (আল্ ফযল, ৯ এপ্রিল, ২০১০ -পৃ: ১০-১১)

হুযূর আনোয়ার (আই.) শান্তি ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি ন্যায়বিচারের দিকটি ধরে রাখা যেত তাহলে আজ আমাদের বিশ্বের এমন ভয়ানক পরিস্থিতি দেখতে হতো না, আজ পুনরায় যুদ্ধের লেলিহান শিখা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য হস্তক্ষেপের সময় যদি সুবিচার করা হতো তাহলে আমাদের বিভিন্ন সমরাস্ত্রের মুখোমুখি হতে হতো না। ক্রমাগত যুদ্ধ জাহায ও অস্ত্র-শস্ত্র বানানো হচ্ছে এবং বিশ্বের দেশে দেশে সৈন্যবাহিনীকে আরো সুদৃঢ় ও মজবুত করা হচ্ছে, এগুলোও দেখতে হতো না। যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হতো তাহলে আনবিক বোমা এবং রাসায়নিক অস্ত্র-শস্ত্র বানানোর ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিযোগিতা হতো না আর বিভিন্ন জাতি এসব ক্ষতিকর আবিষ্কারাদি নিয়ে গর্বও করতো না। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যদি বিশ্বের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে বলা যায় যে, ইতোমধ্যেই আরো একটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি রাখা হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ কোন না কোনভাবে এতে জড়িত, প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে অথবা অন্যদের বিরোধিতায়।

মোটকথা, কোনভাবেই সুবিচারের দাবি পূর্ণ করা হচ্ছে না। প্রতিদিন কোন না কোন নতুন বিরোধ দেখা দেয়। এখন কোন কিছুই আর লুকোছাপা নেই, বাহ্যত কিছু বলা হলেও তলে তলে ঠিকই নিজেদের স্বার্থ, কূটনীতি এবং অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে কি? এটি অনেক বড় একটি প্রশ্ন? পরিণামে ছোট এবং বড় প্রত্যেক দেশই পারমানবিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ হচ্ছে আর শত্রুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের হৃদয় ইর্ষা-বিদ্বেষে ভরে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বকে এক ভয়ানক ধ্বংসের দিকে ধাবমান দেখছি। বিশ্বের উন্নতির প্রতি জোর দেয়ার পরিবর্তে বিশ্বকে কীভাবে এই ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। প্রতিটি দল ও দেশ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ, আমিত্ব ও অহংকারের কারণে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন আর এথেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য।

[হুযূর আই.) বিশ্বের ক্ষমতাধর লোকদের সম্বোধন করে বলেন] অতএব, আমি বিনীতভাবে আপনাদের অনুরোধ করছি, হে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীগণ! বিশ্ববাসী আজ যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন এ সম্পর্কে তাদের অবহিত করুন, নতুবা আমাদের বংশধররা কখনোই এক আলোকিত ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে না বরং পথভ্রষ্টতার গভীর অমানিশায় নিমজ্জিত হবে। (হামবুর্গের রাথুয়াস-এ গ্রীন পার্টির উদ্দ্যেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা. ২০১১)

অতএব, আজ বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশসমূহকে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের উদ্বেগাকূল আহ্বানে কর্ণপাত করতে হবে। সম্মিলিতভাবে চিন্তা করতে হবে, নতুবা স্মরণ রাখুন; যে ধ্বংসের দিকে এরা এগুচ্ছে তা কোন সাধারণ ধ্বংস নয়। এটি একটি ভয়াবহ ঐশী কোপানলের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। আর যখন খোদার এরূপ শাস্তির বিকাশ ঘটে তখন মানুষকে এমন বিভীষিকাময় পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় যে, তা সে কখনো চিন্তাও করে

না। হাদীস শরীফে এ ধরনের ভয়াবহ ধ্বংসের উল্লেখ পাওয়া যায় যা থেকে জানা যায়, সে সময়ের ধ্বংসযজ্ঞে মানুষের মৃত্যুর কোন হিসাব থাকবে না। নিহত ও মৃতদের মাধ্যমে এই পৃথিবী এতটাই ভরে যাবে যে, যদি একটি পাখি একটি লাশের সাড়ির ওপর থেকে উড়তে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে চায় তাহলে সে ওড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলবে কিন্তু লাশ শেষ হবে না। এ যুগের ইমামও সেসব ধ্বংসের কথাই অগণিত স্থানে উল্লেখ করেছেন: "***সেই ধ্বংস নেমে আসবে বিভিন্ন শহরে এবং গ্রামে কস্মিনকালেও ধরাপৃষ্ঠে এর কোনো উপমা নেই এক আঘাতেই ঘর পরিণত হবে মাটির স্তুপে, প্রাণহানি এত বেশি ঘটবে যা গণনারও অতীত।***"

কিন্তু হে সেসব সৌভাগ্যবান লোকেরা! যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাস এবং নিবেদিতপ্রাণ ইমাম মাহদীর আহ্বানে সাড়া দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো তাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বয়আত এবং খলীফার আনুগত্যের এই দ্বারভুক্ত থাকবে ততক্ষণ এই আগুন তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, ***'আগুন আমাদের দাস বরং আমাদের দাসানুদাস'*** আর এমন দাসদের জন্যই এই সতর্ককারী ও সুসংবাদতাদার ঘোষণা: ***'সর্বত্রই আগুন! কিন্তু সেই অগ্নি থেকে তাদের রক্ষা করা হবে যারা বিস্ময়কর খোদাকে ভালোবাসে'।***

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আমার বক্তৃতায় একটি শেষ ও এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই আর তাহলো, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শান্তির প্রত্যাশা রাখে আর নিরাপত্তাও চায়, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের অধিকাংশই এই শান্তি লাভ করতে চায় না, তারা সেসব পথ অবলম্বন করতে সম্মত নয় যেপথে চললে শান্তি অর্জন সম্ভব। কেননা এই পথ যতটা সহজ ততটাই বন্ধুর। এই নীতি ও সমাধানের কথা বিশ্বস্রষ্টা পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, ***"আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমা ইন্নাল কুলুব"*** অর্থাৎ, শোন আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, আজ মানবতা খোদার স্মরণ হতেই দূরে চলে গেছে এবং একে ভুলে গেছে। অনেকে তো খোদার অস্তিত্বই অস্বীকার করে আর এ কারণেই তারা এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে চায় না। এবং যারা এতে বিশ্বাস রাখে তারাও ধর্মের নামে ধর্ম প্রবর্তকদের আনীত সত্যিকার শিক্ষামালা বিকৃত করে এমনসব মনগড়া ব্যাখ্যা করছে যা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে আলো-বাতাসকে পর্যন্ত বিষাক্ত করে ফেলেছে।

অথচ প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছে আর সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। সবশেষে বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে আবির্ভূত হন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মানবদরদী রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এসেছেন, যাতে তারা এক জাতিতে পরিণত হয় এবং ধরাপৃষ্ঠে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতির চিরন্তন এই ঘোষণা করেছেন, "লা ইকরাহা ফিদ্বীন" কেউ কুরআন মানুক বা না মানুক, আমার প্রতি ঈমান আনুক বা না আনুক মনে রেখ! আমি কোনো দারোগা নই, আমি একজন নবী।

আমার পক্ষ হতে ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করা হবে না, কেননা ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নেই। যদি আমরা অহিংসতার এই শিক্ষা গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় না বরং আরো বলে, এই অত্যাচারী, যে ধর্মের নামে তোমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে তাকে বলা হোক তুমি এবং আমরা মূলতঃ একই খোদার সৃষ্টি। সেই নবী এবং কিতাব যাকে তোমরা মানো তাও খোদার পক্ষ হতেই এসেছে। তোমরা যদি ইসলামের এরূপ অনুপম শিক্ষা এবং নবীকে না মানতে চাও তাহলে না মানো কিন্তু তোমাদের একগুঁয়েমির কারণে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করো না। আসো, প্রেম-প্রীতি ও সৌহাদ্যপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করি। আসো সেই বিষয়ে ঐকমত্য হও যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে অভিন্ন।

আর সবচেয়ে বড় অভিন্ন বিষয় হচ্ছে এক খোদার সত্তা। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়েছে, ***"কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তায়ালাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম"*** অর্থাৎ, তুমি বল, হে আহলে কিতাব তোমরা এমন এক কথায় একমত হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন। (সূরা আলে ইমরান:৬৫)

এ হলো সেই শিক্ষা যা মানুষের হৃদয় থেকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। এবং এই চেতনা সৃষ্টি করে যে, ধর্মীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও সবাই একই স্রষ্টা ও মালিকের সৃষ্টি, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের ধর্মীয় মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে থাকা উচিত। মানবীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত করা উচিত যাতে আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, যা বিশ্ব শান্তির জন্য একান্ত আবশ্যক।

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) এ যুগের ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং বিভীষিকাময় উৎকণ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং এর সঙ্গে সুসংবাদও দিয়ে গিয়েছেন যে, সত্যিকার ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করা হবে যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হবেন। তিনি শান্তির রাজপুত্র। সকল প্রকার ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত করার জন্য তিনি প্রেরিত হবেন। আর তিনি সমাজের সকল শ্রেণীতে বিরাজমান সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতনকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তিনি মানুষের হৃদয় থেকে সকল প্রকার ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূর করবেন, এবং তিনি এই মহৎ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন। আর নিজ অনুসারীদের সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন। কাজেই, খোদার সেই নবী এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের সেই মহান দূত এসে গেছেন। আর তিনি এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি প্রদান করেছেন যে, ন্যায়বিচার ছাড়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না, আর এজন্য সর্বোত্তম ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়া হচ্ছে প্রধান শর্ত। এই বিশ্বের সত্যিকার স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক গড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত আবশ্যক।

তিনি (আ.) বলেন, ***"সেই কাজ যেজন্য আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তাহলো, খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব বা পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করি। এবং সত্যের বিকাশ ঘটিয়ে, ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সন্ধির ভিত্তি রচনা করি।"***

অতএব, আজ বিশ্ববাসী শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে চাইলে পরস্পরের ভেতর প্রেম-প্রীতি, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে তুলুক। এবং এই সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত

নিজেদের সর্বস্রষ্টা খোদা ও বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া না হবে। খোদার সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধিই এসব অস্থিরতা ও অশান্তির মূল কারণ। কাজেই খোদার সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দূরত্ব ঘোচানোর কথা ভাবো আর যুগ ইমামের আহ্বান শোনো কেননা, এটি খোদার আহ্বান। তিনি অসময়ে আসেন নি। যুগ স্বয়ং তাঁকে ডেকেছে। খোদার এই মনোনীত ব্যক্তিকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে ঔদ্ধত্বপরায়ণ হয়ো না কেননা, এই ঔদ্ধত্বই খোদার শাস্তি বা ক্রোধকে ডেকে আনে। আর তাঁর ক্রোধ এমন কিয়ামত সৃষ্টি করে যে, এর কুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ভুগতে হয়।

আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বের এরূপ ঔদ্ধত্বপরায়ণ ও অনিষ্টকামী লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদা আমাকে সার্বজনীন ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব, নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেরূপে আমেরিকাতে ভূমিকম্প এসেছে তদ্রূপে ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে আসবে। এরমধ্যে কোনো কোনটি কিয়ামত সদৃশ্য হবে। এত লোক মরবে যে, রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে। এই মৃত্যু হতে পশুপাখিও নিষ্কৃতি পাবে না।

পৃথিবীতে এত ভংঙ্কর ধ্বংসলীলা নেমে আসবে যে, যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে এরূপ ধ্বংসলীলা আর কখনো আসে নি। অধিকাংশ অঞ্চল এরূপভাবে বিধ্বস্ত হবে যে, যেন সেগুলোতে কোনো জনবসতিই ছিল না। এর সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে, এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে এগুলো অস্বাভাবিক মনে হবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের গ্রন্থের কোনো পৃষ্ঠায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের ভেতর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হবে যে, এগুলো কি ঘটতে যাচ্ছে? অনেকে মুক্তি পেলেও অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন নিকটে বরং আমি দেখছি সেই দিন দ্বারপ্রান্তে। জগদ্বাসী একটি কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে। কেবল ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দেবে, এর মধ্যে কতক আকাশ হতে আর কতক ভূমি হতে।

এটি এ জন্য যে, মানবজাতী স্বীয় খোদার উপাসনা পরিত্যাগ করেছে এবং মন-প্রাণ, উদ্যম ও চিন্তা-ধারার ক্ষেত্রে তারা জাগতিকতার প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে যা এক দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলে রেখেছেন: ***"ওয়ামা কুন্না মুয়াজ্জাবিনা হাত্তা নাবয়াসা রাসূলা"*** (১৭:১৬) তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হয় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো? অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কখনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ অক্ষম হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করো না! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন আর তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি-সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে।" (হকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা:২৬৮-২৬৯)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) আরেকস্থলে বলেন, "মনে রেখো! মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মহামারী প্রাদুর্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং ভূমিকম্প ও প্লেগের আগমনের ঘোষণা পূর্ব হতেই নির্ধারিত আছে। এটি সেই হাদীসের অর্থ–যাতে লিখিত আছে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিঃশ্বাসে মানুষ মরবে এবং তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে, তাঁর ধ্বংসকারী নিঃশ্বাস কার্যকর হবে। ...বরং এই হাদীসের প্রকৃত মর্ম হলো, তাঁর প্রাণ সঞ্চারী পবিত্র বাণী যেমন বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হতে থাকবে এবং মানুষ তাঁকে অস্বীকারও করতে থাকবে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে হঠকারিতা দেখাবে, আর গালিগালাজ করবে, খোদার শাস্তিও তদ্রুপে তাদের অস্বীকারের ফলেই অবতীর্ণ হবে।

এই হাদীসই বলে দিচ্ছে, মানুষ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঘোর বিরোধিতা করবে। সেজন্য মহামারী ও গুরুতর ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হবে এবং ধরাপৃষ্ঠ হতে শান্তি উঠে যাবে। তা না হলে এর কোন অর্থ হয় না যে, সাধু ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ওপর অকারণে নিত্য-নতুন শাস্তির খরগ নেমে আসবে। পূর্ববর্তী যুগেও মানুষ এর জন্য প্রত্যেক নবীকে তাদের সৌভাগ্য আকাশের দুষ্টগ্রহ বলে মনে করেছে এবং স্বীয় কলংকের কালিমা তাদের ওপর লেপে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, নবী কখনও শাস্তি আনে না। বরং কোন জাতি শাস্তি লাভের উপযুক্ত হলে, সকল প্রকার যুক্তি দ্বারা তাদের ধ্বংসের পথ হতে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চূড়ান্ত চেষ্টা করার জন্য নবীর আবির্ভাব হয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করে। নবী না এলে কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হয় না।... তবে একি হল যে, একদিকে মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে আর অপরদিকে ভূমিকম্পের তান্ডবলীলাও পিছু ছাড়ছে না? হে মোহাচ্ছন্ন জগৎ! অনুসন্ধান কর! দেখ তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোথাও খোদার প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে–যাঁকে তোমরা অস্বীকার করছ।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, পৃ: ৩৯৯-৪০১)

অতএব, হে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে বসবাসকারী লোকসকল! উদাসীনতার পোশাক পরিত্যাগ করো আর খোদার এই মসীহ্‌র আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াও। খোদার এই দূতদের এবং তাঁর দ্বারের ফকিরদের তুচ্ছ এবং হেয় দৃষ্টিতে দেখ না, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদেরকে নিজেদের মাথায় তুলে নাও, কেননা, তারাই

তোমাদের জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

কথিত আছে যে, রোমান সম্রাট একদা প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার যন্ত্রণায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক চিকিৎসা করা হয় কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কেউ বলে, মুসলমানদের খলীফার খিদমতে কিছুটা তবার্‌রক এবং দোয়ার জন্য লিখুন তাহলে আশা করা যায় খোদা আপনার এই কষ্ট দূর করে দিবেন। অতএব, তিনি হযরত উমর (রা.)-এর খিদমতে বিস্তারিত বিবরণ লিখে জানান। এতে যুগ খলীফা রোমান সম্রাটকে দেয়ার জন্য তাঁর একটি ব্যবহৃত টুপি প্রেরণ করেন, এটি মাথায় পড়লে খোদা তাঁর যন্ত্রণা দূর করে দিবেন। পরাশক্তির অধিকারী রোমান সম্রাট অতি সাধারণ ও ময়লা টুপিটি দেখে ভাবেন হিরা-জহরত খচিত মুকুট এর পরিবর্তে ভরা মজলিসে এটি মাথায় দিয়ে বসতে হবে! তখন সে তাচ্ছিল্যভরে টুপিটি অন্যত্র সরিয়ে রাখেন। কিন্তু ব্যথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে বলেন, ঐ টুপিটিই নিয়ে আসো, সেটি মাথায় পড়ার পর ধীরে ধীরে তার যন্ত্রণা কমতে থাকে কিন্তু টুপিটি খুলে রাখলেই পুনরায় মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যেত। অবশেষে সেই মলিন টুপিটি মাথায় দিয়েই তাকে দরবারে বসতে হতো।

অতএব, বিশ্বের রাজা-বাদশাহ্‌ ও নেতৃবৃন্দগণ! খোদার এই মনোনীত পুরুষ এবং তাঁর অনুসারীদের তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করো না। কেননা, এরাই তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। হে পাকিস্তান, আরব, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও ধরাপৃষ্ঠে বসবাসরত লোক সকল! স্মরণ রেখ! বিশ্বের সকল দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী তোমাদের জন্য এক প্রকার তাবীজ বা রক্ষাকবজের মূল্য রাখে। আজ তোমাদের সকল প্রকার উৎকণ্ঠা ও দুঃখের অবসান এদের মাঝেই নিহিত। কাজেই, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে তার মৌলিক অধিকার সমূহ্‌ প্রদান করতঃ তাকে মর্যাদার আসনে স্থান দাও। তাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত হও।

কেননা, এর মাঝেই তোমাদের সকল সুখ। নতুবা স্মরণ রেখ! তোমরা খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত যুগ ইমামকে অস্বীকার করে, তাঁকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে, অসম্মান করে নিজ খোদাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলেছ।

"কুল মা ইয়া বাউবিকুম রব্বি লাউলা দুয়াউকুম ফাকাদ কাজ্জাবতুম"-এর সত্যয়নে এখন তোমরা ছাগপালের মত হয়ে গেছ, যাদের না আছে রাখাল আর না-ই কোনো তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু শোন! আর কান খুলে শুনে রাখো! প্রত্যেক আহমদীর একজন অভিভাবক আছেন কিন্তু তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। বিশ্বের সকল আহমদীর একজন ইমাম আছেন, যিনি তাদের রাখাল।

প্রত্যেক আহমদী ঘুমানোর পূর্বে নিজ হৃদয়ের আঙ্গিনায় এই প্রিয় ইমামের পদধ্বনি শুনতে পায়। তাঁর সান্ত্বনা প্রদানকারী হাতের শীতল স্পর্শ নিজ বক্ষে অনুভব করে। আর যে ব্যক্তি এই জ্যোতির্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল চেহার একবার দেখে সে নিমিষেই নিজের সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়। তার সকল উৎকণ্ঠা, প্রশান্তি ও নিরাপত্তায় রূপ নেয়। অতএব, আসো এবং নিজের উৎকণ্ঠিত জীবনের পরিবর্তে চিরন্তন শান্তিরূপী এই অনন্ত জীবনের সূরা পান করে শান্তি ও নিরাপত্তার দূর্গে প্রবেশ করো। আর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃত সেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও যা খোদার দিকনির্দেশনায় আহমদীয়া জামা'তের শ্রদ্ধেয় ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব বলছেন। তাঁর সেসব অমৃত বাণীর মাধ্যমেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

তিনি (আই.) বলেন, 'আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা বিশ্বকে ও মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। ... কেননা, আমরা আমাদের মনিব মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শিক্ষাকে মনেপ্রাণে অনুসরণ করি বলেই বিশ্বের এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে আমরা হৃদয়ে চরম মর্মবেদনা ও কষ্ট অনুভব করি। মানবজাতিকে ধ্বংস ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার প্রয়াসে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এ মর্মবেদনাই আমাদের চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। এজন্যই আমি এবং অন্য সকল আহমদী, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি।' (শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা: আল্‌ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুন, ২০১২)

'জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের কোন শক্তিই নেই। অন্যদের তুলনায় আমরা ক্ষুদ্র একটি ধর্মীয় দল যা বর্তমানে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে কোন যোগ্যতারই মূল্য রাখে না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমাদের দৃঢ় সংকল্প শেষ পর্যন্ত আমাদের সে স্থানে পৌঁছাবে যেখান হতে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা ভূমিকা রাখতে পারবো। অর্থাৎ সেই সার্বজনীন শান্তি, যার ভিত্তি হবে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা সম্মত। আর তখনই বিশ্ববাসী ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা হিসাবে চিনবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

(২৬ মার্চ ২০১১ সালের শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

এখন খোদার ক্রোধ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে, নূহের নৌকায় আরোহনকারীই এথেকে রক্ষা পাবে।

নিষ্ঠার সঙ্গে আমার কাছে আসো, এতেই কল্যাণ নিহিত, চতুর্দিকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা, একমাত্র আমিই নিরাপত্তার দূর্গ।

ওয়া আখিরুদ্দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
লন্ডন

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২য় কিস্তি)

আমাদের ওলামাবর্গ এ স্থানে যে **"লা তাসুব্বু ..."** আয়াতটি পেশ করেন– আমি অবাক, আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সাথে এর কি-বা সম্পর্ক?! এ মহান আয়াতটিতে তো কেবল গালিগালাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, এমনটি তো নয় যে, এতে সত্য তুলে ধরতে বারণ করা হয়েছে। আর সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ বিরুদ্ধাচারী যদি সত্যের অন্তর্নিহিত তিক্ততা দেখে একে গালিরূপে ধরে নেয় এবং এরপর উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ দিতে শুরু করে তাই বলে কি 'আম্‌রে মা'রূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ ও সত্য উত্থাপনের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া উচিত? এ ধরনের গালিগালাজ কি কাফিররা পূর্বে কখনও দেয় নি? আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সত্যের সমর্থন ও সত্য উত্থাপনের উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন, কেবল তাই নয় বরং প্রতিমা উপাসকদের দৃষ্টিতে যেসব প্রতিমা খোদার মর্যাদা লাভ করেছিল সেগুলোকে তিনি নিজ হাতে ভঙ্গও করেন। মিথ্যার সাথে আপস রফা ও নমনীয়তাকে ইসলাম কখনই-বা বৈধ বলে আখ্যা দিয়েছে? কুরআন করীমের কোথায় এরকম আদেশ রয়েছে? অতএব আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এই খোশামোদে নমনীয়তার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন, যারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে তাদের কুফরী অবস্থায় আপসরফা ও নমনীয়তাসূলভ ব্যবহার করে, তারাও তাদেরই মতো বেঈমান। আর তিনি মক্কার কাফিরদের উদ্ধৃতিমূলে বলেন, **"ওয়াদ্দু লও তুদহিণু ফা ইউদ্‌হিনুন"** (সূরা কালাম: ৯) অর্থাৎ 'মক্কার কাফিররা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তুমি যদি সত্য গোপনের মাধ্যমে (তাদের ধর্মের বিষয়ে) নমনীয়তা অবলম্বন কর তাহলে তারাও তোমার ধর্মের বিষয়ে নমনীয় হবে, নতি স্বীকার করবে।' কিন্তু ওরূপ সায় দেওয়া আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক অনুমোদিত নয়। মোট কথা, আপত্তিকারী কর্তৃক কুরআনের উক্ত আয়াতটি উপস্থাপনে কোন কিছু প্রতীয়মান হলে তা কেবল এ-ই যে, আল্লাহ্‌র পাক কালাম বোঝার ক্ষেত্রে আপত্তিকারীর কোন সংস্পর্শ নেই। তারা লক্ষ্য করে না যে, এ আয়াতটিকে সব রকম কঠোর বক্তব্য সম্পর্কিত বলে মনে করা হলে ন্যায়সঙ্গত বিষয়ের নির্দেশ ('আমর বিল মা'রূফ') এবং অসঙ্গত বিষয়ে নিষেধ ('নহ্‌য়ী আনিল মুনকার')-এর দ্বার যে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। আর এতে করে খোদা তা'লার কালাম দু'টি স্ববিরোধী কথার আকর বলে মানতে হবে, অর্থাৎ স্বীকার করতে হবে, এক তো তিনি সব রকম কঠোর বাক্য থেকে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কাফেরদের মনোরঞ্জনের জন্য তাগিদ দিয়েছেন, আবার নিজেই তাঁর নির্দেশ বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে দেন এবং সব ধরণের কঠোর শব্দ অস্বীকারকারীদের শুনিয়ে দেন। শুধু তাই নয় বরং কঠোর হতে তাগিদ করেছেন।

অতএব জানা উচিত, যে-সকল মৌলবী সর্বক্ষেত্রেই যেন কঠোর বক্তব্য থেকে খোদা তা'লা নিষেধ করেছেন বলে ধারণা করছেন– এটা কেবল তাদের বিচার-বিবেচনারই ত্রুটি মাত্র। নচেৎ সত্য উপস্থাপনের জন্য যে সব কড়া কথার প্রয়োজন যা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে নিজের প্রমাণ নিজেই বহন করে তা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে দেওয়া শুধু বৈধই নয়, বরং সময়োপযোগী অবশ্য-কর্তব্য বলে গণ্য, যাতে শৈথল্য ও অযথা নমনীয়তা ('মুদাহানা')-এর বিপদের শিকার না হতে হয়। খোদা তা'লার মনোনীত বান্দারা ওরূপ অনমনীয় তবলীগের ক্ষেত্রে কোনো অভিশাপকারীর অভিশাপ এবং কোনো তিরস্কারকারী তিরস্কারকে ভয় করেন নি। এ কি জানা নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে মুশরিকদের হিংসা-বিদ্বেষ যে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল তার আসল কারণ ওই সব কড়া ও কঠোর ভাষণই ছিল যা সে-সব অজ্ঞরা গালমন্দরূপে মনে করে নিয়েছিল? আর এ কারণেই অবশেষে অবস্থা 'বাকযুদ্ধ' থেকে 'অস্ত্র যুদ্ধে'র পর্যায়ে উপনীত হয়। নইলে প্রাথমিক অবস্থায় তো সেসব লোক ওরকম ছিল না, বরং তারা একান্ত দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলতো ঃ **"আশিকা মুহাম্মাদুন আলা রাব্বিহি"** অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন।" যেমন বর্তমান কালের হিন্দু (ধর্মাবলম্বী) লোকজনও কোনো কোনো নিভৃত-নির্জনবাসী ফকীর-দরবেশকে কখনও খারাপ বলে না বরং নজর-নজরানা (উপঢৌকন) দিয়ে থাকে।

এ স্থলে অত্যন্ত আফসোসের সাথে এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে জানাতে হচ্ছে আমার সম্পর্কে উল্লেখিত এ আপত্তিটি কেবল জনসাধারণের পক্ষ থেকেই নয়, বরং আমি শুনেছি, মূলতঃ এ আপত্তির উত্থাপনকারী হিসেবে কতিপয় উলামাও রয়েছেন। অতএব আমি তাদের মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্পর্কে এমন ধারণা তো পোষণ করতে পারি

না যে তাঁরা কুরআন শরীফ ও সাবেক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এরকম ধারণা করার কোনো অবকাশও নেই*। কিন্তু আমি জানি, বর্তমান যুগে ঈমানের জোর ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে দূরে ছিটকে পড়া ইউরোপের কৃষ্টি-কালচার আজকাল আমাদের ওলামা বর্গের অন্তরকেও কিছু মাত্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই তীব্র ধুলোঝড় প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাঁদের চোখও কিছুটা ধুলোসিক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁদের প্রাকৃতিক দুর্বলচিত্ততা সর্দিবৎ এর ছোঁয়াকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ কারণেই তাঁরা এ ধরণের ধ্যান-ধারণায় জোর দেন যেগুলোর কোনো ভিত্তি সহী হাদীস ও কুরআন করীমে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইউরোপের নৈতিক দর্শনমূলক পুস্তকগুলোতে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরণের নৈতিক মূল্যবোধগুলোতে ইউরোপ এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক (যুবতী) নারীর দিক থেকে একজন বিবাহযোগ্য পুরুষকে প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ আশাহত করা সমীচীন বলে বিবেচিত হয় নি। কিন্তু কুরআন করীম কি এসব নৈতিকমূল্যবোধের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে? পবিত্র কুরআন কি এমন লোকদের নির্লজ্জ ও বেহায়া বলে আখ্যায়িত করে না? আমি এ ধরণের উলামাকে কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাবধান হতে বলছি, তাঁরা যেন এরূপ ছিদ্রান্বেষণ ও এ ধরণের ধ্যান-ধারণা মনে স্থান দেওয়ায় সত্য ও সত্যানুসন্ধিৎসা থেকে দূরে ছিট্‌কে না পড়েন। তারা যদি আমার সঙ্গে লড়তে উদ্যত হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেদের শুষ্ক তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে যা-ইচ্ছা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি খোদা তা'লাকে ভয় করে কিছু মাত্রায় চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে এ বিষয়টি এমন কিছু নয় যা তাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারে। নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তির কর্তব্য সত্যকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়া। বরং একজন নগণ্যের চেয়েও নগণ্য ব্যক্তির মুখ দিয়েও যদি সত্যের বাণী উচ্চারিত হয়, আর কেউ যদি নিজে ভুল করে বা ভুল বুঝে থাকে তাহলে সে যেন নিজের ভুল স্বীকার করে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই নগণ্য ব্যক্তির কথা মেনে নেয় এবং 'আনা খাইরুম্ মিন্‌হু' (-'আমি তার চেয়ে উত্তম') হওয়ার দাবী না করে। অন্যথায় অহংকারী ও আত্মম্ভরী অবস্থায় কখনও সত্যতা ও যথার্থতায় উপনীত হতে পারবে না। বরং এমন ব্যক্তির ঈমানটুকুও ঝুঁকির মুখে বলেই দেখা যায়।

(স্থান-কাল-পাত্র ভেদে) শক্ত ভাষা বা কঠিন শব্দ ব্যবহারে এ-ও একটি হিকমত (তাৎপর্য) নিহিত রয়েছে যে, এতে করে সুপ্ত হৃদয়ও জাগ্রত হয় এবং যারা সত্য গোপনে নমনীয়তা পছন্দ করে এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি এক আলোড়ন জাগানো বার্তাস্বরূপ কাজ করে। যেমন হিন্দুদের মাঝে অধিকতর লোকের এ রকম অভ্যাস বা স্বভাব দেখা যায় যে, নিজে থেকে তাঁদের ঝাঁকুনি না দিলে তাঁরা সত্য গোপনে নমনীয়তা বজায় রেখে সারা জীবন বন্ধুবেশে ধর্মীয় বিষয়াদির পক্ষে সায় দিতে থাকবেন। বরং অনেক সময় তাঁরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও ইসলামের সাধক আওলিয়া দরবেশদের গুণকীর্তনেও মগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের হৃদয় ও অন্তঃকরণ চরম পর্যায়ে তমসাচ্ছন্ন ও প্রকৃত সত্য থেকে সুদূর পরাহত হয়ে থাকে। তাঁদের সামনে যদি সত্যকে, এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিক্ততাসহ যথার্থ মাত্রায় পুরোপুরি প্রকাশ করা হয় তাহলে এর ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে সত্য গোপনে তাঁদের নমনীয়তার স্বভাব দূর হয়ে যায় এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁরা তাঁদের অস্বীকার (সুলভ মনোভাব) ও বিদ্বেষ খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। অন্য কথায় তাঁদের যক্ষ্মারূপ সুপ্ত ব্যাধি যেন তাঁদের মধ্যে জ্বরের আকারে প্রকাশ পায়। কাজেই এ ঝাঁকুনি একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট মানুষের মনে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা একজন অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে দারুণ আপত্তির কারণ, কিন্তু অন্যদিকে একজন সচেতন সংবেদনশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে এ ঝাঁকুনিই মানুষকে সত্যাভিমুখি করার জন্য প্রথম ধাপ বিশেষ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রোগের (বিষাক্ত) উপসর্গসমূহ গোপন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে-রোগের কোনো চিকিৎসা হতে পারে না। বিষাক্ত পদার্থ প্রকাশিত হওয়াকালীন রোগের সব রকম প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নবীগণ যে (ক্ষেত্রবিশেষ) কঠিন শব্দ ও কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এতে করে ঝাঁকুনী দেয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যাতে মানুষের মাঝে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং এই আঘাতে তারা জেগে ওঠে এবং দ্বীন তথা প্রকৃত ধর্মের দিকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা সুলভ তাদের

---

* টীকা ঃ কুরআন করীম যে উচ্চৈস্বরে কঠোর ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে একজন চরম নির্বোধ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অনবহিত থাকতে পারে না। যেমন বর্তমানকালের সভ্য-সুশীলদের মতে কারও প্রতি অভিশাপ পাঠানো একটা কঠিন গালি বলে গণ্য কিন্তু কুরআন করীম কাফিরদের শুনিয়ে শুনিয়ে অভিশম্পাত করে। যথা বলে ঃ "উলাইকা আলাইহিম লা'নাতুল্লাহি ওয়াল মালাকিয়াতি ওয়ান নাসি আজমায়ীনা খালেদীনা ফীহা (২য় পারা সূরা বাকারা ঃ ১৬২, ১৬৩) "উলাইকা ইয়াল্ আনুহুমুল্লাহু ওয়া ইয়াল্‌আনু হুমুল লায়েনূন" (২য় পারা সূরা বাকারা ঃ ১৬০) তেমনি এটাও স্পষ্ট যে, কোন মানুষকে পশু বলাটাও এক ধরনের গালি। কিন্তু কুরআন করীম কাফির তথা অস্বীকারকারীদের কেবল পশুই নয় বরং দুনিয়ার সব পশুর চেয়ে নিকৃষ্টতর বলে আখ্যায়িত করে। যেমন বলে ঃ "ইন্নাশ্ সার্‌রাদ্ দাওয়া-ব্বি ইন্দাল্লা-হিল্‌লাযীনা কাফারু" (সূরা আন আনফাল)। আর তেমনি এটা স্পষ্ট যে নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তির নাম নিয়ে বা ইঙ্গিতে তাকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে মন্দ বলা অধুনা কালের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিরোধী। কিন্তু খোদা তা'লা কুরআন শরীফে কারও নাম আবু লাহ্‌ব কারও নাম কুকুর ও শুকর বলেছেন আর আবু জাহল তো স্বয়ং প্রসিদ্ধই বটে, তেমনি ওলীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে চরম পর্যায়ের কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে, যা দৃশ্যতঃ নোংরা গালিগালাজ বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন বলে ঃ 'ফালা তুতিয়িলমকায্‌যিবীনা ওয়াদ্দু লও তুদ্‌হিনা ফা ইউদ হি নূ ওলা তুতি' কুল্লা হাল্লাফিন মাহীন হাম্মাযিন মাশ্‌শায়িম্ বিন্নামীম মান্নায়িম বিল্ খাইরি মু'তাদিন আসীমিন উতুল্লিন বা'দা যালিকা যানীম–সানাসিমুহু আলাল খুর্তুম (দেখুন সূরা আল-কালাম ঃ ৯-১৭; পারা ২৯)। অর্থাৎ তুমি এ সকল প্রত্যাখ্যানকারীর কথায় (সায় দিয়ে) পরিচালিত হবে না যারা মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তুমি যেন তাদের উপাস্যদের মন্দ না বল এবং তাদের ধর্মের কুৎসা না কর। তবেই কি-না তারাও তোমাদের ধর্মের সম্পর্কে মন্দ বলবে না এবং সমর্থন পোষণ করতে থাকবে- তুমি এদের তোষামোদি চাটুকারিতায় ধ্যান দিয়ো না। সত্য গোপনে এরূপ পাল্টাপাল্টি নমনীয়তা প্রত্যাশী ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যা হলপকারী, রায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলচেতা, নীচ, হীন, ছিদ্রান্বেষী, পরনিন্দা ও চোগলখোরির মাধ্যমে মানুষের ভেতর বিভেদ সৃষ্টিকারী, পুণ্যের পথে বাধা দানকারী, ব্যভিচারী, এতদসহ সে চরম পর্যায়ের দুশ্চরিত্র–এ যাবতীয় দোষে দোষী হয়ে সে জারজও বটে। অচিরে আমরা শুকরের মতো অনেক লম্বা নাকে ছ্যাঁক বা দাগ দেবো অর্থাৎ এমন নাক বলতে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির ভয় সংকোচ ও প্রতিপত্তির পক্ষপাতিত্বকে বোঝায় যা সত্য গ্রহণে বাধা দেয় (হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমাদের জাতির মাঝে উঁচু নাকধারীদের শুধরিয়ে দিন)। এখন হে সম্মানিত মৌলবী সাহেব আপনার দৃষ্টিতে উক্ত শব্দাবলীর ব্যাপক আওতার বাইরেও কি কোনো গালমন্দ অবশিষ্ট রয়ে গেছে? এ স্থলে অতি উত্তম একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব হলো, ওলীদ বিন মুগিরা নমনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে (সত্য গোপনে) তাদের ক্ষেত্রেও নমনীয় হওয়ার জন্য প্রত্যাশী হয়েছিল। এর উত্তরে তার সব পর্দা খুলে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত যে মুসলিমদের কাছে সত্য গোপনে নমনীয় হওয়ার প্রত্যাশা করো না (গ্রন্থকার)।

(সজাগ) দৃষ্টি প্রসারিত হতে শুরু করে। ফলে তাঁরা সে-পথে পরিচালিত হতে শুরু করেন। যদিও তাঁদের সে-পদচারণা বিরোধিতামূলকই হোক না কেন। আর এতে করে তাঁরা সত্যবাদীদের অন্তরের সাথে নিজের অন্তরের একটা সম্পর্ক রচনা করেন যদিও সেটি বিরূপ ভাবাপন্ন সম্পর্কই হোক না কেন। এ বিষয়ের দিকেই যেন ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেছেন ঃ **'ফি কুলূবিহিম মারাদুন ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদান'** [অর্থাৎ তাদের অন্তরে রয়েছে এক ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের সে-ব্যাধি বাড়িয়ে দেন (সূরা বাকারা ঃ রুকু -২)–অনুবাদক]।

নিশ্চয় বুঝা উচিত, দ্বীন-ইসলামকে সত্যিকার অন্তর দিয়ে একদিন সেইসব লোকই গ্রহণ করবেন, যারা জোরালো জাগানিয়া ঝাঁকুনিগুলোর কারণে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠে ব্যাপৃত হয়েছেন এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন, যদিও তাদের পদচারণা (আপাতত:) বিরোধিতামূলকই হোক না কেন। হিন্দুদের সেই পূর্বেকার (প্রথম) রীতি-নীতি ও পদ্ধতি আমাদের অত্যন্ত হতাশ করতো–তারা তাদের অন্তরে এ পদ্ধতিটিকেই বেশি পছন্দনীয় ও উপযুক্ত বলে মনে করতো যে মুসলমানদের সাথে কোনো ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করা উচিত নয় এবং তাদের সাথে সব ক্ষেত্রে ঐক্যভাব ও সমর্থন পোষণ করে (দায়সারা ভাবে) সময় কাটানো উচিত। কিন্তু এখন তারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এগিয়ে এসে এবং ময়দানে (প্রকাশ্যভাবে) দন্ডায়মান হয়ে আমাদের (যুক্তি-প্রমাণ, তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের) ধারালো অস্ত্রসমূহের মুখে এর আঘাতাধীন এসে গেছেন এবং হাতের নাগালে আসা সেই শিকারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছেন যা একই আঘাতে কাবু হয়ে যেতে পারে। তাদের মৃগসুলভ উদ্বিগ্ন ছোটাছুটিকে ভয় করা উচিত নয়। তারা শত্রু নয়। বরং তারা তো আমাদের শিকার। অচিরেই সে-যুগ আসন্ন যখন আপনারা চোখ মেলে কোন হিন্দু পরিদৃষ্ট হয় কি না, দেখতে চাইলে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যকার একজন হিন্দুও দৃষ্টিগোচর হবে না। অতএব আপনারা তাদের উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় বিচলিত ও নিরাশ হবেন না। কেননা তারা ভেতরে-ভেতরেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং ইসলামের সদর-দরজার নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি আপনাদের সত্য-সত্য বলছি, যাদের আপনারা আজ বিরুদ্ধাচারী ও উত্তেজনায় ভরা দেখতে পাচ্ছেন, স্বল্প সময়কাল পরে তাদের এরকম আর দেখতে পাবেন না। সাম্প্রতিককালে আর্য সমাজি হিন্দুরা যে আমাদের ঝাঁকুনির কারণে বাহাস-বিতর্কের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে এতে তাদের আচরণ ও ভূমিকা যত কঠোরই হোক এবং তারা গালিগালাজ ও নোংরা কথাবার্তায় ভরা যত বই-পুস্তক প্রকাশ করুক, কিন্তু নিজেদের এই উত্তেজনা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্যে তারা জাতির সামনে পথ খুলে দিচ্ছে। আর আমাদের ঝাঁকুনি সমুহের বস্তুতপক্ষে কোনো মন্দ ফল দাঁড়ায় নি। তবে এ সকল ঝাঁকুনি কীভাবে বড় বড় সঙ্গীন হৃদয়গুলোকে এ দিকে টেনে আনছে– এ অভিজ্ঞতাটি কোনো আনুমানিক ও সংশয়মূলক অভিমত নয়।

বরং এটি এক নিশ্চিৎ ও অবধারিত ব্যাপার বটে। কিন্তু আক্ষেপ ওই সব লোকের প্রতি যারা কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না এবং তাড়াহুড়ো করে আপত্তি উত্থাপনে দাঁড়িয়ে যায়। খোদা তা'লা সত্য গোপনে নমনীয়তা প্রদর্শন থেকে আমাদের অবশ্যই স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু খোলামেলাভাবে সত্য প্রকাশ করা থেকে এর তিক্ততা ও তীব্রতার আশঙ্কায় নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কোথায়ও আদেশ দেননি। **"ফা-তদব্বারু আইউহাল উলামাউল্ মুস্‌তা'জেলুন আ-লা তাক্‌রাউনাল ফুরক্বান মা লাকুম কাইফা তাহ্‌কামুন?"** (অর্থঃ 'অতএব হে ত্বরিৎমতি উলামাবৃন্দ আপনারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। আপনারা কি ফুরকানে মাজীদ (আল-কুরআন) পাঠ করেন না? আপনাদের কী হয়েছে, আপনারা কেমন বিচার করেন?! – অনুবাদক)।

আমার একজন আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান বন্ধু মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব। যিনি একজন শিক্ষিত যুবক ও নতুন শিক্ষা-দীক্ষার রঙে রঙীন। সংবেদনশীল চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মানুষ তিনি। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ের ওপর আমার সত্যিকার প্রেমিক, আমার প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের মুরব্বী ও শিক্ষকসুলভ প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে আছে। এখন তিনি কাদিয়ানে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছেন। তিনিও প্রকৃত কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-শিষ্টাচার সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রণয়ন করে প্রকাশ করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কেননা স্বনামধন্য মৌলবী সাহেব এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝেন যে, প্রকৃত কৃষ্টি-কালচার বা সভ্যতার পথ আসলে সেটিই বটে, যে-পথে নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) পদচারণা করেছেন। যে পথে কঠিন শব্দ ও কঠোর ভাষা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তিক্ত ও তীব্র ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ একেবারে হারামের মতো বিবেচিত হয় নি। বরং এমন কর্কশ শব্দাবলীর যথাস্থানে প্রয়োজনে সমীচীন মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রত্যেক প্রচারক ও সদোপদেশদাতার সময়ানুগ কর্তব্য বটে। যা পালন করায় কোনো সদোপদেশদাতার পক্ষে আলস্য বা অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

এমনটি করলে প্রতীয়মান হবে যে, শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য গয়র-আল্লাহ্‌র ভয় তার হৃদয়ের ওপর প্রবল, আর তার ঈমানী অবস্থা এমন দুর্বল যেমন কোনো কীটপতঙ্গের প্রাণ দুর্বল হয়ে থাকে। অতএব আমি ওই বন্ধুর জন্য দোয়া করি, খোদা তা'লা যেন এরূপ পুস্তক প্রণয়নে 'রুহুল কুদুস' (পবিত্রতা) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেন। আমার মতে উত্তম হবে তিনি যেন তাঁর এ পুস্তকের নাম (কেবল) 'কৃষ্টি-কালচার বা সভ্যতা'-ই রাখেন।

আমি জানতে পেরেছি, আমার এ বন্ধু (উক্ত পুস্তক প্রণয়নের) এ উদ্দীপনা পেয়েছেন জনৈক মৌলবী সাহেবের আপত্তি থেকে যা তিনি এ অধম সম্পর্কে আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গেই উত্থাপন করেছিলেন। আমার বন্ধুর কাদিয়ানের দিকে আসার পথে ঘটনাচক্রে লাহোরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে মৌলবী সাহেব প্রশ্নটি করেছিলেন। হে আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা! যদিও আবহমান কাল থেকে তোমার এ সুন্নত ও রীতিই রয়েছে যে তুমি অশিক্ষিত শিশু সুলভ লোকদের বুঝার শক্তি দান করে থাকো এবং এ দুনিয়ার দার্শনিক ও ফিলোসফারদের চোখ, কান ও হৃদয়ের ওপর অন্ধকারের গভীর পর্দা ফেলে দিয়ে থাকো।

কিন্তু তোমার দরবারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এ লোকদের মধ্যে থেকেও এক জামাত (দল) আমার দিকে আকৃষ্ট করে আনো, যেমন কয়েকজনকে এনেছও এবং তাদেরকেও চোখ, কান ও হৃদয় দান কর, যাতে তারা দেখে, শোনে ও বুঝে এবং তোমার সেই নেয়ামত যা যথাসময়ে তুমি নাযেল করেছো এর কদর ও মর্যাদা শনাক্ত করে তা আহরণে মনযোগী হয়। তুমি চাইলে এমনটি করতে সক্ষম। কেননা তোমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আমীন, সুম্মা আমীন। (চলবে)

ভাষান্তর : ***মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ***
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জলসা সালানায় যোগদানকারী মেহমান ও মেজবানদের জন্য উপদেশ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

জামা'তে আহমদীয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের একটি হচ্ছে সালানা জলসা। জলসার গোড়াপত্তন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ হাতে রাখেন। তিনি জলসার অপরিসীম গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য এবং কল্যানের কথা বলেছেন। তিনি মেহমান এবং মেজবানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জলসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একবার তিনি জলসার গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেন,

"এ জলসাকে অন্যান্য সাধারণ সভার মত মনে করবে না। এটি এমন বিষয় যা কেবল মাত্র সত্যের সাহায্যের জন্য এবং খোদার বাক্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ জামা'তের ভিত্তি খোদাতা'লা নিজ হাত দ্বারা রেখেছেন। এর জন্য জাতি প্রস্তুত করেছেন যারা পরবর্তীতে খুব শীগ্রই এসে মিলিত হবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাজ যার সামনে কোন কিছুই টিকতে পারে না।"

তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে এ লিল্লাহি জলসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সহায় হোন এবং তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের বিপদ ও কষ্টের অবস্থা তাদের জন্য সহজ করে দিন। তাদের দুঃখ ও চিন্তা দুর করে দিন। তাদেরকে প্রত্যেক প্রকার কষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাদের জন্য খুলে দিন। কেয়ামতের দিন তাদেরকে ঐ সকল বান্দার সাথে উত্থিত করুন যাদের প্রতি তিনি রহম করেছেন। তাদের সফরের সমাপ্তি তাদের জন্য যেন উত্তম হয়।" (ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, ৩৭২পৃ:)

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) ১৯৯৮ইং: হতে ২০০০ইং: সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জলসায় মেহমানদের এবং মেজবানদের যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

মেহমান ও মেজবানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ
যিকরে এলাহী ও দরুদ পাঠে সময় অতিবাহিত করুন

আল্লাহ্‌র স্মরণ ও দরুদের মাধ্যমে নিজেদের সময় অতিবাহিত করুন এবং নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায় করুন। বৃথা কথাবার্তা পরিত্যাগ করুন। পরস্পর কথাবার্তায় নিচু আওয়াজ ও নম্রতা অবলম্বন করুন। কঠোর ভাষা আপনাকেও কষ্ট দেয় আবার যাকে বলেন তার জন্যও কষ্টদায়ক হয়। যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ্‌র খাতিরে তা হজম করুন, ধৈয্য ধারন করুন। এর ফলে আপনি পুত:পবিত্র থাকবেন। জলসার অনুষ্ঠান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

কারো পদস্খলনের কারন যেন না হোন

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তি যে অন্যের পদস্খলনের কারন হয় তার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করাই ভাল ছিল। যেখানে কারো মাধ্যমে ঠোকর খাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে এটা অনেক বড় ধরনের অন্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। সেটা স্থানীয় বন্ধু হোক বা দুর থেকে আগত মেহমান হোক প্রত্যেকের নিজেকে সংযত রাখা উচিত।

নিজেদের কেন্দ্রের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত

আপনারা পৃথিবীতে কেবল তখনই এক জামা'ত বলে বিবেচিত হবে যখন আপনারা জগতে খোদার রুহের নিচে এক আত্মা হয়ে তা প্রকাশ করবেন। রুহ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য হৃদয় পরিস্কার হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌র রঙে এমন আত্মাই রঙিন হয়। আপনারা একজন আরেকজনের সাথে যখন স্বাক্ষাৎ করবেন এতে কখনো একাত্মতা নষ্ট হবে না। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য অন্যরা কি কখনো এটা অনুভব করেছে।

ইবাদতকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিন

একটি কথা আমার সর্বদা মনে হয় তা হচ্ছে ইবাদতকে প্রাধান্য দিন। জলসার মানে হচ্ছে ইবাদতকারীদের সমাবেশ। জলসা এ উদ্দেশ্যে করা যেন খোদার বান্দাগণ খোদার হয়ে যান আর এটি ইবাদত ব্যতিরেকে হতে পারে না। রুহ পরিস্কার করার যে কথা আমি বলেছি এটির একটাই পদ্বতি আর তা হচ্ছে যতবেশী খোদার ইবাদত করবেন ততবেশী খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এতে না আপনি কারো পদস্খলনের কারন হবেন আর না নিজের পদস্খলনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইবাদতগুজার মানুষের ওপর ফিরিশতা অবতীর্ন হয়। এদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আমরা এ পৃথিবীতেও তোমাদের সাথে আছি আর পরকালেও তোমাদের সাথেই থাকব।

সালামের প্রচলন করুন

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, ***"আফশুস সালাম"*** অর্থাৎ সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। আপনারা এ অভ্যাস তৈরী করুন। সালাম দেয়াতে দু'টি বিষয় সামনে ভেসে উঠে। একটি হচ্ছে আপনি আগমনকারী সবাইকে সম্মান করছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাম দেয়ার মানে আপনি তাকে অবগত করছেন আমার পক্ষ থেকে তোমার ভয়ের কোন কারন নেই। আমার পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে সে শান্তিতে থাকবে। এ দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে আপনারা অনেক বেশী সালাম দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমার মনে আছে কাদিয়ানে এক ব্যক্তি ছিলেন

তিনি কোন মানুষকে দেখলেই অনেক দুর থেকেই উঁচু আওয়াজে সালাম দিতেন। হযরত শের আলী (রা.)-এরও একই অভ্যাস ছিল তিনিও উচু আওয়াজে সালাম দিতেন।

মহিলাগণ পর্দা অবলম্বণ করুন

মহিলাদেরকে আমি সর্বদা উপদেশ দেই আপনারা পর্দা করুন। আপনি আহমদী এবং মেহমান হিসাবে জলসায় এসেছেন তো আপনার জন্য পর্দা করা আবশ্যক। তাদের পিতা-মাতাদের উচিত তাদের সন্তানদেরকে পর্দার সাথে চলাফেরা করা শিখানো। ঐ সমস্ত মেয়েরা যাদের পর্দা করার বয়স হয় নি কিন্তু একেবারে ছোট নয় তাদের নিজেদের বক্ষ ঢেকে চলা উচিত এবং মাথা এমনভাবে ঢাকা উচিত যাতে তাদের চুল দেখা না যায়।

আপত্তি করার পরিবর্তে সুধারনা রাখুন

যদি কোন সম্মানিত মহিলা মেহমান আসে আর সে যদি পর্দা না করে তাহলে মনে রাখবেন সে তো আহমদী নন। কিন্তু আরব দেশ সমূহ থেকে যে সকল মহিলা আসেন তারা আমাদের মতোই পর্দা করেন। আমি ব্যবস্থাপনাকে বলব, তারা যেন তাদেরকে কঠিন ভাষায় কোন কথা না বলে বরং বলে দেয় যে, তুমি পর্দা করে ঘুরো। যদি এ ধরনের মহিলাদেরকে নসিহত করার বিষয় থাকে তাহলে এমন মেয়েদের ডিউটি দিন যারা নরমভাবে কথা বলতে পারে। তাদেরকে পৃথক স্থানে আলাদাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করুন। উপদেশ অবশ্যই কাজে লাগে।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা

জামা'তে আহমদীয়ার যে ব্যবস্থাপনা তা সমস্ত পৃথিবীতে এক রকম। কোথাও কোন স্ব-বিরোধিতা নেই। আমাদের জামা'তের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থাপনা তা পৃথিবীর কোথাও কোন ছোট বা বড় সমাবেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটার কিছু দিক আছে তা আমি পরিস্কার করে বর্ণনা করতে চাই। সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা তো হচ্ছে আপনারা নিজেরা। যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাদের মনে হয় তার দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে তো তার ব্যাপারে কয়েকটি কথা লিখে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিন। আমার উপদেশ হচ্ছে আগমনকারী এবং যারা অবস্থান করছেন সকলেরই নিজেদের ডানে আর বামে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি কেউ কোন অঘটন ঘটাতে চায় তো তাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, তাই আমরা নিজেদের চার পাশে সজাগ দৃষ্টি রাখলে তাদের পক্ষে কোন ধরনের অঘটন ঘটানো সম্ভব নয়।

আসলে প্রকৃত নিরাপত্তাদাতা তো আল্লাহ্ তা'লা কিন্তু তিনি যে জাগতিক পদ্বতি শিখিয়েছেন তা অবলম্বন করাও জরুরী। আপনারা বাহ্যত যাকে ভাল মানুষ হিসাবে দেখছেন তার মাঝেও দুষ্টামীর বিষয় থাকতে পারে তাই নিরাপত্তার দায়িত্ব সকলের জন্য আবশ্যকীয় করে নিন। যদি আপনারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহলে জেনে রাখুন, পৃথিবীতে কখনো কোন নেতার সভা সমাবেশে না এ রকম নিরাপত্তা হয়েছে আর না তা হতে পারে। একটি এ রকম বাহিনী থাকা উচিত যারা সিভিল কাপড়ে সাধারণ লোকের মাঝে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘোরাফেরা করবে। তাদের নিকট অবশ্যই পাস থাকা জরুরী, যদি কোথাও তাদেরকে কেউ আটকিয়ে দেয় তাহলে সে যেন দেখাতে পারে আমি বিশেষ নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি। তবে এ কাজের জন্য মোবাইল টিমের বিকল্প নেই। নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট পাহাড়াদারের তুলনায় অপরিচিত লোকের বেশী প্রয়োজন যারা তাদেরকে চিনে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনারা এ কাজের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেহমানদেরকে শামিল করুন, তারাও মেজবানের মত জামা'তের সেবা করবে।

অন্যান্য বিষয়

* যদি নামায বা জলসা চলাকালীন সময়ে কোন শিশু কান্না করে তো তাকে দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে নেয়া উচিত। অন্যান্য বছরের মত এবারও ছোট বাচ্চাসহ মায়েদের জন্য পৃথক তাবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* সময়ের প্রতি খেয়াল রাখুন, জলসার বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মাঝে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। মসজিদ, থাকার জায়গা এবং পুরো এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন। বিশেষভাবে গোসলখানা পরিস্কার রাখুন।

* লন্ডনে গাড়ী পার্ক করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। অনেকে আছেন মানুষের ঘরের সামনে গাড়ী পার্ক করেন এর ফলে প্রতিবেশীর কষ্ট হয়। কোন অবস্থাতেই কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কারো রাস্তা বন্ধ করা উচিত নয়। কারো রাস্তায় গাড়ী পার্ক করা ঠিক নয়।

* লঙ্গরখানায় নামাযের ব্যবস্থা থাকা দরকার। নিরাপত্তাকর্মীগণ যেন অবশ্যই নামায আদায় করে। তাদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এটা খেয়াল রাখা।

* জলসায় প্রবেশ করার সময় নিজেদের পক্ষ থেকেই চেকিংয়ের জন্য উপস্থিত হওয়া উচিত। এ রকম যেন না হয় আপনাকে জোর করে চেকিংয়ের জন্য নিয়ে আসতে হচ্ছে।

* সর্বদা রেজিষ্ট্রেশন কার্ড লাগিয়ে রাখুন। যদি কোন ব্যক্তি কার্ড ছাড়া দেখা যায় তাহলে তাকে নরমভাবে বুঝানো উচিত ভাই কার্ডটি ঝুলিয়ে রাখুন।

* নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্রের দিকে খেয়াল রাখুন। কেননা এ রকম বড় সমাবেশে অনেক সময় কিছু দুষ্ট লোক নিজেদের চেহারা পরিবর্তন করে মানুষের পকেট কাটার জন্য এসে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোন বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে আসলে তো তা উঠানো ঠিক নয় কিন্তু কেউ হয়ত অন্য নিয়তে উঠিয়ে নিবে তাই সঠিক হবে তা উঠিয়ে নিয়ে হারানো বস্তু সংক্রান্ত ডেস্কে জমা দেয়া। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাপ্ত বস্তুটির ঘোষণা করা।

* একইভাবে হারানো শিশুদেরকেও হারানো ডেস্কে পৌছিঁয়ে দেয়া উচিত। তারা তাদের নাম মাইকে ঘোষণা করে দিবে।

ভিসার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা

যারা জলসার নামে ভিসা নিয়েছেন বা জলসার সম্পৃক্ততা আছে তাদের সরকারের সাথে ধোকাবাজি করা উচিত নয়। অনেকে বলে আমরা তো তাদেরকে জলসার কথা বলি নি। এগুলো সব ফাকিঁবাজি কথাবার্তা যা করা গুনাহর কাজ। তাই এ সকল পদ্বতি অবলম্বন করা উচিত নয়। আপনারা জলসা শেষ করে ফেরত যান এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। আল্লাহ্ চাইলে আপনাদের জন্য এ থেকেও ভাল ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

মেহমানদের জন্য দিক নির্দেশনা

জলসায় আগমনকারী সবার উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদা প্রাপ্তি তারা কেবল আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যেই এসেছেন। অথবা এটা বলা দরকার, তাদের কেবল খোদার উদ্দেশ্যেই আসা উচিত। অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যকে একদিকে রেখে দেয়া উচিত। অনেকে এখানে বা অন্য কোন দেশে আশ্রয় খোঁজার নিয়তে আসেন, তাদের মনে রাখা উচিত, হ্যাঁ, আশ্রয় প্রার্থনা করা তাদের অধিকার কিন্তু জলসায় এসে এটা করা ঠিক নয়। বরং জামা'তী দৃষ্টিতে এটা অনেক বড় অপরাধ। কেননা

তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে জাগতিকতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

আমি আশা রাখি, একজনও এ রকম নাই যারা এ উদ্দেশ্যে জলসায় যোগদান করবে। যদি কোন ব্যক্তি জলসাকে ব্যবহার করে জাগতিকতাকে প্রাধান্য দেয় তো আমি তাকে সত্যি সত্যি বলছি, সে সারা জীবন ক্ষমা পাবে না। তাকে একেবারে জামা'ত থেকে বের করে দেয়া হবে। আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হবে।

জলসার ব্যবস্থাপনার আনুগত্য

জলসার ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। এরূপ আনুগত্য করা দরকার যার আনুগত্য করা হচ্ছে সে যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে দেখে জাগতিকভাবে তার কোন যোগ্যতা না থাকা সত্বেও কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে তার সামনে মাথা নত করছে। এটা হচ্ছে আহমদীয়াতের সত্যিকারের আনুগত্যের মান।

পথের অধিকার

হযরত রসূল করীম (সা.) রাস্তার হক আদায়ের বিষয়টিকে ঈমানের অঙ্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন। একটি বিষয় হচ্ছে, যে সকল বাজার বা দোকান আছে তার চার পাশে জমাট বেঁধে দাঁড়াবেন না। দোকান থেকে যা নেয়ার তা নিয়ে খোলা জায়গায় খাবেন এবং পান করবেন। অনেকে গরম কাবাব খাওয়ার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি গরম কাবাব খাওয়ার এতই ইচ্ছা থাকে তাহলে ঘরে গিয়ে তৈরী করুন। এ ছাড়া রাস্তায় মানুষকে কষ্ট পৌঁছাতে পারে এ ধরনের জিনিস দেখলে তা তৎক্ষনাৎ উঠিয়ে ফেলে দেয়া উচিত। যেমন: কলার ছিলকা ইত্যাদি। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা উচিত নয়। যেখানে কষ্টদায়ক বস্তু উঠানোর কথা বলা হয়েছে সেখানে তো কোন বস্তু রাস্তায় ফেলা আরো মন্দ কাজ।

খাবার অপচয় রোধ করুন

খাবার যেন নষ্ট না হয়। সর্বদা রসূল করীম (সা.)-এর এ নসিহত হত যে, কখনো আল্লাহ্ তা'লার দেয়া রিযক নষ্ট করবে না। সেটা পানি হোক বা অন্যান্য খাবার।

মেহমান নেওয়াজির সময়

বিভিন্ন বর্ণনায় মেহমান নেওয়াজি তিন দিনের কথা আছে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মেহমানদারী সাধারণত তিন দিনের জন্য হয়ে থাকে যদি এর থেকে বেশী দিন অবস্থান করতে হয় তো অনুমতি নিয়ে অবস্থান করতে হবে। এর বেশী অবস্থান করলে তা সদকা হিসাবে আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু জামা'তে আসলে এটা এরূপ নয় এটি একেবারে ভিন্ন বিষয়, জামা'ত পনের দিনের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে। কেননা লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে আগমন করে আর তিন দিন অবস্থান করে তাদের পক্ষে এখান থেকে ফেরত যাওয়া সম্ভবই না। যাদের নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের ব্যাপারে তিন দিন বা পনের দিনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যারা এককভাবে বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাদের জলসার কয়েক দিন পরে নিজের পক্ষ থেকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে চলে আসা উচিত যেন স্থানীয় সদস্যগণের ওপর বাড়তি বোঝা না হয়ে যায়।

নিজেকে রক্ষা করুন

আগমনকারী সর্বদা এটা দৃষ্টিপটে রাখুন যেন কোথাও ঠোকর না খান। এ জলসা ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, এতে অনেক ধরনের মানুষ যোগদান করে। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার পদস্খলনের কারন হয়েছে। ফেরেশতা তাকে জবাব দিবে তুমি কেন ঠোকর খেয়েছ? আল্লাহ্ তোমাকে বিবেক বুদ্ধি দেন নি।

কারো কাছ থেকে ধার করবেন না

এখানে যারাই আপনাদের আতিথেয়তা করবে তাদের নিকট থেকে ধার নিবেন না। এ ছাড়া পরস্পরের সাথেও এ ধরনের লেনদেন করবেন না। যাদের এ অভ্যাস আছে তারা তা আদায় করে না। আমি জানি, কখনো কারো দরকার হতে পারে। যদি কারো দরকার হয় তাহলে জামা'তকে জানান, আমীর সাহেবের সাথে কথা বলুন, প্রয়োজন হলে আমাকে লিখুন। কখনো প্রকৃত প্রয়োজন অপূর্ণ রাখা হয় নি বরং সর্বদা পূরণ করা হয়েছে।

কষ্টকে ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করুন

যদি কারো তার চাহিদা মোতাবেক থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা না হয় তাহলে ধৈর্য্যের সাথে তা সহ্য করুন। এটাও খোদার কারনে ধৈর্য্য ধারন হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা এটার জন্য তাকে এ জগতে এবং পরকালেও পুরস্কার দিবেন। যদি ব্যবস্থাপনার কোন দুর্বলতা চোখে পড়ে তো পরস্পর সমালোচনা না করে তা নির্দিষ্ট বিভাগকে অবহিত করুন।

কোন লৌকিকতা করবেন না

একবার হেদায়েতুল্লাহ সাহেব নামে একজন আহমদী কাদিয়ানে আসেন কিছু দিন আবস্থান করার পর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বিদায় নেয়ার জন্য যান তো হুযূর বলেন আপনি ফেরত গিয়ে কি করবেন, এখানেই থেকে যান, এটা আপনার জন্য কল্যানকর হবে। আর যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে তা বলুন, জামা'ত সমাধান করার চেষ্টা করবে। কেননা অনেক মানুষ আগমণ করে, তাই কার কি প্রয়োজন এটা জানা মুশকিল। তাই একজনের যদি তার কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহলে সে যেন কোন লৌকিকতা না করে বলে দেয়। যদি সে না বলে তাহলে সে গুনাহর কাজ করছে। আমাদের জামা'তের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কোন কৃত্রিমতা নাই।

ফেরত যাওয়ার সময় অবশ্যই সর্বদা দোয়ায় রত থাকুন

হযরত ইবনে ওমর (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) সফরের উদ্দেশ্যে যখন ঘোড়ায় উঠতেন তো তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার পড়তেন এবং পরে এ দোয়া করতেন ***পবিত্র সেই*** সত্ত্বা যিনি এটাকে আমাদের অনুগত করেছেন। ***"সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্নালাহু মুকরেনীন"*** অথচ আমাদের এটাকে কন্ট্রোল রাখার শক্তি ছিল না। আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফেরত যাব। হে আমাদের খোদা! আমরা তোমার নিকট এ সফরের কল্যান এবং তাকওয়া কামনা করছি। তুমি আমাদেরকে এ রূপ ভাল কাজ করার শক্তি দাও যা তুমি পছন্দ কর।

হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের এ সফর সহজ করে দাও আর এর দুরত্বকে কম করে দাও। রাস্তায় যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় যে সফর দীর্ঘ হচ্ছে। আসার সময় হয়ত আপনাদের এ দোয়া মনে ছিল না কিন্তু যাওয়ার সময় তো মনে থাকবে। এ কারনে যাওয়ার সময়ের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই এ দোয়া করুন॥

[আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুলাই ২০০২ইং:]

সংগ্রহ ও ভাষান্তর: **মওলানা জাফর আহমদ**

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-প্রদত্ত ভাষণ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

[মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা-২০১০ উপলক্ষে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-প্রদত্ত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ এর ভাষণ]

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী এবং মনোনীতদের মাধ্যমে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন তাদের কিছু দায়-দায়িত্বও রয়েছে; বরং অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। আর নিজেদের দায়িত্বাবলী পালনের ফলে তাঁদের মান্যকারীরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন। এটিও আমরা ধর্মের ইতিহাস থেকে অবহিত হই, দলগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের জামা'ত যেসব সফলতা লাভ করে, তা লাভ করার পূর্বে বিভিন্ন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হয়।

যেভাবে আমি গত পরশুর খুতবায় বলেছিলাম, ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর জামা'ত– যারা তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী তিন শ' বছরের অধিক সময় তারা ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং নির্যাতন ভোগ করেও স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য নবীর ইতিহাস দেখুন! প্রত্যেক নবীর জামা'ত এবং নবী স্বয়ং যুলুম-নির্যাতন আর বিরোধিতার যুগ পাড়ি দিয়েছেন। দলগত এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময় দীর্ঘ সময়ের কুরবানীও দিতে হয়।

কিন্তু এসব কুরবানী জাতীয় স্বার্থে তেমন কোনো বিশেষ মূল্য রাখে না। ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ত্যাগের বাসনায় নিবেদিতরা, এবং যারা কুরবানী করতে থাকেন আর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারীদের নিয়তিতে পরিশেষে এসব কুরবানীর ফলে সফলতা অর্জিত হয়; আর তারা সেসব সফলতার খাতিরে নিজেদের কুরবানীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এক প্রজন্ম না হলে পরের প্রজন্ম এসব সাফল্য ভোগ করে। এজন্য ঈমানের দৃঢ়তার দাবি এটিই, ঐশী জামা'ত যেসব পরিস্থিতির শিকার হয় অথবা বর্তমানে জামা'তে আহমদীয়া যে পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, বিশেষভাবে পাকিস্তানে, তা দেখে বিচলিত হবে না।

আমার সামনে আপনাদের মধ্য হতে অনেকেই বসে আছেন যাদের আত্মীয়-স্বজন, যাদের প্রিয়জন পাকিস্তানে সেসব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে আর সে কারণে তারাও উদ্বিগ্ন হয়। ঐশী জামা'ত এবং তাদের মান্যকারীরা সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে ধর্মের ওপর অবিচল থাকে। আর স্বয়ং নিজেকে সেই শিক্ষানুযায়ী সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে তাঁর নবীগণ আর বিশেষ বান্দারা আবির্ভূত হন।

আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, কীভাবে আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলন করতে হবে। কীভাবে আমাদেরকে বিশ্বস্ততার দাবি অনুসারে সেসব বিষয় পালন করতে হবে যার প্রত্যাশা তিনি (আ.) আমাদের কাছে করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন:-

'আমাদের অনুসারীরা যদি জামা'তে পরিণত হতে চায় তাহলে একটি মৃত্যু অবলম্বন করতে হবে। রিপুর তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে বাঁচো, আর আল্লাহ্ তা'লাকে সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান কর।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত প্রদান করেন: হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার কারণে এবং সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশার কারণে তিনি (তাঁর দরবারে) একটি বিশেষ আসন বা মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

কাজেই বিশ্বস্ততার মান যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনদের আসন লাভ করতে চাইলে এসব কুরবানী দিতে হবে এবং নিজস্ব স্বকীয়তা ভুলে যেতে হবে। সর্বপ্রথম একজন আহমদীর হৃদয়ে ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি প্রোথিত হওয়া উচিত। যখন বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়, একটি দৃঢ় সংকল্প করে, এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়, তখন বড় বড় অত্যাচারীর সামনেও তারা একটি পাহাড়ের মত দণ্ডায়মান হয়।

বরং ইতিহাসে আমরা কিশোরদেরও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যে, কীভাবে তারা ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছে। দু'জন বালকই ছিল আবু জাহেলের হন্তারক, যারা একে অপরের তুলনায় এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় তার ওপর আক্রমণ করে। বর্তমান সময়ের জিহাদী অঙ্গ-সংগঠনও শিশুদের ফুঁসলিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু সেসব শিশু-কিশোর যারা প্রাথমিক যুগে কুরবানী করেছে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় তাঁর মনোনীতদের নির্দেশ পালনার্থে বিভিন্ন কুরবানী করে। তারা জাহিলদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথার ফাঁদে পড়ে অথবা শিশুকাল থেকে দীর্ঘদিন মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের পর কুরবানী করে না, যেভাবে বর্তমানে নামধারী জিহাদী অঙ্গ-সংগঠনগুলো করাচ্ছে।

অনেকে হয়তো বলবে, এসব বাচ্চারাও কুরবানী করছে; কিন্তু যে কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার পরিপন্থী, যে কুরবানী এমন লোকদের প্রশিক্ষণের ফলে করা হচ্ছে– যারা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মান্য করে না আর খোদার মনোনীতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত; কাজেই সেসব কুরবানী সেই মান অর্জন করতে পারে না যা আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত জামা'তের ত্যাগীরা করে থাকেন।

বরং প্রকৃত কুরবানী হচ্ছে তা যা ধর্মের মূল উদ্দেশ্যকে বুঝে ত্যাগীরা করেন। প্রকৃত বিশ্বস্ততা মূলত আনুগত্যের মাধ্যমেই বোঝা যায় আর এ যুগে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের যে আনুগত্য, তা তাঁর প্রেরিতকে সন্ধান করে, তাঁর কথা অনুসারে, তাঁর শিক্ষানুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করাতেই নিহিত রয়েছে। আজ সকল নিদর্শন পূর্ণ হবার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র উপস্থিতি এ-কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, যে জামা'ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশানুসারে এ যুগের জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র জামা'ত। আপনারা সৌভাগ্যবান, কারণ আপনারা এতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। কিন্তু যুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়।

বিশ্বস্ততার দাবি হলো, যে আদর্শ হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা দৃষ্টিপটে রাখুন। আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা এবং এর ওপর অবিচল থাকার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তা দৃষ্টিপটে রাখুন। এ-যুগে যখন আমরা বলি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাজকে-ই সম্মুখে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এসেছেন, তাহলে আমাদের সেসব দৃষ্টান্তও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত, যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ দেখিয়েছিলেন। তাঁরা নামাযের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা ইবাদতের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় জামা'তের মধ্যে এমন লোক আছেন আর যুবকদের মধ্যেও আছেন। যাদের সম্পর্কে কোনো না কোনোভাবে আমিও জানতে পারি। হাতে গোনা কয়েকজনের ব্যাপারে হয়তো জানা যায় না; কিন্তু অনেকেই আছেন যারা নিজেদের ইবাদত প্রকাশ করেন না। দিনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ এবং নফলের প্রতি তাদের মনোযোগ রয়েছে। অতএব এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমাদের যুবকদের ভেতর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

কয়েকটি বা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা যেন না হয় বরং অধিকাংশই যেন এরূপ হয়। আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হচ্ছে ইবাদত। যদি এর অভ্যাস গড়ে তোলেন তাহলে সফলতা আমাদের জন্য নির্ধারিত। নামাযের ফলেই দোয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর নামাযই হচ্ছে সংশোধনের মাধ্যম। যুগের বিভিন্ন নোংরামী থেকে মুক্ত থাকার উপায়। অনেক যুবক আমাকে লিখে আবার সাক্ষাতের সময়ও বলে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। নিরাপদ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে, তাদের নামায এবং ইবাদত। কেননা, খোদা তা'লার ঘোষণা রয়েছে, যে নামাযের সুরক্ষা করবে সে বিভিন্ন নোংরামী থেকে মুক্ত থাকবে। আর আল্লাহ্ তা'লার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। কাজেই নামায পড়া সত্ত্বেও যদি সংশোধন না হয়, পার্থিব বস্তু, ক্রীড়া-কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা ও অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে মন না ফিরে তাহলে নিশ্চিত যে আমাদের ভেতরেই কোনো কমতি আছে। আমাদের নামায খোদা তা'লার দরবারে সেই মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হচ্ছে যদ্বারা এসব সংশোধন হয়।

অতএব আমাদেরকে নামাযের প্রকৃত স্বাদ পাবার চেষ্টা করা উচিত। এমন স্বাদ যা আমাদেরকে খোদা তা'লার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***'নামায হচ্ছে সেই জিনিষ, যদি যথাযথভাবে পড়া হয় তাহলে পাঁচ দিনের ভেতর আধ্যাত্মিকতা লাভ হয়।'*** অতএব আমরা যদি এ মান দৃষ্টিপটে রাখি আর তা অর্জনের চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যও করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা চেষ্টা-প্রচেষ্টা আরম্ভ করলে পার্থিব এবং জাগতিক বিষয়াদির প্রতি আকর্ষণ কমবে, হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর যখন খোদা তা'লার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে তখন আধ্যাত্মিকতার মানও সমুন্নত হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক খাদেম এবং জামা'তের সদস্যদেরকে এই মান অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন।

জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য আল্লাহ্

তা'লা নিষেধ করেন নি বরং যে আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি থেকে সঠিকভাবে লাভবান হয় না আর পার্থিব যেসব কাজ তাদের ওপর অর্পিত, যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ তাদের অধীনে আছে– যথাযথভাবে এর দেখাশোনা করে না, তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, ***'যদি এসব কাজ সঠিকভাবে ও পূর্ণরূপে সম্পাদন করা না করা হয় তাহলে এমন মানুষও অপরাধী সাব্যস্ত হয়।'*** কিন্তু জাগতিক কাজকর্ম যেন ধর্মসেবার উদ্দেশ্যেই করা হয়। পার্থিবতার ওপর যেন সবদিক থেকে ধর্ম অগ্রাধিকার লাভ করে। কোনোভাবেই জগতপূজারী যেন বনে না যায়। আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত রীতি অনুসারে যেন সকল নামায পড়া এবং ইবাদত করা হয়। যখনই এর সময় হবে তখন কাজ-কাম ফেলে রেখে এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

উপদেশ দিতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***'সকল প্রকার লৌকিকতা থেকে তোমাদের মুক্ত থাকা উচিত। অপরিচিত যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় সে তোমাদের অবয়ব দেখে, তোমাদের আচার-আচরণ, অভ্যাস, দৃঢ়তা এবং খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি কতটা আমল করছ তা খতিয়ে দেখে। এসব যদি উত্তম না হয় তাহলে তোমাদের মাধ্যমে সে হোঁচট খাবে। কাজেই এ বিষয়গুলোকে স্মরণ রেখ।'*** অতএব আমাদেরকে এ বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, 'তোমাদের আচার-আচরণ কেমন তা দেখ? আচার-আচরণের একটি দীর্ঘ তালিকা আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন, কোন কাজটি ভালো এবং উন্নত মানের আর কোনটি মন্দ এবং যা হতে মুক্ত থাকতে হবে, পবিত্র কুরআন পাঠে এ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া এই আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা যাঁকে অনুকরণীয় বা সর্বোত্তম আদর্শ বানিয়েছেন তিনি হলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

প্রথমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সনদ প্রদান করেছেন, ***"ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযিম"*** (সূরা আল্ কালাম: ০৫) অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনদ প্রদানের পর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, ***"লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ"*** (সূরা আল্ আহযাব: ২২) অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে আর এই তালিকার পুরোটি এখন বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

সত্যবাদীতা এমন একটি উত্তম গুণ যে, এটি অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনেক জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। আর বলেছেন, ***"ওয়াজতানিবু কাউলায যুর"*** অবস্থা যাই হোক না কেন মিথ্যা বলা থেকে বিরত থেক আর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেক। এছাড়া মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ***"লা ইয়াশহাদুনায যুর"*** (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৩) অর্থাৎ, তারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় না। এটি হচ্ছে একজন সাধারণ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

মহানবী (সা.)-এর নৈতিক গুণ এত উন্নতমানের ছিল যে, শত্রুরা তাঁর প্রতি সব ধরনের অপবাদ আরোপ করলেও জীবনে তিনি কখনো মিথ্যে বলেছেন এই অপবাদ দিতে পারে নি। তাঁর প্রচার বা তবলীগকে প্রতিহত করার জন্য কাফিররা বিভিন্ন শলাপরামর্শ করত, তখন কেউ বলেছিল যে, চতুর্দিকে রটিয়ে দাও যে, সে মিথ্যাবাদী। একথা শুনে তাদের মধ্য হতে একজন বলেছিল, এটি এমন একটি কথা যদি তোমরা পুরো জীবন সর্বশক্তি দিয়েও চেষ্টা কর তারপরও একথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কেননা যাদের সাথে তাঁর কোনো যোগসূত্র আছে আর যারা তাঁকে শিশুকাল থেকে চিনে তাদের মধ্যেই এই অপপ্রচার করতে চাও? তারা ভালোভাবে জানে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। আমাদের সামনে এই দৃষ্টান্তই তিনি স্থাপন করেছেন।

আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমাদের ভেতর এতটা সত্য আছে কি যে, অপররাও আমাদের সত্য বলার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিবে। একথাও সত্য, আজ এমন মানুষও আছে যারা আহমদীয়াতের শত্রুতায় জেনে-শুনেও আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। বিশ্বের সর্বত্র আহমদীয়াতের শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বিশেষভাবে পাকিস্তানের উলামা বা মোল্লাদের হাতের ক্রীড়নক সাধারণ মুসলমানরাও প্রকৃত বিষয় জানার বা অনুধাবনের চেষ্টা না করে শোনা কথায় কান দিয়ে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করছে, ফলে তারা যে-কোনো ভুল কথা বলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা (আমাদের পক্ষে) এ স্বাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কোনো আহমদীর ব্যাপারে বিভিন্ন জনের মুখ থেকে বা অ-আহমদীদের মুখ থেকে এ কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দ হয় যে, তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমাদেরকে নিজেদের উত্তম চরিত্রের প্রভাব দ্বারা সবার কাছে নিজেদের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কাজের জন্য আমাদের অবস্থাকে এমনভাবে শুধরাতে হবে যাতে আমরা সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতেও মুক্ত থাকতে পারি। কেননা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মিথ্যা বা ভুল বলাও জামা'তের জন্য দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে। এখানে অনেকে এমন আছেন যারা সরকারের কাছ থেকে ভাতা গ্রহণ করেন, বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকেন– এক্ষেত্রে সোজা-সরল ও স্পষ্ট কথা বলা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ দেখুন! তিনি নিজ মনিব ও অভিভাবকের অনুকরণে কী দেখিয়েছেন:

একবার তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মোকদ্দমা চলছিল। তাঁর (চাচাত) ভাইয়েরা মোকদ্দমা দায়ের করেছিল। বাদীপক্ষ আদালতকে বলে দিয়েছিল, এ ব্যাপারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যদি বলে দেয় যে, আমরা ভুল অথবা বিষয়টি এমন নয় তাহলে ঠিক আছে। তাঁকে সাক্ষী বানিয়েছিল আর তিনি যদি সত্য বলে দেন তাহলে অনেক বড় ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আদালতে দৃঢ়তার সঙ্গে যা সত্য তাই বলেন। ভাই তাঁর এহেন আচরণে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য মিথ্যা বলব– এমনটি হতে পারে না। কাজেই এ ছিল সেই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আদর্শ, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আমাদের তরবীয়তের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর মনিবের যথাযথ অনুসরণ করেছেন। অতএব আমরা যখন নিজেদেরকে তাঁর জামা'তের সদস্য বলে দাবি করব তখন আমাদের এই উন্নত নৈতিক গুণও অবলম্বন করা আবশ্যক।

এরপর একটি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে, আমানত রক্ষা করা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। দায়িত্বাবলীর অঙ্গীকার পূর্ণ করা। কারো ওপর কোনো দায়িত্ব বা কাজ ন্যস্ত করা হলে তা যথাযথভাবে পালন করা। মানুষের ব্যক্তিগত আমানত রক্ষা করা, নিজের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান

করা। মোটকথা এরও একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর্থিক মুনাফা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা কীরূপ ছিল চলুন তা এবার দেখা যাক, এক রাখাল মুসলমান হয়ে যায় এবং সে ইহুদীদের মেষ চড়াতো। মুসলমান হওয়ার পর সে বলে, ফিরে তো যেতে পারব না; কেননা তাহলে আমি আর ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর অনুশীলন করতে পারব না। আর তারা যদি ঘুণাক্ষরেও এটি জানতে পারে তাহলে আমার প্রাণ রক্ষা দায় হবে। অথচ মেষগুলো আমার কাছে, এগুলোর কী করব? একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, মেষগুলোকে দূর্গমুখী করে ছেড়ে দাও তাহলে এরা নিজেরাই সেখানে চলে যাবে। সে-সময় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল ছিল এমনকি ক্ষুৎপিপাসায়ও জর্জরিত ছিল; কিন্তু আমানতের খিয়ানত করার কথা ভুলেও মাথায় আসে নি। কাজেই একজন নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করবে আবার খিয়ানতও করবে তা কেমন করে হতে পারে।

অতএব এই নবাগত মুসলমানকে সর্বপ্রথম মহানবী (সা.) যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাহল, যথাযথভাবে আমানত রক্ষা কর। আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কর। কোনো প্রকার খিয়ানতের চিন্তাও যেন তোমাদের মনে না আসে। কাজেই আমরা যখন বলি, আমাদের জামা'ত ঐশী জামা'ত। খোদা তা'লার খাতিরে আমরা যুলুম-নির্যাতনও ভোগ করছি। উদ্বেগাকূল পরিস্থিতিও সহ্য করছি। আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ-কষ্ট দেখছি, তাহলে এ যুগের ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীতে পরিচালিত হওয়া আমাদের জন্য কীভাবে সম্ভব! আজ আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমরা কি সেভাবে আমানতের সুরক্ষা করছি? যদি করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হব, আলহামদুলিল্লাহ্। আর যদি এমনটি না করি তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে। আমাদের এখানে অনেক এমন বিষয়ও আসে, স্বামী-স্ত্রী, বা ভাই-বোনের যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রেও অনেক সময় অসন্তোষের কারণে আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় না। পরস্পরের অধিকার হরণ করা হয়। কাজেই অনেক গভীরভাবে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

অঙ্গীকার রক্ষা করাও একটি উত্তম গুণ। খোদ্দাম এবং সকল অঙ্গ-সংগঠন বরং সম্মিলিতভাবে পুরো জামা'তও এই অঙ্গীকার করে আর আজও আপনারা প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান কুরবানী করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকব। এটি নিছক বুলি সর্বস্ব কোনো সাধারণ অঙ্গীকার নয়; বরং অনেক বড় একটি অঙ্গীকার। তাই এ বিষয়ে চিন্তা করুন। এটি অনেক বড় একটি অঙ্গীকার, যা একজন খাদেম বা জামা'তের সদস্য করে থাকে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এর সাক্ষী যে, কীভাবে তিনি তা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাঁকে এই অঙ্গীকার রক্ষার সনদ প্রদান করেছেন। কিন্তু সাধারণ বিভিন্ন চুক্তি এবং অঙ্গীকারের বিষয়েও, যেক্ষেত্রে অনেক সময় এমন খুঁত বের হয় যার ফলে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি (সা.) এমনসব অঙ্গীকারও রক্ষা করতেন, যাতে কোনোরূপ আপত্তির সুযোগ না থাকে।

ইসলাম গ্রহণের আগে মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু ছিল আবু সুফিয়ান। তাঁকে হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেছিল আর তিনি হিরাক্লিয়াস এর সভাসদের সামনে স্বীকার করেছিল যে, আজ পর্যন্ত তিনি (সা.) কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি। মহানবী (সা.)-এর এ ধরনের শত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কোনো দূত এসে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে ফেরত পাঠাতেন; কেননা, তুমি দূতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলে; তাই দায়িত্ব পালনের পর তোমাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানে ফিরে গিয়েও যদি বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকতে পার তাহলে বুঝে-শুনে আবার চলে এস; কিন্তু এবার এখানে থাকতে পারবে না। তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে তরবীয়ত প্রাপ্তরাও নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করতেন।

ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে দু'জন যুবক এক যুবককে ধরে নিয়ে আসে আর অভিযোগ করে যে, সে আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে। হযরত উমর (রা.) তার কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে সে বলে, হ্যাঁ, এভাবে ঘটনাটি ঘটেছে আর আমার হাতেই সে নিহত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, এরা রক্তপণ নিতে প্রস্তুত নয়; তাই 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ' এর শাস্তি তুমি পাবে। সে বলল, ঠিক আছে– আমি প্রস্তুত আছি। তবে, আমার একটি নিবেদন আছে, আমার একটি ছোট ভাই আছে– এজন্য আমার পিতা আমার কাছে কিছু সোনা ও অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন। এখন সেই গচ্ছিত ধন আমাকে ওর কাছে পৌঁছাতে হবে, অথচ সে এখানে নেই বরং অন্য কোনো স্থানে আছে। আমাকে তিন দিন অবকাশ দেয়া হোক। আমি তিন দিন পর ফিরে আসব তখন আপনি যে শাস্তি দিতে চান আমাকে দিবেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে; কিন্তু এজন্য তুমি কাউকে জামিনদার নিযুক্ত কর। কে তোমার পক্ষে জামিন হবে। সে উপস্থিত লোকদের মধ্যে চারিদিকে তাকায় এবং এক ব্যক্তির ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, এই ব্যক্তি আমার জামিনদার। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবু যর গিফ্‌ফারী (রা.)।

হযরত উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি জামিন হতে রাজি আছেন কি? তিনি বলেন, ঠিক আছে– আমি জামিন হতে রাজি আছি। সেই ব্যক্তি চলে যাবার পর তিন দিনের মাথায় আবার সব মানুষ একত্রিত হয় আর সেই দুই ভাইও চলে আসে। দিনের আলো ফুরিয়ে যেতে থাকে। এই ভেবে সবাই উদ্বিগ্ন হয় যে, এত পুরোনো এবং একজন মহান সাহাবী জামিন হয়েছেন অথচ সেই ব্যক্তি এখনও এসে পৌঁছায় নি। হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, ইনি [আবু যর গিফ্‌ফারী (রা.)] জামিনদার আর এই ছেলেরাও হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়; তাই, তাঁকেই [আবু যর গিফ্‌ফারী (রা.] শাস্তি ভোগ করতে হবে। উপস্থিত সবাই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এমতাবস্থায় সবাই দেখতে পায় যে, সেই [অভিযুক্ত] ব্যক্তি খুবই করুণ অবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে সেখানে পৌঁছায়। আর বলতে থাকে, আমার কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেছে, কিন্তু আমি সেই গচ্ছিত ধন ও ছোট ভাইকে বড়দের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছে শাস্তি দিন। হযরত আবু যর গিফ্‌ফারী (রা.) বলেন, আমি এই লোককে চিনতাম না, সে আমার প্রতি তাকালে আমি তার চেহারায় সততা দেখেছি, তাই আমি এর জামিন হয়েছিলাম। এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত সকল মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে আর [অভিযোগকারী] সেই যুবকদের ওপরও এর এত বেশি প্রভাব পড়ে যে, তারা বলে, ঠিক আছে আমরা আমাদের পিতার হন্তারককে ক্ষমা করে দিচ্ছি। হযরত উমর

(রা.) পরে তাদেরকে এ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, আমি বায়তুল মাল থেকে তোমাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারা বলে, দরকার নেই; আমরা খোদার খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অতএব এই হলো দৃষ্টান্ত এবং এই সেই মান যা সে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর আবশ্যক নয় এবং অসম্ভবও নয় যে, সেই ব্যক্তি সাহাবীই ছিলেন। হতে পারে যে, পরে বয়আত করেছেন কিন্তু সাহাবীদের মাধ্যমে তরবীয়ত প্রাপ্ত ছিলেন।

কিন্তু দেখুন! কীভাবে সে সৎসাহসের সাথে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর শাস্তি যে, প্রাণ হারানো তাও জানতেন। যাহোক, অঙ্গীকারও পূর্ণ করেছেন, অর্থাৎ আমি অঙ্গীকার করেছি তাই ফিরে আসতেই হবে। আর গচ্ছিত জিনিষ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কতটা যত্নবান ছিলেন। (ইচ্ছে করলে) সে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যও সেই সম্পদ রেখে যেতে পারতেন। সেই ব্যক্তি আমাদের এই উত্তম শিক্ষাটি দিয়ে গেছেন।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আজ আল্লাহ্‌র কৃপায়–অঙ্গীকার রক্ষা করা, আমানত রক্ষা করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানুষ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছেন। আর আজও এমন মানুষ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই তাদের মত হওয়া উচিত, যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণে বদ্ধপরিকর। অতএব আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পাকিস্তানে দৈনন্দিন সংঘটিত শাহাদাত ও ক্ষয়-ক্ষতি একথার সাক্ষী যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার পুরো চেষ্টা তারা করছেন। তারা বলেন, আমরা অঙ্গীকার রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আমাকেও অনেকে লিখেন, আপনি চিন্তা করবেন না।

আমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণার্থে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি। গত পরশু আমি জুমুআর খুতবায় পাকিস্তানের আহমদীদের বরাতে এবং বিশেষভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বরাতে যে কথা বলেছিলাম এরপর সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তানের চিঠিও আমার কাছে এসেছে; "এটি আবেগ প্রসূত কোনো কথা নয়, বরং অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি আপনাকে লিখছি, আমরা সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি।" অনুরূপভাবে সেখানকার বিভিন্ন স্থানের জেলা কায়েদ সাহেবগণও লিখেছেন, "আমরা সদা-সর্বত্র আমাদের অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের প্রস্তুত পাবেন। আর আপনি দেখবেন, আমরা মিথ্যা বলছি না। আমরা পিছু হটবো না।" তারা লিখেছে, "যত নির্যাতন ও নিপীড়নই করা হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ্, কেউ আমাদের দৃঢ়তা হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। কখনো এতে চির ধরতে দিব না। আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা পূর্ণ করব আর রক্ষা করব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।"

অতএব, এটি সেই প্রেরণা যা জামা'তের ভেতর প্রাণের সঞ্চার করে। ছোট-খাটো পদ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় পদ পর্যন্ত সর্বত্র নিজ অঙ্গীকার রক্ষার দৃশ্য প্রদর্শন করে। কজেই, আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করা উচিত। নিজ অঙ্গীকারসমূহ্ বাস্তবায়ন করুন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করুন। সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস অথবা জয়ধ্বনি দেয়ার মাধ্যমে নয়; বরং স্থায়ীভাবে জামা'তের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। পাকিস্তান হতে যেসব বিশ্বস্ততাপূর্ণ পত্র আসে তা আবেগ প্রসূত বা সাময়িক নয়। তাদের চিঠি-পত্র হতেই বোঝা যায় আর তাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড হতেও বোধগম্য হয় যে, নিশ্চিত এগুলো তাদের হৃদয়েরই ধ্বনি। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়লো, ওখানকার দু'টি মসজিদে ২৮শে মে'র [২০১০ সাল] দুর্ঘটনা হতে যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের চিঠি-পত্রও আমার কাছে এসেছিল, আমি তা পড়ছিলাম–অবাক করার মতো প্রেরণা সেসব পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমি তা থেকে কিছু কথা আপনাদের বলতে চাই যাতে আপনারাও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এসব কুরবানীকারী সম্পর্কে আপনারাও অবহিত হতে পারেন আর আপনাদের কাছে তাদের জন্য দোয়ার তাহরীক করা হয়ে যায়। লাহোরের আনসারুল্লাহ্‌র একজন কর্মকর্তা জনাব মজীদ বশীর তার এক পত্রে লিখেন, সেদিন জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে বাইতুন নূর মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন নির্দয়ভাবে লোকদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে, বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, ডান-বাম দিয়ে এমনভাবে গুলি ছুটেছে যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যখন আক্রমণ শুরু হয় তখন মওলানা শাদ সাহেব পবিত্র কুরআনের আয়াত, **"ওয়ালাইউ বাদ্দিলান্নাহুম মিম বা'দি খাউফিহিম আমনা"** -এর তফসীর বর্ণনা করেন। এই তফসীর বর্ণনার পর আমদের ঈমান আরো সুদৃঢ় ও উজ্জীবিত হয় যে, অবশ্যই ভয়-ভীতির অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন আর তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন যারা আহমদীদেরকে জুমুআর নামায পড়তে বাঁধা দিয়েছে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর লিখেন, মৃত্যুকে সামনে দেখে একটি দোয়াই মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল, হে সর্বশক্তিমান খোদা! এরা তোমার প্রিয় মসীহ্‌র মান্যকারী, দুর্বল কিন্তু কেবল তোমার প্রতিই বিশ্বাস রাখে, তুমি কি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? কখনো নয়। তুমি স্বয়ং সকল আহমদীর নিরাপত্তা বিধান করো। এই গরমের মধ্যে বন্দী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তের সদস্যরা পরস্পরকে সাহায্য করেছে তা অভাবনীয়। তারা টুপিতে করে পানি এনে আহতদের পান করিয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা ভীত-সন্ত্রস্ত আর বৃদ্ধরা গরমের কারণে অতিষ্ঠ ছিল। মোটকথা, এমন অবস্থা ছিল যা ভাষায় বর্ণনাতীত। এরপর আরো লিখেছে, হায়! আমিও যদি শাহাদতের পেয়ালা পান করে অমর হয়ে যেতাম তাহলে এমন দিন দেখতে হতো না। হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত আর মস্তিষ্ক স্থবির। কী অপরাধ ছিল এসব নিরীহ ও নিষ্পাপ আহমদীর?

কেবল এতটুকুই যে, তারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে সেই মসীহ্‌র মান্যকারী এবং অনুসারী। এতই শান্তিপ্রিয় এবং অনুগত যে, আক্রমণের পর যখন মুরব্বী সাহেব ঘোষণা করেন, সবাই বসে থাকুন আর দোয়ার ওপর জোর দিন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করুন। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহীম' পাঠ করুন; তখন উপস্থিত সবাই বিনাবাক্যব্যয়ে সেখানে বসে পড়েন আর নিজেদের বক্ষে গুলিবিদ্ধ হতে থাকেন। বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকেন। আর কোনো বিরতি ছাড়াই প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা যাবত এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলতে থাকে। এই ছিল সেখানকার চিত্র। ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলদের মাঝে এমন দৃশ্য দেখা যায় কি?

এরপর আরেকজন হচ্ছেন জিশান সাহেব। তিনি লিখেন, খোদ্দামরা খুবই বীরত্বের সঙ্গে দু'জন আক্রমণকারীকে ধরে ফেলে। আর একজন আক্রমনকারীকে খোদ্দামরা গুলি করে হত্যা করে। আর পুলিশরা খোদ্দামদেরকে নিজেদের বন্দুক দিতে অস্বীকার করে; কিন্তু নিজেরাও কিছু করেনি। খোদ্দামদের সাহসিকতার কারণে অধিক প্রাণহানী ঘটেনি। যদি তারা এই বীরত্ব প্রদর্শন না করতো তাহলে আরো ব্যাপক ক্ষতি হতে পারতো।

এরপর আরেকজন লিখেছেন, ২৮ মে'র দুর্ঘটনার দিন দু'সন্তানসহ আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এরমধ্যে লোকমানের বয়স বারো বছর আর গত ২৪ মে' ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে হাসানের। দু'জনই এই দুর্ঘটনার সময় পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এই দু'জন ওয়াক্‌ফে নও এর অন্তর্ভুক্ত, ওদের ধৈর্য আমার সাহস বাড়িয়েছে। খুতবা শুরু হতেই বাইরে থেকে গুলির শব্দ আসতে থাকে। পাশাপাশি মেহরাবের দিক থেকে হাত বোমা ছোড়া হতে থাকে। এমন অবস্থা দেখে আমি সন্তানদের নিয়ে পিছনের আঙ্গিনায় চলে যাই আর পানির ট্যাঙ্কের পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ি। ছেলেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওদের নিচে শুইয়ে আমি ওপর দিকে শুয়ে থাকি। এভাবে বাচ্চারা চার ঘণ্টা সময় পার করে আর অনবরত দোয়া করতে থাকে। 'রাব্বি কুল্লু শাইঈন খাদিমুকা' পড়তে থাকে। এরপর একজন সন্ত্রাসী আমার পায়ের কাছে হাত বোমা নিক্ষেপ করে। আমার ছেলে বলে, তখন সে এই দোয়া করছিল যে, হে খোদা! এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আমাদের সাহায্য করো। তুমি দয়া করো, কেননা তোমার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এরপর তিনি আরো লিখেছেন, এই সময়ের মধ্যেই সেই বোমা বিস্ফোরিত হয়; কিন্তু, সামান্য একটু আহত হওয়া ছাড়া আমরা তিনজনই প্রাণে বেঁচে যাই। এমন লোকদের ঈমান কেউ নষ্ট করতে পারে কি? যাদের সন্তানরা এরূপ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান তাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে কি যে, এরা অঙ্গীকার পালনকারী নয়?

এরপর আরেক ভদ্রলোক লোকমান সাহেব লিখেন, আমি রাবওয়ার বাসিন্দা, আর বর্তমানে চাকরি উপলক্ষে লাহোরে বসবাস করছি। ২৮শে মে, আমিও জুমুআর নামায পড়ার জন্য মডেল টাউনের 'বাইতুন নূর' মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। যখন এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে, শত্রুরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তখন আমি মাটির নিচের ঘরে (Basement)-এ বসে খুতবা শুনছিলাম। গুলির শব্দ শুনে অধম ছুটে যাই এবং পিছনের দরজা, যা মূলত কয়েকটি হলে ঢোকার একমাত্র প্রবেশপথ, তা আগলে দাঁড়াই। একজন সন্ত্রাসী বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় যায় এবং অল্পবয়স্ক ও নিরস্ত্র তিনজন খোদ্দাম তাকে আটক করে। আর একজন সন্ত্রাসী তখন নীচতলার পুরোনো হলে আক্রমণ করে, গুলি ছোড়ে এবং হাত বোমা নিক্ষেপ করে। সে একটি জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিল এবং অনেকগুলো প্রাণ হরণ করেছিল; কিন্তু একজন খোদ্দাম ও আহতরা মিলে তাকেও জাপটে ধরে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে খোদা তা'লা অধমকে আহতদের পানি পান করানোর সুযোগ দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা মনে পড়েছে যখন একজন চরম আহত ব্যক্তি পানি পান না করে অন্যজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এই বলে যে, আমি ঠিক আছি, তোমরা অন্যদের দেখ। অন্য আহতদের অবস্থা গুরুতর ছিল। যখন এ্যাম্বুলেন্স আসে তখন তাদেরকেও শিফ্‌ট করার সুযোগ পাই। এসময় একজন খাদেম, যে আমার সাথে কাজ করছিল, তাকে যখন আমি সর্বশেষ লাশ নিয়ে যেতে বললাম তখন সে আবিষ্কার করে যে, এটি তাঁর পিতার লাশ। জুমুআর খুতবাতেও এ-বিষয়টি সংক্ষেপে বলেছি। আল্লাহ্‌র কি বিস্ময়কর লীলা, দেখুন! কত দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস তার ছিল। পিতার লাশ নিয়ে যাবার পরও সেই খাদেম মসজিদে অন্যদের কাজে সাহায্যরত থাকে।

এরপর কানাডা থেকে একজন মহিলা, নাবিলা সাহেবা লিখেছেন, আমার ভাই আলাপচারিতার সময় ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়েছেন, দারুয্ যিক্‌র (মসজিদ)-এর মূল অংশে অনেক বেশি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা হল থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনার সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে পড়ি আর আগে থেকেই সেখানে আরো ৬০-৭০ জন মানুষ ছিল। শরীর থেকে রক্তও ঝরছিল আর এত মানুষের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ মনে হল, এভাবেই যদি মরতে হয় তাহলে কিছুটা সাহায্য করে কেন মরবো না।

এরপর আমরা তিনজন ছাদের দিকে দৌড়ে যাই আর ওপর থেকে নেমে আসার একটি পথের ওপর এই উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি যে, যদি ওপর থেকে কোনো সন্ত্রাসী নীচে নেমে আসে তাহলে আটক করবো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি, চারদিক থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং গুলি বর্ষিত হচ্ছিল। এরপর সেই সন্ত্রাসী অন্য কোনো পথ বেয়ে নিচে নেমে যায়, সম্ভবত পালিয়ে যায়। এরপর ছয় ঘণ্টা পর এই অপারেশন শেষ হয় এবং আমরা বাইরে বের হয়ে আসি। তখন পথের ওপর অনেক লাশ পড়ে ছিল। এরপর তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের পর ভাইয়ের এমবিএ'র পরীক্ষা ছিল। হাসপাতালে এসে প্রধানমন্ত্রী মিয়া শাহবাজ শরীফ ভাইকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন, আমরা এসব সন্ত্রাসীর কাছ থেকে অবশ্যই হিসাব নিব। আমার ভাই তাকে বলে, 'যে আল্লাহ্ আমাকে নবজীবন দিয়েছেন, হিসাবও তিনিই নিবেন'। একথা শুনে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, না এভাবে বলে না, আমরা অবশ্যই তার বিচার করবো। তখন আমার ভাই আবারো বলেন: 'না স্যার, যে খোদা জীবন দিয়েছেন তিনিই আমাদের পক্ষ থেকে হিসাব নিবেন'। কাজেই, এই হল ঈমানী আত্মাভিমান এবং খোদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস।

এরপর আরেকজন বোন সৈয়দা বুশরা তৌকীর সাহেবা ঘটনার উল্লেখ করে লিখেন, যে-দৃঢ়চিত্ততা ও মহিমার সাথে আহমদীয়া জামা'ত প্রাণের কুরবানী দিয়েছে, এতে প্রত্যেক আহমদী আকাঙ্ক্ষা করবে, কেন আমি সেখানে যাই নি? একজন ওয়াক্‌ফে নও ছেলে সর্বদা দারুয্ যিক্‌র (মসজিদ)-এর বড় গেটে ডিউটি দিত। গতকাল সে নামায পড়তে আসলে ব্যবস্থাপকরা তাকে ডিউটি দেয়ার জন্য পিছনের গেটে পাঠিয়ে দেয় আর এরপরই এই অঘটন ঘটে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই যুবক ঘরে ফিরে যায় নি এজন্য যে, সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। জামা'তের সদস্যদের এই প্রেরণা প্রশংসাযোগ্য।

এরপর তিনি একটি রিপোর্টে লিখেছেন, একজন আহমদী বন্ধু গোলাগুলির সময় কোনোরূপ ভয়ভীতি ছাড়াই খোদার দরবারে সেজদায় পতিত হয়ে আহাজারি করতে থাকেন। একজন প্রবীণ, যার বাহু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল, তিনি তা সামলে নিয়ে চরম কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সান্তনা প্রদান করছিলেন। আরেকজন প্রবীণ বলেন, সবাই ব্যক্তিগতভাবে দোয়া তো করছেই, তাহলে

আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কেন দোয়া করছি না? দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ আমাদের বিপদ দূর করে দিন। আরেকজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আহতাবস্থায় তাঁর ছেলেকে ফোন করে বলেন, বৎস! আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। তুমি সবার চেয়ে বড়, তাই তোমার মা এবং ছোট ভাই-বোনদের প্রতি খেয়াল রেখ। একজন বালক, যার বুকে গুলি লেগেছিল, চরম আহতাবস্থায় সে নিজের মা'কে ফোন করে এবং তাঁর কাছে নিজের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর সে শাহাদত বরণ করে।

সোলায়মান সাহেব লিখেন, হাতবোমা বিস্ফোরণের কারণে চারিদিকে ধোঁয়া ছিল এবং মানুষ যত্রতত্র আহত হয়ে পড়েছিল। তখন দু'জন অথবা তিনজন আহমদী বাইরে থেকে আসেন এবং আক্রমণকারীকে আটক করতে সক্ষম হন, এবং তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। তার কাছে বিশটি হাত বোমা এবং জ্যাকেটে বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল। এগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এবার চিন্তা করে দেখুন! যদি সে এগুলো ব্যবহার করতে সক্ষম হত তাহলে সেখানে কত বড় ধ্বংস-যজ্ঞ হতো। এরই মধ্যে খোদ্দামগণ অন্যান্য আক্রমণকারীদেরকেও আহতাবস্থায় আটক করে। প্রায় আধা ঘণ্টা পর সেখানে পুলিশ আসে।

কাজেই, এই হল কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা খোদ্দামগণ সেখানে প্রদর্শন করেছেন। এই কয়েকটি ঘটনা আমি আপনাদের শোনালাম একথা বলার জন্য যে, বিভিন্ন ইজতেমা ও জলসা আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এবং স্বাধীনভাবে কোনো অনুষ্ঠান করার অনুমতি না থাকার পরও, সমাজে সর্বাবস্থায় শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান থাকার পরও, মসজিদগুলোতে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে তারপরও, এবং এই ঘটনার পর মসজিদের আশঙ্কাজনক অবস্থা আরো বেড়ে গেছে। এরপরও তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের অঙ্গীকার পালনের বিষয়ে যত্নবান। যেমনটি আমি বলেছি, আপনাদের মধ্য হতে এখানে যারা বসে আছেন, হয়ত আপনাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন থেকে থাকবে যারা সরাসরি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। অনেকে হয়তো কারো অন্য কারো ঘটনা শুনে থাকবেন। কিন্তু আপনাদের মধ্য হতে আবার অনেকে হয়তো এমনও আছেন, যারা কুরবানি করেছেন– তাদের সম্পর্কে জানেন না, অথবা তাদের ঘটনা শোনারও সুযোগ হয়নি। তাই তাদের জন্যও আমি বলে দিলাম, কীভাবে ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শনকারীরা নিজেদের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

একটি ঘটনা ঘটার কিছুকাল পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তা ভুলে যায়। কিন্তু শহীদদের শাহাদাত এবং ত্যাগীদের ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক। এর কারণ হল, যে-মহান উদ্দেশ্যে তারা এই ত্যাগ করেছেন, আমাদেরকেও সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। উন্নয়নশীল জাতির পরিচয় হচ্ছে, তারা কখনো ত্যাগীদের ভুলে যায় না। তারা তাদের কথা স্মরণ রাখে এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় এবং নিজেদের ঈমান সুদৃঢ় করে। এসব ঘটনা আমাদের নিরাশ বা ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য নয়; বরং আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার কারণ হয়ে থাকে। আমাদের নিজেদেরকে কুরবানীর জন্য উপস্থাপন করা আর আমাদের ও আমাদের ঈমানকে শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। তাদের অঙ্গীকার ও ত্যাগের ঘটনাবলী স্মরণ করে আমাদের নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ন করা উচিত। নিজেদের অঙ্গীকারসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে একে আরো সুদৃঢ় করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন. ***"খোদা তা'লা এখন সত্যবাদীদের জামা'ত গঠন করছেন"***। তাই আমাদের নিজেদেরকে সেসব সত্যবাদীর দলভুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর আমরা যখন নিজেদের সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবো, যখন নিজেদের সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবো এবং আমরা আমাদের ওপর অর্পিত সকল আবশ্যক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করলেই এটি সম্ভব হবে। এমনটি না করলে তিনি (আ.) সাবধানও করেছেন। অর্থাৎ, একদিকে সত্যবাদীদের জামা'ত গঠিত হচ্ছে। এরপর সাবধান করে বলেন, যে সত্যবাদী নয় সে আজ নয়তো কাল জামা'ত ছেড়ে চলে যাবে এবং এই জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যবাদীকে খোদা ধ্বংস করবেন না।

কাজেই, সর্বদা স্মরণ রাখুন আর সততার বিরল দৃষ্টান্ত দেখাতে থাকুন এবং তা আমাদের দেখাতেই হবে, ইনশাআল্লাহ্। তাহলে আমরা সর্বদা খোদা তা'লার সন্তোষভাজন হতে থাকবো। তাই, আমাদের যুবকদেরও এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা চাই আর আমাদের সন্তানদেরও এ বিষয়টি সদা মানসপটে গেঁথে রাখা উচিত। আমি কিশোর ও তরুনদের দৃষ্টান্তও এখানে দিয়েছি, শত্রুর কোনো অসদাচরণ ও আক্রমণেই আমাদের ভীত হওয়া চলবে না; বরং যেসব দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিজেদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করতে হবে। কখনোই কোনো প্রকার অযথা সন্দেহে নিপতিত হওয়া উচিত নয় যে, এই বিপদাপদ দীর্ঘায়িত হচ্ছে, জানি না পরে আরো কী হবে। বরং প্রত্যেক পরীক্ষার ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর আমাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

তিনি (আ.) অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, ***"আমাদের অনুসারীদের ওপরও এমন এক যুগ আসবে যে, তারা উন্নতির পর উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্"***। তিনি (আ.) আরো বলেন, ***"কিন্তু আমি জানি না এটি কি আমাদের যুগে হবে না-কি আমাদের পরে হবে?"*** আরো বলেন, ***"আমাদের অনুসারীরা ধন-সম্পদে প্রাচুর্য লাভ করবে এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই না, অবশ্যই তারা ঐশ্বর্য লাভ করবে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, যদি তারা সম্পদশালী হয়ে যায় তাহলে ঐসব লোকদের সমমনা হয়ে আবার ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন না হয়ে পরে আর জাগতিকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বসে"***।

অতএব, এটি আমাদের ও আপনাদের, মোটকথা আমাদের সবার জন্য একটি সুসংবাদ; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা জাগতিক ধন-সম্পদ লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু সেই পার্থিবতার পিছনে কখনো ছুটবে না যা ধর্ম হতে দূরে নিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালন করাকে আবশ্যক জ্ঞান করো। তাঁর রসূলের আনুগত্য করাকে সর্বদা অগ্রাধিকার প্রদান করো। বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করো। ইসলামের বাণী জগতময় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। এরপর হুযূর সম্মিলিত দোয়া করান।

ভাষান্তর: ***আহমদ তারেক মুবাশ্বের***
লন্ডন

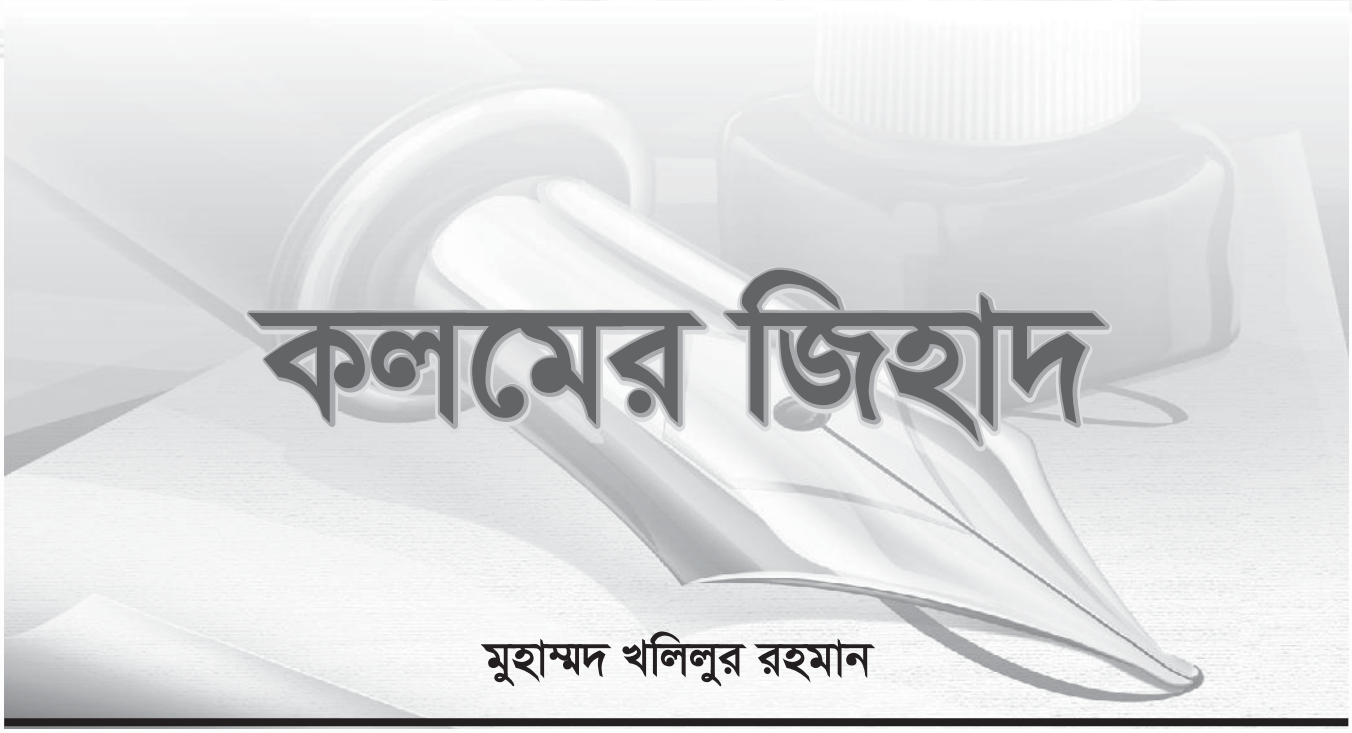

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-২৪)

মদীনা–সনদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ (২৪) :

মহানবী (সা.) কুরআন শরীফ সবচেয়ে ভাল বুঝতেন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তিনি (সা.) নিজে এবং তাঁর সাহাবারা (রা.) কুরআনে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার শিক্ষাকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়ন করেছেন তার এক ঝলক হলো মদীনা–সনদ যা প্রথমে হিজরতের পরপরই সংঘটিত একটি ঘটনা। ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সোনালী শিক্ষার প্রথম বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ মক্কা থেকে হিজরত করার পরই মুসলমানরা লাভ করেছিল। তাই ইসলামের এ দিকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মক্কায় ১৩ বছর যুলুম ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে যখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মদীনায় হিজরত করলেন তখন রসূলুল্লাহ (সা.) সবার আগে মদীনাকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত করার দিকে দৃষ্টি দেন। আশে পাশের এলাকার তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করেন এবং স্বয়ং নিজের নেতৃত্বে মদীনার অভ্যন্তরে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠন করেন। মদীনায় তখন আনসার ও মুহাজির মুসলমান ছাড়াও আওস ও খযরাজ গোত্রগুলো বসবাস করছিলো। আরও ছিল ইহুদী নানা গোত্র। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এতে প্রত্যেক গোত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়।

কেউ কেউ একে 'মদীনা চুক্তি' (Treaty of Medina) নাম দিয়েছেন। আবার কেউবা এটাকে 'মদীনা সনদ' (Charter of Medina) আখ্যা দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্যারিস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ হামীদুল্লাহর দৃষ্টিতে মদীনা সনদ হলো বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। ঐতিহাসকগণ মদীনা সনদ সংরক্ষণ করেছেন এবং বিশ্বের প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫১টি ধারা আছে। এর আলোকে মদীনা শহরকে প্রতিরক্ষার দিক থেকে একটি নগর রাষ্ট্র (City State) হিসাবে গণ্য করা হয়। মদীনা সনদে উল্লেখিত ধারাগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। একে একটি আইনী দলিল আকারে লেখা হয়েছে এবং এর ভাষা বর্তমান যুগের আইনী দলিলগুলো থেকে কোন অংশে অসম্পূর্ণ নয়। এতে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট, বোধগম্য, প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা উল্লেখ ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাস বিশারদরা বিভিন্নভাবে এর ধারা বিন্যাস করেছেন। এই আলোচনায় প্যারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হামিদুল্লাহ কর্তৃক ব্যবহৃত ধারা বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মদীনা সনদ (The Treaty ot Medina)- এর সংক্ষিপ্ত–সার নিম্মরূপ ঃ

[নোট: উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত উপ–শিরোনামগুলো মূল সনদের অংশ নয়। এগুলো পাঠকের সুবিধার্থে সংযুক্ত করা হয়েছে]

(১) ঘোষণাপত্রে অংশ- গ্রহণকারীগণ :

"এটি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণাপত্র যা কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ও মু'মিনদের এবং ইয়াসরিববাসী ও তাদের অধীনস্থ হয়ে যারা সম্মিলিতভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য প্রয়োজ্য।" (সনদের ধারা–১)

(২) সনদের অন্তর্ভূক্ত অংশগ্রহণকারীগণ স্বতন্ত্র উম্মাহ :

"সমগ্র মানবজাতি থেকে পৃথক এরা এক স্বতন্ত্র উম্মাহ্।"(ধারা–২)।

(৩) হিজরতকারী কুরাইশদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ ধারা :

"হিজরতকারী কুরাইশরা তাদের পূর্ববতী নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে, তাদের পারস্পরিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্ববর্তী নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে। তারা নিজেদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে যেন মু'মিনদের মাঝে পারস্পরিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি বজায় থাকে।" (ধারা–৩)।

(৪) বানু আওফ গোত্রের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ ধারা :

"বানু আওফ গোত্রও তাদের পূর্ববতী নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে, তাদের পারস্পরিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্ববতী নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে। প্রত্যেক দল তাদের নিজেদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে যাতে মু' মিনদের মাঝে পারস্পরিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি বজায় থাকে।" (ধারা–৪)।

(৫) বানু হারেস বিন খায়রাজ গোত্র, বানু সায়েদা গোত্র, বানু জুশাম গোত্র, বানু নাজ্জার, বানু আমর বিন আওফ, বানু নাবিত এবং বানু আউস গোত্রের জন্য প্রযোজ্য সুবিচার ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক অধিকার সমুহ সনদের ৫ থেকে ১১ নম্বরে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতঃ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। [বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মূল পাঠ দ্রষ্টব্য]

(৬) মুমেনদের জন্য এবং সংশিষ্ট অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশাবলী/ নিয়মাবলী :

"মু'মিনরা কখনই তাদের কোন ঋণগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মুক্তিপণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না।"(ধারা-১২-ক)।

"এক মু'মিন অন্য মু'মিনের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন মিত্রের বিরোধিতা করবে না।" (ধারা ১২–খ)।

"নিশ্চয়ই খোদাভীরু মু'মিনরা তাদের মাঝে বিদ্রোহী, চরম নির্যাতনকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, মু'মিনদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে– সে তাদের সন্তান হলেও সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করবে।" (ধারা–১৩)।

"কাফির হত্যার দায়ে এক মু'মিন আরেক মুমিনকে হত্যা করবে না, আর কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে সে কাফিরকে সাহায্য করবে না।" (ধারা–১৪)।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তা সবার জন্য সমান। নগণ্যতম ব্যক্তিও আশ্রয় প্রদানে সক্ষম। অন্য সকলের তুলনায় মু'মিনরা একে অপরের মিত্র।" (ধারা–১৫)

"আর ইহুদীদের মাঝে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে সে আমাদের সাহায্য ও সম-অধিকার লাভ করবে। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে কোন যুলুম করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করা হবে না।" (ধারা-১৬)

"নিশ্চয়ই মু'মিনদের পক্ষ থেকে সম্পাদিত 'সন্ধি' হবে এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র পথে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে কোন মু'মিন এককভাবে নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন চুক্তি করতে পারবে না যা সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।" (ধারা-১৭)

"আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সেনাদল পালাক্রমে বিরতি লাভ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।" (ধারা-১৮)

"আল্লাহ্‌র পথে রক্তক্ষয়ের প্রতিশোধ মু'মিনরা সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করবে।" (ধারা-১৯)

"নিশ্চয়ই খোদাভীরু মু'মিনরা সর্বশ্রেষ্ঠ ও দৃঢ়তম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত।" (ধারা-২০-ক)

"মদীনার কোন মুশরিক কুরাইশ গোত্রের কাউকে ধন–সম্পদের বা জীবনের আশ্রয় দিতে পারবে না। একইভাবে সে কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন অমুসলিমকে সাহায্য করতে পারবে না।" (ধারা-২০-খ)

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তাকেও প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা হবে। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির ত্তরাধিকারীরা রক্তপণ নিতে সম্মত হলে সে কথা ভিন্ন । সকল মু'মিনের জন্যই এই বিধান অবশ্য পালনীয়, এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি তাদের জন্য বৈধ নয়।" (ধারা-২১)

"এই ঘোষণাপত্র মান্যকারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মু'মিন কোন নব সংযোজনকারীকে সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করলে তার ওপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।" (ধারা-২২)

"আর তোমরা যখনই পারস্পরিক কোন মতবিরোধের লিপ্ত হবে তখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর শরণাপন্ন হবে।" (ধারা-২৩)

(৭) মু'মিনদের সাথে ইহুদীরা একই উম্মত–ভূক্ত বলে গণ্য হবে :

"মু'মিনরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে ইহুদীরাও তাদের সাথে যুদ্ধব্যয় বহন করে যাবে।"

"বনু আওফ গোত্রের ইহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। একই কথা এদের মিত্রদের এবং এদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যে অত্যাচার করবে এবং অপরাধ করবে সে কেবল নিজেকে এবং নিজ পরিবারকেই বিপদগ্রস্থ করবে।" (ধারা- ২৪, ২৫)

(৮) সমান অধিকার : সনদের (২৬) থেকে (৩৫) ধারাগুলোতে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল গোত্র এবং উপগোত্রগুলোকে। [বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মূল পাঠ দ্রষ্টব্য]

(৯) সামরিক অভিযান, যুদ্ধ ব্যয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী :

"কেউ মুহাম্মদ (সা.)–এর অনুমতি ছাড়া সামরিক অভিযানে বের হবে না।" (ধারা-৩৬-ক)

"কোন ক্ষত বা আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা আরোপ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কারও অন্যায় রক্তক্ষয় ঘটায় সে তা নিজের এবং নিজ পরিবারের ক্ষতির জন্য ঘটায়। তবে নিহত ব্যক্তি অপরাধী হলে সেটা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট যে এ বিধানকে মান্য করে।" (ধারা-৩৬-খ)

"ইহুদীরা তাদের নিজেদের (যুদ্ধ) ব্যয় নিজেরা বহন করবে আর মুসলমানরা তাদের নিজেদের (যুদ্ধ–) ব্যয় নিজেরাই বহন করবে। আর যারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিপক্ষে সাহায্য করা চুক্তিবদ্ধ সবার জন্য আবশ্যক হবে। চুক্তিবদ্ধ দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শুভকামনা ও সদুপদেশের সম্পর্ক থাকবে। তাদের মাঝে অন্যায় বা অপরাধের

পরিবর্তে উদারতা ও মহানুভবতার সম্পর্ক বিরাজ করবে।"(ধারা-৩৭-ক)

"নিশ্চয়ই মিত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করা হবে না। অবশ্যই নিপীড়িতকে সাহায্য করা হবে।" (ধারা-৩৭-খ)

"মু'মিনরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে ইহুদীরাও তাদের সাথে মিলিতভাবে যুদ্ধ-ব্যয় বহন করে যাবে।" (ধারা-৩৮)

"ইয়াসরিবের উপত্যকা এই চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।"(ধারা-৩৯)

"প্রতিবেশীরা নিজেদের লোকদের মতই নিরাপত্তা ভোগ করবে, তাদের কোন ক্ষতিসাধন করা হবে না আর তারাও কোন অপরাধে লিপ্ত হবে না।" (ধারা-৪০)

"নগরবাসীর অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির 'আশ্রয়' প্রতিষ্ঠিত হবে না।" (ধারা-৪১)

"এই চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদের মাঝে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বা দ্বন্দ্ব-কলহের ফলে কোন নৈরাজ্যের আশঙ্কা দেখা দিলে এর মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা.)-শরণাপন্ন হতে হবে। আর যে সততার সাথে এই চুক্তি মান্য করে চলে আল্লাহ্ তার সাথে রয়েছেন।" (ধারা-৪২)

(১০) "সম্মিলিত প্রতিরোধ/নিরাপত্তা ব্যবস্থা" :

"কুরাইশ এবং তাদের সহযোগীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না। মদীনায় আক্রমণকারীদেরকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকরা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবে।" (ধারা-৪৩)

"এদেরকে (অর্থাৎ ইহুদীদেরকে) কোন সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হলে তারা সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করবে। একইভাবে এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) কোন সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হলে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করা মু'মিনদের জন্যও বাধ্যতামূলক হবে। তবে ধর্মীয় কারণে যুদ্ধ হলে সে কথা ভিন্ন।" (৪৫) "(ইয়াসরিব আক্রান্ত হলে) প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ শরীকদলের ওপর তাদের সম্মুখে অবস্থিত নগরাংশ সুরক্ষা করার দায়িত্ব বর্তাবে।"

"আওস গোত্রের ইহুদীরা এবং তাদের মিত্ররা এই চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য শরীকদলের মতই সমান অধিকার ও দায়দায়িত্ব রাখে। এই ঘোষণাপত্র সম্পাদনকারীদের কাছ থেকে তারা পূর্ণ ও ন্যাসঙ্গতভাবে তা লাভ করেছে। আর অপরাধী ব্যক্তি কেবল নিজ অপরাধের দায়-দায়িত্ব বহন করবে। আর যে ব্যক্তি সততা ও নিষ্ঠার সাথে এই চুক্তি মেনে চলবে মহান আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী।" (ধারা-৪৬)

"এই চুক্তিপত্র কোন অত্যাচারী বা চুক্তি লঙ্ঘনকারীর জন্য রক্ষাকবচ নয়। যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বের হয় তার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর যে ব্যক্তি (যুদ্ধে না গিয়ে) নিষ্ক্রিয় বাড়িতে বসে থাকে তার জন্যও রয়েছে নিরাপত্তা। তবে যে অত্যাচার করে কিংবা চুক্তি লঙ্ঘণ করে তার কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি সততা ও খোদাভীতির পথে অবিচল থাকবে আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সা.) তার আশ্রয়দাতা ও সহায় হবেন।" (ধারা-৪৭)।

দেখা যাচ্ছে, এই দলীলের দুই নম্বর ধারায় মক্কা থেকে আগত কুরাইশ গোত্র, মদীনার আনসার এবং পৌত্তলিক আওস এবং খাযরাজ গোত্র আর ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রকে সম্মিলিতরূপে "উম্মাতুন ওয়াহেদাতুন মিন দুনিন নাস" অর্থাৎ একই উম্মত বলা হয়েছে। দুই নম্বর ধারার এই অনুবাদ মূল Text বা পাঠের আলোকে করা হয়েছে আর এই একই অনুবাদ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের ২য় খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে। তা ছাড়া ২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে : বনু আওফ গোত্রের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতরূপে একই উম্মত হিসাবে পরিগণিত হবে। এর পরপরই ধর্মীয় স্বাধীনতার অমোঘ ঘোষণা দিয়ে বলা হয়ছে, 'ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম'। এরপরে বিভিন্ন ইহুদী গোত্র-উপগোত্রের নাম নিয়ে তাদের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে যে প্রথম ইসলামী নগর-রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল বহু ধর্ম-সম্বলিত (Pluralistic) এক রাষ্ট্র। এতে সব ধর্মের অনুসারীরা সমানভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর জীবনে যখনই বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তখনই তিনি সে সুযোগে অমুলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং সাহাবীদের যুগেও যে সব বিজয় অর্জিত হয়েছে সেগুলোতে এই একই নীতি কার্যকর ছিল। খৃষ্টান, ইহুদী ও অগ্নিপূজারী প্রত্যেক প্রকার ধর্মানুসারীদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এতে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণের স্বাধীনতাই প্রদান করা হয় নাই বরং সেই বিশ্বাসে আমল করার এবং বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-আচরণ পালনের স্বাধীনতাও তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। [২৪]

সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রণীত হয়েছে এই মহা-সনদ। এটি এমন একটি রক্ষা-কবচ যা সত্যিকার অর্থে আদর্শ বা 'মডেল' হিসাবে যে কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধানের জন্য পথ-নির্দেশকারী আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে, বর্তমান যুগের মোল্লা-মৌলবীগণ এই মহাসনদ সর্ম্পকে 'টক শো' এবং অন্যান্য মেডিয়া ও জনসভায় কোন কোন সময় মৌখিক কথা-বার্তা বলে থাকেন, কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে সনদটির মূল বিষয়গুলোর কেন্দ্রীভূত ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্যের দিকে তারা বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করতে চান না। যতক্ষণ কথা ও কাজ সুসমন্বিত পথ ও পন্থায় প্রতিপালিত হবে না, ততক্ষণ এই মহা-সনদের সুমহান বাণী তথা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উদার-নীতি, কাংখিত শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের ঐকান্তিক আশা ও আকাংখা এই যে, মদীনা সনদের অন্তর্নিহিত মহা-বারতার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সত্যের ও শান্তির মহা-বিজয় হবে। অন্য কোন বাঁকা পথ ও পন্থা বা জোর- জবর-দস্তী অথবা কুসংস্কার দ্বারা ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয় কখনই হবে না। এই সুমহান লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম সংগঠন শান্তিপূর্ণ পথ ও পন্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কলমের জিহাদ করছে।

[গত সংখ্যার (২৩কিস্তি) দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ঙ প্যারার শেষে রেফারেন্স ২৫ হবে]

(চলছে)

আল্লাহ্‌র কাছে প্রকৃত শাশ্বত সত্য ধর্ম কেবল ইসলামই। সমগ্র মানব জাতির জন্য ইসলাম ধর্মকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। যেমন আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম (সূরা আল ইমরান: ২০)।

ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত ধর্ম। ইসলাম ধর্ম নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়ে ধর্ম ও শরীয়ত ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ববর্তী সকল ধর্ম ও অপূর্ণ শরীয়ত ব্যবস্থা মানসূখ বা রহিত করে ইসলাম ধর্মকে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য একমাত্র ঐশী মনোনীত ধর্ম হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত চিরস্থায়ী ধর্ম। এই ধর্ম খোদা তা'লার তৌহিদকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ধর্ম আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর কাছে পরিপূর্ণত আত্মসমর্পণের বিশ্বাসকে কেবল লালনই করে না বরং আত্মসমর্পণের ধারণা ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণতা দান করেছে।

ইসলাম অর্থ পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্‌র জন্য ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া এবং তাঁর নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেওয়ার নামই ইসলাম। ইসলাম গ্রহণে মজবুত হাতল ধরা হয়। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে, আর যে তার সব মনোযোগ আল্লাহ্‌তে সমর্পণ করে এবং যে সৎ কর্মপরায়ন সে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় এক মজবুত হাতল ধরে ফেলেছে। (সূরা লুকমান : ২৩)

ইসলামের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম নেই। আল্লাহ্ বলেন, আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম আর কে যে সৎকর্ম পরায়ন হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে? (সূরা নিসা : ১২৬)

ইসলামী শরীয়ত গ্রন্থ কুরআন মজীদ একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত কিতাব। মহান আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী শরীয়তকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, আর আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা : ৪)

ইসলাম ধর্ম ঐশী খিলাফত ব্যবস্থাধীনে সকল মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ ঐশী ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মানবজাতি সকল মতভেদ ভুলে অচিরেই বিশ্বনবী (সা.)-এর নেতৃত্বে একই মোহনায় মিলিত হবে-এমনটি ধার্মিকদের প্রত্যাশা। আর তখন বিশ্বে ইসলাম ধর্মেরই অস্তিত্ব বজায় থাকবে। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই তখন দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, পৃথিবীবাসী মনে করতে পারে যে, খৃষ্টান ধর্ম অবশেষে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে অথবা বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু তারা তাদের ধারনায় ভ্রান্তিতে রয়েছে। স্মরণ রেখো এই ধরাপৃষ্ঠে কিছুই ঘটেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না আকাশে উহার আদেশ হয়। সুতরাং আকাশের খোদা বলেছেন যে, অবশেষে ইসলাম ধর্মই মানুষের হৃদয়কে জয় করবে (রূহানী খাযায়েন, ২১খণ্ড, পৃ. ৪২৭)

ইসলামেই মুহাম্মদী নবুওয়ত ও রিসালাতের অফুরন্ত কল্যাণ ধারা চির প্রবহমান রয়েছে। ইলামের নবী একজন কামেল শরীয়ত ধারী নবী। পূর্ণতা ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের শিক্ষা নিয়ে হযরত রসূল করীম (সা.) আগমণ করেছেন। এই ধর্মেই নেয়ামতের কল্যাণ ধারা প্রবাহমান রয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ককে চির মজবুত ও দৃঢ় করে গেছেন। তার পদাংক অনুসরণ করে যারা চলবে তাঁরাই নেয়ামতের অধিকারী হবে। খোদা তা'লাকে পাওয়ার রাস্তা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের নবীর অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া খোদা তা'লাকে পাওয়ার অন্য কোন পথ আর খোলা নেই। আমাদের নেতা ও মওলা নবীদের গৌরব এবং মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পথকে অনুসরণ ছাড়া আধ্যাত্মিক নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। ইসলাম ছাড়া মানবজাতির মুক্তির পথ অন্য ধর্মে খোলা নেই। ইসলামের নবীর অনুসরণই কেবল সকল কল্যাণ লাভ হতে পারে। অন্য পথে পরিত্রাণের রাস্তা খোলা নেই।

ইসলাম জীবন্ত খোদার আধ্যাত্মিক কল্যাণ বর্ষী চির সজীব ধর্ম। এই ধর্মের নবী মুহাম্মদ (সা.)-ও জীবিত নবী। তাঁর শরীয়ত গ্রন্থ কুরআন মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ থেকে মুক্ত এবং ঐশী হেফাজতে সুরক্ষিত।

আজ সেই দিন আগত প্রায় যখন সত্যের দেদীপ্যমান সূর্য পশ্চিমে উদিত হবে। ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে। সেই দিন নিকটবর্তী যখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম লোপ পাবে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র ততদিন পর্যন্ত না ভগ্ন হবে, না তিক্ষ্ণতা হারাবে।

যতদিন পর্যন্ত না উহা দাজ্জালী [ত্রিত্ববাদের ধবজাধারী শক্তি] শক্তিকে চুর্ণবিচূর্ণ করে খোদা তা'লার সেই খাঁটি তৌহিদ যা মরুপ্রান্তরের অধিবাসীগণ এবং যারা সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত তারা ও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করবে এবং অচিরেই তা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সে দিন না কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব থাকবে না কোন কল্পিত খোদার। আল্লাহ্ তা'লার একটি আঘাত কুফরের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবে। কিন্তু তা কোন তরবারীর সাহায্যে বা কোন বন্দুকের দ্বারা হবে না। বরং তা সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মাকে আলোক দানের মাধ্যমে হবে। সন্তান ভুমিষ্ট হয়ে যুবক হওয়ার পর যেমন মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না। তেমনি প্রগতির ধারায় ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে আবার খৃষ্টান ধর্মে ফিরে যাবে না। ইসলাম ধর্মই অবশেষে জগতে বিজয়ী হবে এটাই আল্লাহ্ তা'লার বিধান।

দেশে দেশে সালানা জলসা

বাংলাদেশ জামা'তের জলসা সালানা যখন থেকে নতুন মাত্রা লাভ করল

২০০৯-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ৮৫তম জলসা সালানা উপলক্ষে লন্ডন থেকে হুযূর (আই.) সরাসরি বক্তব্য রাখছেন

২০১২-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ৮৮তম জলসা সালানা উপলক্ষে লন্ডন থেকে হুযূর (আই.) সরাসরি বক্তব্য রাখছেন

২০১১ সালে গাজিপুরে অনুষ্ঠিত জলসায় আগত দর্শকশ্রোতার একাংশ

২০১৪ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত ১২৩তম জলসা সালানা উপলক্ষে লন্ডন থেকে হুযূর (আই.) সরাসরি বক্তব্য রাখছেন

এমটিএ-এর কল্যাণে কাদিয়ানে বসে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য শুনছেন

২০১৪ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত ১২৩তম জলসায় দোয়ায় রত মসীহ্ প্রেমীকগণ

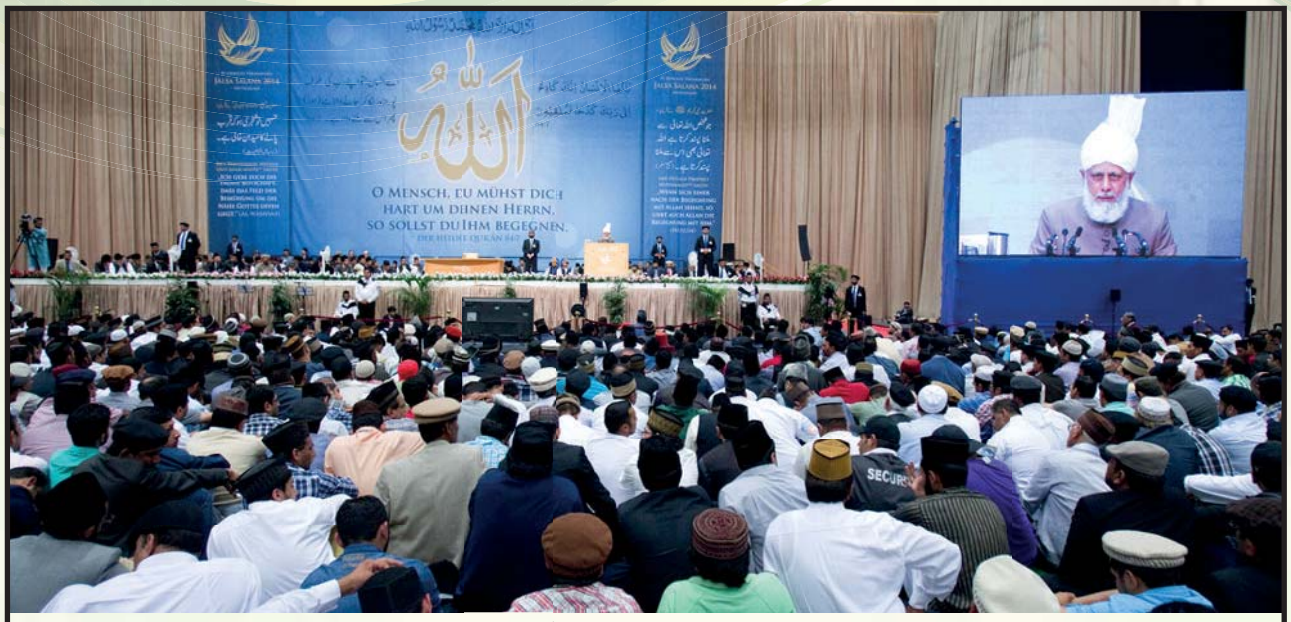

২০১৪ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

২০১৪ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় দর্শকদের একাংশ

২০০৪ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)

২০০৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত জলসায় দোয়ায়রত হুযূর (আই.)

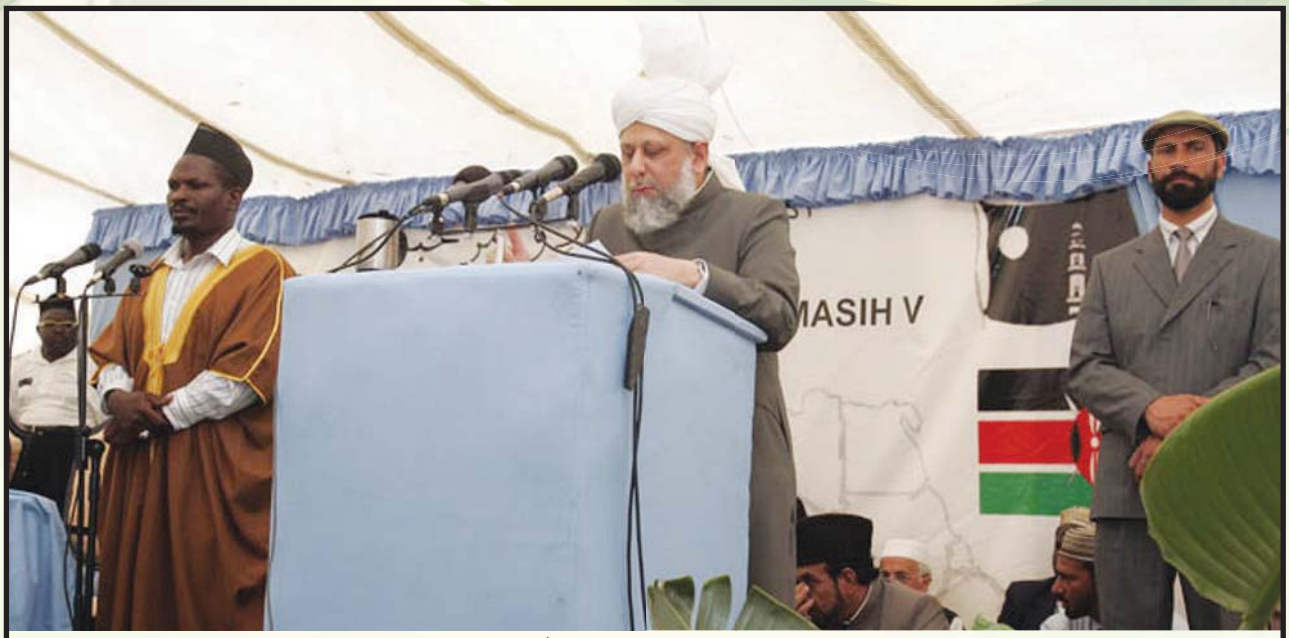

২০০৫ সালে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

২০০৫ সালে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় দর্শকদের একাংশ

ঘানার জলসায় সেদেশের রাষ্ট্রপতি হুযূর (আই.)-এর পাশে উপবিষ্ট

পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জলসার একটি দৃশ্য

২০১৪-এর ইউকে জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)

২০১৪-এর ইউকে জলসায় আন্তর্জাতিক বয়আতের একটি দৃশ্য

প্যালেস্টাইনের আহমদীরা হুযূর (আই.)-এর উপস্থিতিতে কাসিদা পাঠ করছেন

২০০৫-এ তানজানিয়ার জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের জলসার একটি দৃশ্য

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কানাডা জলসার একটি দৃশ্য

২০০৬-এ বেলজিয়াম জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

২০০৪-এ হল্যান্ড জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

১৯৮৩ সালে পাকিস্তানের রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বক্তব্য রাখছেন

১৯৮৩ সালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জলসার একটি দৃশ্য

২০১৩-এ অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া জলসা সালানার একটি দৃশ্য

২০১০-এ অনুষ্ঠিত গুয়াতেমালা জলসা সালানার একটি দৃশ্য

২০০৫-এ কাদিয়ান জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

২০০৪-এর সুইজারল্যান্ডের জলসায় হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখছেন

আলোকচিত্রগুলো www.alislam.org-এর সৌজন্যে

মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় হুযূর (আই.)-প্রদত্ত ভাষণ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

[হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ, বার্ষিক জাতীয় ইজতেমা, ২০১৪, মজলিস আনসারুল্লাহ, যুক্তরাজ্য, ১৯ অক্টোবর ২০১৪]

আলহামদুলিল্লাহ! যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ'র ইজতেমা তিন দিন পূর্বে শুরু হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও আশিসে আজ সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। প্রতি বছর এখানেও আর বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আনসারুল্লাহ'র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আনসার প্রচুর সংখ্যায় এতে সমবেত হন আর ইজতেমার অনুষ্ঠানসমূহে অংশও নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন রয়েছেন যারা আনসারুল্লাহ'র উদ্দেশ্য কী আর কী'বা তাদের দায়-দায়িত্ব, এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। 'আনসার' যেমনটা আপনারা জানেন, এটা 'নাসের' এর বহুবচন যার অর্থ হলো 'সাহায্যকারী'। অতএব 'আনসারুল্লাহ' অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারীদের সঙ্ঘ।

সাংগঠনিকভাবে 'আনসার' এর শুরুটা হয় ৪০ বছর বয়স পার হওয়ার পর থেকে। সাধারণ অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তি, যে-ই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের আওতাধীনে এসেছে, বয়সে সে এর চেয়ে ছোটই হোক, পুরুষ কিংবা নারীই হোক, বয়আতের অঙ্গীকার পালনে নিজেকে সোপর্দ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিতে ও বিস্তার দানে তার সচেষ্ট থাকা উচিত।

তবে আনসারুল্লাহ, ৪০ বছর বয়স থেকে যার শুরু, তা এমন এক বয়স, যোগ্যতা এবং চিন্তা-চেতনা ও পরিপক্কতার শীর্ষে এর অবস্থান, আর এ কারণে তাদেরকে নিয়ে যে সংগঠন তার নামটিও 'আনসারুল্লাহ'।

তাদের ভাবা উচিত, আপনাদের সচেতন থাকা উচিত এই বলে যে- আমাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কী? কেবলই নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ আখ্যায়িত করাটাই কী আমাদেরকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পাদনকারী বানিয়ে দিতে পারে?

একটি কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কোন মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। গত পরশু দিনই খুতবাতে আমি উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ চাইলে ধর্মের সেবাকারীদের জন্য সরাসরি উপকরণ যোগান দিতে পারেন, সকল কিছুর মালিক তিনি, আর তাদের কাজকে তিনি সহজও করে দিতে পারেন। পবিত্র কুরআন থেকে এমনটাই জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লাই তাঁর নবী ও নবীর জামা'তকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন- 'আমি তোমাদের সাহায্যকারী'। কাফেররা সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে নবী ও

নবীর জামা'তকে ভয়-ভীতি দেখালে নবীর জবাব এটাই হয়ে থাকে যে, 'তোমরা আমাকে তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে নেয়ার যে কথা বলছো, তবে আমার এমনটা করায়, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচাতে তোমরা বা অন্য কেউ সাহায্য করতে পারবে কী?'

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই, তবু নবুওয়তের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাই মানুষকে সুযোগ দিয়ে থাকেন, যাতে জগতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমরা সামান্য কোন চেষ্টা করলেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এতো বেশী পুরস্কৃত করেন যে, সৃষ্ট জগতে তুচ্ছ্যাতি তুচ্ছ যার অবস্থান, আমাদের মত সেই অতি সাধারণ মানুষগুলোকেও আল্লাহ্ তা'লা তার নিজের সাহায্যকারীগণের মধ্যে গণ্য করে নেন। অতএব এই প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের নিজেদেরকে নিরীক্ষণ করা জরুরী।

এই যে যুগ, যা ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বিজয়কাল, আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যার সূচনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ঘটিয়েছেন, আমাদেরকে এতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আর আমাদেরকে পরিপক্ক বয়সও দিয়েছেন, এমতাবস্থায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কী? অবশ্যই এই জামা'ত- এ সিলসিলাহ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন আর এর সপক্ষে সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য দেখিয়েও যাচ্ছেন, তাই আমাদের কাছেও প্রত্যাশিত যে, এই মহান বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও মর্যাদার প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে আমরা বিশ্বকে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করি।

জগৎ সমক্ষে আল্লাহ্ তা'লার একত্বের ঘোষণা দিয়ে, তাদেরকে এদিকে ডাকুন, ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যপূর্ণ শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরুন। মহানবী (সা.) এর মহান মর্যাদা আর 'খাতামুর রসূল' হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও তত্ত্বজ্ঞান মুসলমানদের ও অ-মুসলমানদের মাঝে সঞ্চারিত করুন, সেই সাথে নিজেরও হিসাব নিন-'তৌহিদ' (আল্লাহ্ তা'লার একত্ব) নিজ মাঝে কতটা মজবুতির সাথে রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুন-গান কতটা মনোযোগের সাথে করা হচ্ছে এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালার ওপর কতটা আমল করে জীবনকাল কাটানো হচ্ছে? মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের প্রেমানুরাগ তাঁর প্রতি দরূদ পাঠে আমাদেরকে কতটা নিমগ্ন রাখছে আর তাঁর (সা.) আদর্শ ও নমুনা আত্মস্থ করার প্রতি আমরা কতটা মনযোগ দিচ্ছি?

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেছেন এ প্রসঙ্গে আমি এখন আপনাদের সামনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যাতে তিনি (আ.) তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সেসব বর্ণনায় তিনি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আমরা যদি এই চেতনাবোধ থেকে তাঁর (আ.) প্রদত্ত প্রত্যেকটি উপদেশে ভাল ও মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করে যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে, সেই আলোকে নিজেদেরকে নিরীক্ষণকারী হই ও সংশোধনকারী হতে চাই তবে প্রকৃতই আমাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব। প্রকৃত অর্থেই আমরা আনসারুল্লাহ হয়ে উঠবো। সত্যিকার আনসারুল্লাহ'র রঙে রঙিন হয়ে আমরা অন্যদের তরবিয়তকারীতে পরিনত হতে পারবো। যাহোক এখন কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি-

তিনি (আ.) বলেন, কু-প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এমন এক আধিপত্য রাখে যে, মানুষকে তা ধ্বংসের পানে ঠেলে দেয়। মানব অন্তরকে অস্থির ও দিশেহারা করে তাকে কাবু করে ফেলে। এজন্যই কেউ কেউ বলে থাকে শয়তান আক্রমণ করেছে আবার অন্য কোনভাবেও বিষয়টিকে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকে। তবে মানতে হবে যে, আজকাল কু-প্রবৃত্তির তাড়নার প্রবল ঢল নেমেছে। শয়তান তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অপকর্ম আর নির্লজ্জতা মহাঘুর্ণির ন্যায় চতুর্দিক থেকে প্রবল বেগে ধেঁয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ কালে মানুষকে রক্ষা করে থাকেন, অতএব কতনা জরুরী যে, ভয়াবহ এই সংকট কালেও তিনিই রক্ষা করবেন। অতএব নিজ অনুগ্রহেই সংকটময় এই কালে তিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লাই বিপদগ্রস্থ এই লোকদেরকে, এই বান্দাদেরকে যারা নিজেদেরকে শয়তানের কবল হতে রক্ষা করতে চায়, তিনি তাদেরই রক্ষার্থে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, আনসারের বয়সে এক পরিপক্কতা থাকে। অতএব তাদের নিজ থেকেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনিয়তা রয়েছে যে, আমরা কী সর্বপ্রকার পাপ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করে আমাদের এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণকারী হতে পেরেছি?

একই সাথে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যও এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই এই জামা'ত এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়ত আর তাঁর উজ্জল জ্যোতির্ময় মর্যাদা পুনরায় তিনি জগতে প্রকাশিত করবেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন। এক ব্যক্তি যে 'প্রেমিক' হবার দাবি করে আর যদি সেই প্রেমিকের 'প্রেমাস্পদ' এর অনুরূপ হাজার হাজার সংখ্যায় 'ভালোবাসার মানুষ' থাকে তাহলে তার ভালোবাসার বিশেষত্ব কী রইল (কোন প্রেমিকের যদি বহু সংখ্যক প্রেমাস্পদই থাকে তাহলে তার ভালোবাসার উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যই তো আর রইল না)। এজন্যই তিনি (আ.) বলেন, যদি এরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসায় এবং প্রেমে বিভোরই হয়ে থাকে, সাধারণভাবে যেমন তারা- সব মুসলমানরা এই দাবিই করে থাকে, তাহলে এটা কেমন কথা যে, হাজার হাজার সংখ্যায় বিভক্ত খানকা ও মাজারে তারা মাথা ঠুকছে (সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখুন এই পদ্ধতিই চলছে)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, পবিত্র মদীনা শরীফে না গিয়ে বরং আজমীর বা অন্যান্য খানকাতে উদোম শিরে ও নগ্ন পায়ে তারা ছুটছে। এসব ঘাটে ঘাটে পবিত্রতা লাভের অমূলক ধারণা নিয়ে তারা ঘুরে ফিরছে। মাজারগুলোতে ওরসের মৃত্যুবার্ষিকীর নামে অনুষ্ঠিত মেলাগুলো তারা দেখে বেড়ায়। আর সে সব মেলার ঐসব দৃশ্যাবলী দেখে মুসলমানদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে যে, ধর্মের নামে তারা এসব কী বানিয়ে রেখেছে?

তিনি (আ.) আরো বলেন, ইসলামের জন্য খোদা তা'লার যদি আত্মাভিমান না থাকতো আর "ইন্নাদদিনা ইনদাল্লাহীল ইসলাম" (অর্থাৎ 'নিশ্চয়, ইসলামই আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত একমাত্র ধর্ম') খোদা তা'লার পবিত্র বাক্য না হত আর তিনি যদি না বলতেন "ইন্না নাহনু নায্যালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেযুন" ('অর্থাৎ আমরাই এই ধর্ম অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর রক্ষনাবেক্ষণকারী') তাহলে আজ ইসলামের

এই করুন দশা মেনে নেয়া ছাড়া অবশ্যই কোন গত্যন্তর থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান উদ্দীপিত হয়েছে। তাঁর করুনা ও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি পূরনার্থে তিনিই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'বুরুজ' (প্রতিচ্ছায়া)-কে পুনরায় অবতীর্ণ করেছেন। আর এই যুগে এই ভাবে তাঁর (সা.) নবুওয়াতকে নব শক্তিতে জীবন্ত করে দেখিয়েছেন। অতএব, তিনিই এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক 'মাহদী' বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং, উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অনেক বড় এক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, যেজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন আর এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এর নবুওয়ত ও তাঁর মর্যাদা ও সম্মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন আমরা নিজেদের অভ্যন্তরিন অবস্থাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের রঙে প্রকৃতই রঙিন করে তুলবো। আর সেই ছাঁচে নিজেদেরকে গড়তে সচেষ্ট হবো। সেই আদর্শে নিজেদেরকে গড়ার জন্য আমাদের জন্য জরুরী মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের সেই অতুলনীয় মান ধরে রাখা এবং অন্যদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করা। এ প্রসঙ্গটি স্মরণ করাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমি বর্ণনা করে থাকি এবং আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। সেসবের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত।

আমাদের প্রথম কাজতো হলো মহানবী (সা.) প্রদত্ত সেই নির্দেশনাগুলোকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে জগতকে নমুনারূপে দেখিয়ে দেওয়া। আর এটাই হলো সেই জিনিষ যা দুনিয়াকে বলে দেবে যে, ইনিই হলেন মহানবী (সা.), যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা আমরা করছি, বিশেষ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আর এরই মাঝে মহানবী (সা.)-এর জীবিত নবী হবার সাক্ষ্য বিদ্যমান।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন- খোদা তা'লার অনুগ্রহ সঙ্গে না থাকলে খোদা তা'লার মনোনিত মহান ধর্মের নাম-নিশানা কবেই মিটে যেতো। তবে তিনি যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন "ইন্না নাহনু নায্‌যালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেযুন"। রক্ষা করার এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব চাহিদা এটাই যে, পতনোম্মুখ কালে এই সুরক্ষা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

পাহাড়াদারের কাজ হলো লুকিয়ে থাকা লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং অন্যান্য অপরাধীদেরকে অপকর্মে লিপ্ত দেখলে বিধি-সম্মত দায়িত্ব পালন ও এর প্রতিবিধান করা। অনুরূপভাবে, যেহেতু আজকাল বিদ্রোহী শক্তি- শত্রুরা সবাই একত্রে মিলে সম্মিলিতভাবে ইসলামের দূর্গের ওপর সর্বপ্রকার মারমুখী রণসাজে সজ্জিত হয়ে আঘাত হানছে, এজন্য খোদা তা'লা চেয়েছেন যে, তিনি 'মিনহাজিন নবুওয়ত' প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলামের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে তিনিই এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মকে সুরক্ষিত ও পবিত্র রেখেছেন। কিন্তু মন্দের প্রাদুর্ভাব ঘটার সময়, শুরুতে যেমন ভ্রুণ হয় আর সেই ভ্রুণ সুনির্দিষ্ট এক মেয়াদকাল কাটানোর পর 'শিশু' হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। একইভাবে ইসলামের বিরোধিতার শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে এখন পূর্ণ প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যৌবনের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবল শক্তি লাভ করেছে, তাই একে ধ্বংস করার জন্য খোদা তা'লাই আকাশ থেকে এক যুদ্ধের অবতরণ ঘটিয়েছেন এবং ছলনাময় এই শিরক যা অভ্যন্তরীনরূপে ও বাহ্যিকভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তা দূর করতে খোদা তা'লাই একত্ব ও এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব এই সিলসিলাহ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আর আমি দৃঢ়তাপূর্ণ সুনিশ্চিত দাবির সাথে বলছি যে, এসব অবশ্যই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, তিনি স্ব-হস্তে এই প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন, যেমনটা তিনি এই জামা'তের প্রতি নিজের সাহায্য সমর্থন দ্বারা প্রকাশ করে দেখিয়েও দিয়েছেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এই জামা'তের সাথে অবধারিতরূপে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত এই জামা'তের যে উন্নতি হচ্ছে এটাই তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। কিন্তু আমাদেরও নিজেদের হিসাব-নিকাশ নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ ও এর প্রভাবের জন্য এবং ইসলামের অনুপম শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা কী?

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করার উপায় প্রসঙ্গে সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

সকল নবী আলাইহিমুস সালাম গণের আবির্ভাবের অভিন্ন উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা সঠিক ও সত্যিকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর মানব সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহমর্মিতার এক বিশেষ রঙ সৃষ্টি করে দেয়া হবে। যতক্ষণ বিষয়টি এমন না হচ্ছে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম নিছক একটি প্রথা বা রীতি-সর্বস্ব হবে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁকেই (আল্লাহ্‌কে) আমি আমার হৃদয়-গহীনে রেখেছি, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। কিন্তু ফল দেখে বৃক্ষ চেনা যায়। যেমন কোন বৃক্ষের তলায় কোন ফল পরে থাকতে দেখলে বুঝা যায় ঐ গাছে কোন ফল ধরেছে, কিন্তু গাছের তলায় কিছুই যদি দেখতে পাওয়া না যায় তবে উপরে-গাছে ফল কী ধরে আছে তা কী করে জানা সম্ভব হতে পারে! অনুরূপভাবে, মানব সন্তানদের মধ্যে নিজেদের-নিকটজনদের সাথে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এই সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। একই সাথে এই অবস্থা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথেও তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষভাবে এটা উপলব্ধি করার বিষয়। সাধারণভাবে লোকজনদের সাথে এবং নিকটজনদের সাথে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার বিশেষ যে সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়, আল্লাহ্ তা'লাই তা গড়েন। একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার যে সম্পর্ক তার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। আর এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, যাদের মধ্যে ভালোবাসাপূর্ণ এই সুসম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার সাথেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নইলে এটাতো জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতই আছে, না নেই। এর প্রকাশ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা দৃশ্যমান হলে তবেই বুঝা যায়, এরই মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা ও ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার রঙ থেকেই সৃষ্ট। দেখ! দুনিয়াটা কয়েকদিনের।

আর অগ্রে ও পশ্চাতে যারা রয়েছে, সবাই মৃত্যু-পথযাত্রী। আনসারুল্লাহ সদস্যদের বয়স ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে, বৃদ্ধও হয়ে

যাচ্ছে। বরং আনসারুল্লাহ-য় প্রবেশ করার সাথে সাথে এই ধারণা হয়ে যায় যে, এখন আমরা এমন বয়সে পদার্পন করছি যা আমাদের বয়স সীমার শেষ প্রান্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ইহজগত কয়েক দিনের। তোমার পূর্বপ্রজন্ম ও পরপ্রজন্ম সবাই মৃত্যু পথযাত্রী। কবর মুখ খুলে হা করে অবিরত ডাকছে। আর প্রত্যেককে তার পরিনতিতে প্রবেশ করতেই হবে। শত চেষ্টাতেও আয়ুস্কাল বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, জীবনও থেমে থাকেনা। আরো ছয়মাস বা তিনমাস বেঁচে থাকবো- ধারণা করা যায় কী? এই বিশ্বাসটুকুও নেই যে, এক পদক্ষেপ নেয়ার পর পুনরায় পদক্ষেপ নেয়া পর্যন্ত বাঁচবো কী'না!

অতএব, অবস্থা এমনই সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর দিন-ক্ষণ জানা নেই। আর চূড়ান্ত কথা এটাই। নিশ্চিত ও সুদৃঢ় সত্য এটাই। আর এই সত্য ভুলবার নয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য যে, এই মুহুর্তটির জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত। এজন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে- "লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলেমুন", প্রতি মুহুর্তেই মানুষ খোদা তা'লার সাথে নিজ হিসাব-নিকাশের বিষয়াদী যতক্ষণ স্বচ্ছ করে না নিচ্ছে এবং নিজের ওপর বর্তানো দু'টি দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় না করছে ততক্ষণ কাজের কাজ কিছুই হয় না। যেমন আমি বলেছি, অধিকারও দুই ধরনের- (১) হুকুকুল্লাহ এবং (২) হুকুকুল ই'বাদ। অতএব বয়স ভাটিকালে পদার্পনের সাথে সাথে এই দুই ধরনের অধিকার আদায়ের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়ার অনেক বেশী প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের নিজেদের কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে জামা'তকে আরও উপদেশ দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, এই জামা'ত খোদা তা'লাই যখন প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সাহায্যার্থে ও সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত করেছেন, এথেকে প্রতীয়মান হয় যে এটা সাহাবাদের জামা'ত, অতএব সমাগত 'খাইরুল কুরুন' সর্বোৎকৃষ্ট এর যুগ। যারা এই জামা'তে যোগদান করে, যেহেতু তারা 'আখারীনা মিনহুম'(পরবর্তীদের মধ্যে আবির্ভূত) এর মধ্যে গণ্য, এজন্য তারা ইহ জাগতিকতার মিথ্যা ভূষণ পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার সমীপে সর্বতোভাবে নিবেদিত হন- ফেজ্জে আউজ অর্থাৎ বিদ্রোহী শক্তির বক্রতার অরি হয়ে যান তারা। এর পর হল ইসলামের তিনটি যুগ-সন্ধি কাল- (১) কুরুনে ছালাছা (তৎসন্নিহিত তিন শতাব্দী) এরপর (২) ফেজ্জে আউজ (বক্রতা) এর যুগ।

এই যুগ-কাল সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'লাইসা মিন্নি ওয়া লাসতা মিনহুম' অর্থাৎ সে না আমার থেকে আর না আমি তাদের মধ্য থেকে। অতঃপর তৃতীয় যুগ-কাল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ-কালেরই সাথে সংবদ্ধ, প্রকৃত অর্থে এটা রাসূলুল্লাহ (সা.) এরই যুগ-কাল। রসূলুল্লাহ (সা.) 'ফেজ্জে আউয' এর উল্লেখ যদি না-ও করতেন তবুও পবিত্র কুরআন আমাদের হাতে রয়েছে আর আয়াত 'আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাক্কুবিহিম' (অর্থাৎ 'তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি') সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এমন যুগ-কালও রয়েছে যা সাহাবাদের আদর্শের পরিপন্থী আর সেই বাস্তব ঘটনাবলী বলে দিচ্ছে যে, সেই হাজার বছরকালের মাঝে ইসলাম অনেক অনেক বিপদজনক ও মারাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল।

নির্দিষ্ট স্বল্প সংখ্যার সাহাবীরা ছাড়া সবাই ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে এবং বহু ফিরকা- মুতাজিলা (কুরআনকে মানবসৃষ্ট জ্ঞান করে) ও ইবাহাতী (হারামকে সিদ্ধ জ্ঞান করে এবং বৈধতা দেয়) ইত্যাদি বহু দল উপদল সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন আবার আরেক যুগ এসেছে- ইসলামের বদনামের যুগ। ইসলামী শিক্ষার অনুশীলন লোকেরা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম অলেমগণের বানোয়াট শিক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অনুসরণ করে 'যুগ ইমাম' এর আনুগত্য করছে না বরং তাঁকে পরিত্যাগ করছে। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার পদ্ধতি যদিও পাল্টে গেছে তবুও সাধারণ মানুষকে ইসলাম থেকে দূরেই হটানো হচ্ছে। যারা কাছে ভিড়ছে তারাও প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের এই কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, কোন যুগ এমন কাটে নাই জগতে যখন ইসলামের কল্যাণ প্রদানকারী অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র সেই বান্দা ও আউলিয়া ঐ মধ্যবর্তী যুগ যারা কাটিয়েছেন, তাদের সংখ্যা এতই নগন্য ছিল যে, কোটি কোটি সেই লোকদের সংখ্যার তুলনায় যারা 'সীরাতুল মুস্তাকীম' লঙ্ঘন করে ইসলাম থেকে বহু দূরে নিক্ষীপ্ত হয়েছিলো, তাদের তুলনায় এই সংখ্যা উল্লেখ করার মত কিছুই ছিল না।

এজন্য রসূল (সা.)-এর দূর-দৃষ্টির চোখ এই যুগকে প্রত্যক্ষ করেছে, আর এর নাম তিনি 'ফেজ্জে আউজ' (বক্রতার যুগ) রেখেছেন। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা করেছেন যে, এমন এক বৃহৎ সংখ্যা তিনি সৃষ্টি করবেন যাদেরকে সাহাবাদের অংশে মিলিয়ে দেয়া হবে। তবে যেহেতু খোদা তা'লার নিয়ম-রীতি এটাই যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বর্ধিত হারে বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। এজন্য আমাদের জামা'তের উন্নতিও উর্বর জমির অধিক ফলনশীল শস্যের ন্যায় আর সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অধিক ফলনশীল সেই বীজের মতই ভূমিতে বপন করা হয়ে থাকে। সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে যেখানে পৌঁছাতে চান, আজও তা অনেক দূর। তা অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ মর্যাদাপূর্ণ সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়, যা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনায় রয়েছে।

জামা'তের উন্নতি প্রসঙ্গে লোকেরা কথাবার্তা বলে। তবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বতো জামা'তের সেই অংশের ওপর বর্তায় যারা আনসারুল্লাহর বয়সে পদার্পন করেছে, পরিপক্কতার উঁচু স্তরে যারা উপনীত হয়েছে। যাদের চিন্তা-চেতনায়ও পরিপক্কতা এসেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, জামা'ত প্রতিষ্ঠায় খোদা তা'লার যে অভিপ্রায় রয়েছে যতক্ষণ তাদের মাঝে সেই সব বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি না হচ্ছে- তৌহিদের ঘোষণা প্রদানেও আর সেই অঙ্গিকার প্রতিপালনেও বিশেষ রঙ থাকতে হবে, যা দুনিয়া থেকে পৃথক করে আল্লাহ্ মুখী করে এক বিশেষ রঙের হবে। যিকরে ইলাহীতে এক বিশেষ তাৎপর্য দৃশ্যমান হবে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের মধ্যেও বিশেষ গভীরতাপূর্ণ রঙ দেখা দেবে।

অতএব এই হচ্ছে সেইসব অনুপম গুনাবলী, যা সৃষ্টি করার আবশ্যকতা আমাদের রয়েছে। কুরআন করীমের কল্যাণ সমূহ আর আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন-

অতএব, স্মরণ রাখা উচিত, পবিত্র কুরআন-ই পূর্ববর্তী কিতাব আর নবীদের ওপর এহসান করেছে। তাঁদের (আ.) যেসব শিক্ষামালা সমূহ কেচ্ছা-কাহিনী রূপে ছিল

সেগুলোকে জ্ঞানপূর্ণ করে দিয়েছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, কোন ব্যক্তি ঐসব কেচ্ছা-কাহিনীর দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ তারা পবিত্র কুরআন পাঠ না করছে। কেননা কুরআন শরীফের-ই এই মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সেই কিতাব "ইন্নাহু লে কাওলু ফাসলুন ওয়া মাহুওয়া বিল হাযলে", সে-ই হচ্ছে মিযান (পরিমাপকারী নিক্তি) মুহায়মিনুন নূর (ভারসাম্যকারী জ্যোতি) ও শিফা (আরোগ্য দান কারী) এবং রহমত (কৃপাকারী)। যেসব লোকেরা কুরআন শরীফ পাঠ করে আর একে কেচ্ছা-কাহিনী ভাবে, তারা কুরআন শরীফ পাঠ করে নাই বরং এর অবমাননা করেছে।

তিনি (আ.) বলেন- আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধীতায় কেন এত মারমুখী হয়ে উঠেছে? কেবল এজন্যই যে, কুরআন শরীফকে খোদা তা'লা যেভাবে বলেছেন, ঐ কিতাব সরাসরি জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞাপূর্ণ এক তত্ত্ব-দর্শন, যা আমাদের আলোকিত করতে চায় আমরা তা বিশ্বাস করি, আর তারা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করে কুরআন শরীফ এক অতি সাধারণ কেচ্ছা-কাহিনীর কিতাবের চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমরা তাদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারি না, খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন, কুরআন শরীফ সদা জীবিত ও জ্যোতির্ময় এক কিতাব। এ অবস্থায় তাদের বিরোধিতার পরোয়া কেন আমরা করবো! বরং আমি বার বার এই নির্দেশনা- এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি, ঐ লোকদের প্রতি, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, উপদেশ দিয়ে থাকি যে, খোদা তা'লাই এই জামা'তকে সত্য-দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঁড় করিয়েছেন, কেননা মন্দ প্রকৃতির লোকদের ব্যবহারিক জীবনে কোন উজ্জলতা ও জ্যোতি সৃষ্টি হতে পারে না। আমার কামনা হলো ব্যবহারিক জীবনে সত্যের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য জগতে প্রকাশিত হউক। যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এজন্য গভীর মনোযোগের সাথে বার বার কুরআন শরীফ পাঠ কর। তবে কেচ্ছা-কাহিনী ভেবে নয় বরং এক গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান পূর্ণ ভান্ডার মনে করে পাঠ কর।

আমাদের রিপোর্টগুলোতে নানাবিধ বিষয়াদীর উল্লেখ থাকে। কায়েদ সাহেবগণ উল্লেখ করে থাকেন যে, এই চেষ্টা করা হচ্ছে- সেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে- এত এত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা- এতজন নিয়মিত কুরআন শরীফ পাঠ করে থাকেন। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আমাদের কোন গোল নয় যতক্ষণ না আনসারদের মধ্য থেকে শতভাগ আনসার নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারীতে পরিনত না হচ্ছে। এটা আনসারুল্লাহ'র অনেক বড় দায়িত্ব। আর এটাই হচ্ছে সেই নমুনা, যা সন্তানদের তরবিয়তের ওপরও প্রভাব ফেলে। আর এটাকে সমুন্নত রাখতে পারলে আপনারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।

এক স্থানে এই জামা'ত খোদা তা'লার পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন-

তারা গভীর ষড়যন্ত্র এঁটেছে, খুনের মিথ্যা মামলায় ফাসানোর চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা বৃথা হতে পারে না। আমি তোমাদের সত্য-সত্যই বলছি এই মহান বিপ্লব খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, যদি মানুষের অভিসন্ধি ও মানবীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির কাজ এটা হতো তাহলে মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর মানুষের প্রচন্ড বিরোধিতা একে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলতো। মানুষের বিরোধিতাপূর্ণ দুরভিসন্ধির মোকাবেলায় এর বেড়ে ওঠা ও উন্নতি করা, এর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ারই সত্যতা সাব্যস্ত করে।

অতএব তোমরা, তোমাদের বিশ্বাসে দৃঢ়তায় যত শক্তিশালী হয়ে ওঠবে তোমাদের অন্তর্লোক তত আলোকজ্জল হবে।

আর বিশ্বাসে দৃঢ়তা তখনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন ধর্ম বুঝা ও তা প্রতিপালনে মনোনিবেশ করা হয়। অতএব শুরুতে আমি যেমন বলেছি, বিশ্বকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচয় করানোর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের অবিরাম ধারা আমরা তো প্রত্যক্ষ করেই চলছি, এতে আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা নেই, মানুষের অন্তর খুলে যাচ্ছে, মানুষ আহমদীয়াত অভিমুখী হয়ে ধর্মের পানে ফেরত আসছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের ইমান ও বিশ্বাস কীভাবে বৃদ্ধি করছেন, এ থেকে কয়েকটি ঘটনা আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। কিন্তু তার পূর্বে পুণরায় একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যা তিনি (আ.) জামা'তকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন-

তিনি (আ.)বলেন- কুরআন করীম পাঠ কর এবং খোদা তা'লা থেকে কখনই নিরাশ হয়ো না। মু'মিন কখনও খোদা থেকে হতাশ হয় না। এটি কাফেরদের অভ্যাস, খোদা তা'লা থেকে সে হতাশ হয়ে যায়। আমাদের খোদা তা'লা 'আলা কুল্লে শাই'ইন কাদির'। কুরআন শরীফের অনুবাদও পড় এবং নামায সমূহ, এর অর্থ বুঝে পড়, পরিপাটি করে পড়। নামাযে নিজ ভাষায় দোয়া কর। কুরআন শরীফকে একটি সাধারণ পুস্তক জ্ঞান করে পাঠ কর না বরং একে খোদা তা'লার কালাম মনে করে পড়। নামায সমূহকে ঠিক সেভাবেই পড় যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পড়তেন। নামাযের প্রকৃত মগয এবং রুহ্ হচ্ছে দোয়া।

অতএব এই সমস্ত কথা-ই, গুরুত্বের সাথে আমাদের মানসপটে রাখা উচিত, যেন আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গিকার আদায় করতে পারি এবং আমাদের এই সংগঠনের নামের সম্মান রক্ষা করতে পারি। যেভাবে আমি বলেছি, এই সিলসিলার উন্নতির প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তা পূর্ণ হবে এবং হচ্ছে। কোন মানুষের হাত উন্নতি ও অগ্রগতির এই পথে বাধা হতে পারে না। আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার এটি একটি অনুগ্রহ যে, যদি আমরা তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্য যৎসামান্য চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করি তাহলে তিনি আমাদের পুরস্কারে ভূষিত করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)ও বলেছেন যে, সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐশী জামা'তের উন্নতি হয় এবং হবে কেননা যেভাবে আমি বলেছি এটি কোন মানুষের বানানো সিলসিলাহ নয়। আর এই সব উন্নতি অবিরতই হচ্ছে আর তা কীভাবে হচ্ছে আমি এখন তার কয়েকটি ঘটনা বলছি-

কঙ্গোর জলসা সালানায় এক যুবক এলো । সে বলল, আমি গত পাঁচ বছর যাবৎ জামা'তের ওপর গবেষণা চালিয়েছিলাম। নিরবতার সাথে জামা'তের সকল অনুষ্ঠানাদিতে আমি অংশগ্রহণ করছিলাম আর কারো কাছেই কিছু প্রকাশ হতে দিইনি। তবে আমি জামা'তের কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম এবং পর্যলোচনা করতে থাকলাম। যখন আমার মনতুষ্টি হলো তখন, এই বছরই আমি বয়আত করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত'। এখন দেখুন, এই যুবকের হৃদয়ে এটি সঞ্চারিত করেছে কে? এটি আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কাজ করেছে। আর এমন ঘটনা দু'একটি নয় বরং অগণিত সংখ্যায়

এমন ঘটনা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা যা হয়ে গেল, এখানকার একজন ইংরেজ মহিলাও আমাকে লিখেছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করছিলাম কিন্তু জলসার পরিবেশ দেখে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হলো আর আমি বয়আত গ্রহণ করলাম।

তারপর, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থনের আরো একটি ঘটনা এরূপ যা বর্ণনা করেছেন আমাদের ঘানার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইউসুফ এডু সাইদ সাহেব। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে সাহায্য ও সমর্থন করছেন এবং মানুষের হৃদয় আহমদীয়াতের দিকে ঝুঁকাচ্ছেন এবং আহমদীয়াতের সত্যতাকে প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন, লাম্বুনা নামক স্থানে আমাদের একজন 'দাঈ ইল্লাল্লাহ্' আব্দুল্লাহ সাহেবকে তবলীগ করার সময় তাকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বলা হয়। এতে করে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, যেহেতু তিনি ইমাম মাহদীর বাণী পৌঁছানোর জন্য তবলীগ করছেন, এ কারনে তার দোয়া কবুল হবে। এই বিশ্বাস দূর-দূরান্তের এলাকার লোকদের মনেও সঞ্চারিত হল। সেই সমস্ত লোকেরা যারা আহমদী হয়েছে তারা যথাযথ ভাবেই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণীকে বুঝেছে। যাই হোক তিনি বলেন, তিনি দোয়া করলেন এবং দোয়া করালেন এবং বললেন এখন অবশ্যই বৃষ্টি হবে। খোদা তা'লার ফজলে সেই রাতেই, রাত ৯.০০ টার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হয় আর দোয়া কবুলিয়্যাতের এই নিদর্শন দেখে সেই এলাকার লোকদের এক বড় সংখ্যা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক পেয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)। এগুলো ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন তবলীগকারীর হৃদয়েও আর তার আমলও যদি তদনুযায়ী হয় তাহলে এর ফলাফলও সীমা ছাড়িয়ে মহানই হয়ে থাকে।

আবার ইউরোপে আগত এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন। আমাদের কসোভোর মোবাল্লেগ সামাদ সাহেব বলেন, একজন নিষ্ঠাবান যুবক কালতুন সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক হয়েছে। তার পুরো নাম মোস্তফা কালতুন। মোস্তফা সাহেব কয়েক মাস যাবৎ জেরে তবলীগ ছিলেন। কেমেষ্ট্রি ও বায়োলজিতে গ্রাজুয়েশন করছিলেন। একটি তবলীগি সভায় তিনি তার একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, এক রাতে তিনি প্রতিদিনের ন্যায় সকালে দ্রুত উঠার জন্য মোবাইল ফোনে এলার্ম দিয়ে শুয়ে গেছেন। সকালে যখন এলার্ম বেজে উঠল তখন তিনি এলার্ম বন্ধ করে উঠতে না উঠতেই হঠাৎ তার কানে এক আওয়াজ এলো যে, 'আহমদীয়াত থেকে দূরে যেওনা'। এটি শোনা মাত্রই তিনি উঠে বসলেন আর এই বাণী তার হৃদয়ে এতটা গভীর রেখাপাত করল যে, সেই সপ্তাহেই জুমুআর দিনে তিনি বয়আত ফরম পূরণ করে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এই সকল নমুনা যা আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়ে থাকেন এটি বুঝানোর জন্য যে, তিনি চাইলে প্রত্যেকের হৃদয়কে এভাবেই আকৃষ্ট করতে পারেন। অতএব, এটি তোমাদের কৃতিত্ব নয় যে, তোমরা তবলীগ করলেই আহমদীয়াতের প্রসার ঘটবে। যে ধর্মের প্রসার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে হয় তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রসারিত হয়। সুতরাং প্রথমত যেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত সেখানে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেও এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে অসাধারণ নিদর্শনাবলীও দেখান।

ইউসুফ উসমান গামবালাহ সাহেব যিনি তানজানিয়ার রিজিওনাল মোবাল্লেগ, তিনি সুঙ্গয়া থেকে লিখেছেন, সুঙ্গয়া রিজিওনে একটি জামা'ত রয়েছে আর সেখানকার তিনজন লোক খাকসারের জেরে তবলীগ ছিলেন এবং তাদের সাথে কোন না কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হতই। একদিন তারা মিশন হাউজে এলেন এবং কথা বার্তার এক পর্যায়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ছবি তারা দেখলেন এবং বললেন যে, এটা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ছবি হতেই পারেনা। অবশ্যই তিনি একজন সত্য নবী। তারা তখনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করলেন। বয়আত করার পর খোদা তা'লা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করলেন এমনকি তারা এখন আহমদীয়া জামা'তের বাণী ছড়াচ্ছেন এবং নিয়মিত তবলীগও করছেন।

বাহিরের আলেমদের অপচেষ্টা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, সর্বত্রই বিরোধিতা রয়েছে কিন্তু খোদা তা'লার তকদির স্বস্থানে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হচ্ছে। আমাদের নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগ আসগর আলি ভাট্টি সাহেব লিখেছেন, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের প্রারম্ভে আমরা সওয়াসামিয়া নামক একটি গ্রামে তবলীগ করি এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে মিশন হাউজে ডেকে এনে আরো দুই দিন তাদের কাছে জামা'তের বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরি। ইতোমধ্যে নাইজেরিয়ার সালানা জলসার সময় এসে যাওয়ায় তাদেরকে জলসাতেও আমন্ত্রণ জানাই। যখন সেই গ্রামের দলটি জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য তাদের ইমামের সাথে সেখানকার রাজধানী নিয়ামী পৌঁছায় তো সেই গ্রামেরই একটি পরিবার, যারা শিক্ষিত এবং চাকরির সুবাদে নিয়ামীতে-ই বসবাস করে এবং ওহাবী সম্প্রদায়ভূক্ত, তারা এদের এখানে আসার সংবাদ পেয়ে রাতেই এসে দাওয়াতের কথা বলে তাদেরকে নিজেদের বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে তারা আগে থেকেই তাদের বড় এক ইমামকে ডেকে এনেছিল। ঐ ইমাম সাহেব সর্বাত্মকভাবে সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় যে, 'আহমদীরা তো কাফের আর আপনারা কাদের কাছে কোথায় ফেঁসে যাচ্ছেন! অতিসত্ত্বর তওবাহ করুন এবং 'ওহাবী' হয়ে যান। আমরা আপনাদের মসজিদও বানিয়ে দেব'।

সওয়াসামিয়া গ্রামের ইমাম সাহেব মারাবি মিশন হাউজে ফিরে এসে সেই সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি ওহাবীদের ইমাম সাহেবকে উত্তরে বলেছি, আপনাদের এরূপ বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার পর জামা'তের সত্যতা সম্পর্কে পূর্বে যদি আমার কোন সন্দেহ থেকেও থাকে তবে তা আজ দূর হয়ে গেল। কেননা যখন থেকে এখানে এসেছি আপনাকে শুধুই গালি দিতে শুনছি আর আমি যতক্ষণ জলসাগাহে ছিলাম আহমদীদের কুরআন পাঠ শুনেছি। তাই আমি আপনাকে বলে রাখছি, গোটা দুনিয়ার মুসলমান যদি আহমদী হয়ে যায় কিংবা কমপক্ষে আহমদীদের মত হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ায় দ্রুতই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ কথা শোনা মাত্রই ওই মৌলবী ভোল পাল্টে বলা শুরু করে, ঠিক আছে! আহমদীয়াত যদি ছাড়তে না-ই চাও, তো ছেড়ো না, তবে গ্রামবাসীকে আমার এই কথাটি তো পৌঁছে দিও। তিনি বলেন, আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওহাবী মৌলভীর সেই কথা পৌঁছে দিই। গ্রামবাসীকে তার সেই কথা (আহমদীরা কাফের) পৌঁছে দিলে

তাদের সবারই জবাব একটাই ছিল, 'আমাদের শুধুই আহমদীয়াত চাই'। সবাই বিরোধীতাপূর্ণ সেই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। এখন এই পুরো গ্রামই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে এবং রীতিমত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এবারে এই দেশ থেকে অন্য দেশের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক।

আপনাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের একটি করে বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে ঘটনা নানা আঙ্গিকে আমি বর্ণনা করেছি। ইউরোপের আর আফ্রিকারও। আফ্রিকার একটি দেশের নাম গ্যামবিয়া। গ্যামবিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন আমাদের তবলীগি টিম নিয়ামিনা ইষ্ট জেলার মামতাফানা গ্রামে কয়েকবার তবলীগি সফরে গিয়েছে। এতে সেই গ্রামের ১৫০টি পরিবারের মধ্য থেকে ৯৬টি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

বয়আতগ্রহণকারীর সংখ্যা এখন প্রায় দেড় হাজার। এই গ্রাম এবং তার আশপাশের এলাকার সবাই তেজানী ফিরকার অনুসারী। গ্রামবাসীরা আহমদীয়াত গ্রহণ করায় বিরোধিরা তৎপর হয়ে উঠল। কতিপয় অ-আহমদী সরকারী কর্মকর্তা, গ্যাম্বিয়ার এক ইসলামী দলের নেতা এবং আরো কিছু আলেম, যাদেরকে সেনেগাল থেকে ডেকে আনা হয়, তারা সবাই উল্লিখিত গ্রামে ছোটাছুটি শুরু করে আর গ্রাম্য সরদার (গাঁও আলকালী) এবং গ্রামের কিছু গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ করে, যাতে আহমদীয়াতের তবলীগ বন্ধ করা যায় আর যারা আহমদী হয়েছে তাদেরকে ফেরত আনা যায়। এই দলটি উল্লেখিত দু'টি গ্রাম ছাড়াও আশেপাশের গ্রামগুলোতেও যায় এবং বিশেষ করে সেই নওমুবাঈনদের কাছে যারা সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এই অ-আহমদী প্রতিনিধি দল প্রথমে তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়। অতঃপর বলে, এটা জানানোর জন্য তারা এখানে এসেছে যে, 'আহমদীরা কাফের। তাই কেউ যেন তাদের পিছনে না চলে, তাদের অনুসরণ না করে। পাকিস্তানে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, এরা কোন প্রকার ইসলামী কর্মকাণ্ড সেদেশে করতে পারে না। পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারেও তাদের নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এখন তারা ইংল্যান্ডে আছে। আর আহমদীরা একেবারেই খ্রীষ্টানদের মত। এজন্য গ্রামবাসীর উচিৎ আহমদীয়াত গ্রহণ না করা'।

এর জবাবে নতুন বয়আতকারীরা বলে, আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা আহমদী মুসলমান। আর এ কারণে তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয় তবুও তারা আহমদীই থাকবে। এছাড়া তারা আরো বলে, আহমদী মুসলমানরা ইসলামের যে বাণী পৌঁছাচ্ছে আসলে এটাই প্রকৃত ইসলামের বাণী। যুগের ইমামকে সনাক্ত করতে পারাই প্রকৃত নেকী আর এরাই হল সৌভাগ্য মন্ডিত। আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি যে, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত উল্লেখিত এই দুই গ্রামে দুই হাজারেরও (২০০০) বেশী নওমুবাঈন রয়েছে। যারা সবাই আহমদী জামা'তভুক্ত।

সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে থাকা আলেমরা বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে। এবং এরা 'আহমদীয়াত' এর বিরোধিতায় সদা তৎপর। তবে এসব লোক তাদের অপবিত্র কার্যকলাপে কখনোও সফল হবে না।

সুতরাং এরা সেই সকল নওমুবাঈন যাদের আহমদীয়াত গ্রহণ করা বেশী দিন হয় নি তবুও আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিশ্বাসে এত বেশী দৃঢ়তা দান করেছেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এমন নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, মানুষ তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সমস্ত দুনিয়াকে ধর্মের পানে ফেরাতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে তোমরাও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন কর, নিজেদের আমল সমূহে পরিবর্তন আন, তবলীগের সাথে সাথে নিজেদের কর্মকে এমন ভাবে সাজাও যেমন সুন্দর ও আদর্শ নমুনা মহানবী (সা.) আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাতে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় উত্তম ফলোদয় হয়। আর তোমরা খোদা তা'লার নিকট পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হও।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অবশ্যই স্মরণ রেখো! এই সিলসিলাহ আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে এই যুগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি এই সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে পৃথিবীতে ত্রিত্ববাদ বিস্তৃতি লাভ করত। এবং এক অদ্বিতীয় খোদার একত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতো না। অথবা এমন মুসলমান থাকত যারা তাদের অপবিত্র ও মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে ত্রিত্ববাদেরই সাহায্যকারী হতো এবং তাদের বানানো উপাস্য ও খোদার আসনে আসীন 'মসীহ'এর জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দিত। এই সিলসিলাহ (আহমদীয়াত) এখন কোন দুরভিসন্ধি বা শক্তি দ্বারা বিনষ্ট হবে না। এটা অবশ্যই বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিস্তৃত হবে এবং খোদা তা'লার বড় বড় কল্যাণ ও আশিসসমূহ এর ওপর বর্ষিত হবে। যখন আমরা খোদা তা'লার কল্যাণ মন্ডিত সজীব প্রতিশ্রুতি প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি আর তিনি আমাদের সর্বদা আশ্বস্ত করেন যে, 'আমি তোমাদের সাথে আছি এবং তোমাদের আহ্বান পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব', তাহলে কারো তুচ্ছ মনে করায় এবং গালমন্দে আমরা অস্থির হব কেন?

আর এটা তো অমোঘ ঐশী সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিজয় লাভ করবে। এটা কখনই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজের অবতীর্ণ শেষ-ধর্ম, সর্বমাত্রায় যা পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি তিনি যে ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন একে বান্ধবহীন ও বিনা সাহায্যে তিনি ছেড়ে দেবেন অথবা এমন লোকদের হাতে ছেড়ে দেবেন যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিয়ে এর সবটাকেই বক্র বানিয়ে দেবে?-এর মধ্যে বিদআত- নব্যতা সৃষ্টি এবং সর্ব প্রকার মন্দ ছেয়ে যাবে! আল্লাহ্ তা'লা এমনই সেই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের মাধ্যমে বিজয়ের উপকরন যুগিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব এটি, বিশেষ করে আনসারুল্লাহ্, নিজেদের অবস্থাকে ইসলামী শিক্ষার আদলে গড়ে তুলুন মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের অনুসরণে সচেষ্ট হয়ে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করুন এবং কুরআন করীমের অনিন্দ্য সুন্দর নির্দেশনাগুলোর ওপর আমল করে এর অনুশাসন নিজ হৃদয়ে নিজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করুন। এই দৃষ্টান্ত নিজের পরিবার এবং বংশধরদের সামনে উপস্থাপন করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের অঙ্গিকারগুলো মান্য ও প্রতিপালন করে প্রকৃত আনসার হোন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

ভাষান্তর ঃ **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ**

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে ইসলাম সম্মত নয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক শর্ত হলো বিবাহ। এটা কারো অজানা নেই যে, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে সহজীবন যাপনের শরীয়ত মোতাবেক যে বন্ধন স্থাপিত হয় তারই নাম বিবাহ। বিয়ে বন্ধন কেবল মাত্র গতানুগতিক বা কোন সামাজিক প্রথা নয়, এটা মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের মানবীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌পাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। সুতরাং এটা যে কেবল মাত্র পার্থিব জীবনের গুরুত্বই বহণ করে এমন নয় বরং পারলৌকিক জীবন অধ্যায়েও অনেক গুরুত্ব বহণ করে। আমরা আহমদী, আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত নিতে পেরেছি। যেহেতু আমরা যুগের ইমামের হাতে দীক্ষা নিয়েছি তাই আমাদেরকে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে আর না হয় মুখে আহমদীয়াতের দাবি করার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা হচ্ছে, আমরা যেন কোনভাবেই অ-আহমদীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হই।

এ-নশ্বর জড় জগতের সব কিছুই সৃষ্টির দিক থেকে মূলত নর এবং নারী-এ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। মানব জীবনের বংশ রক্ষার ধারা বিবাহের বন্ধনের মাঝেই বাঁধা। সৃষ্টির সব প্রাণীর মাঝেই বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আল্লাহ্‌পাক করেছেন। কিন্তু মানব জাতির জন্য বংশ রক্ষার প্রক্রিয়া অপরাপর প্রাণীর মত অবাধ নয়। খানিকটা নিয়ন্ত্রাধীন। মানুষের জীবন ধারাই ভিন্ন ধরণের, ভিন্ন খাতে প্রবহমান। কারণ এখানে রয়েছে তাদের জাতীয় সভ্যতার প্রশ্ন, ইয্‌যত-আবরুর প্রশ্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রেম-প্রীতির প্রশ্ন, বংশ মর্যাদার প্রশ্ন, এছাড়াও রয়েছে আধ্যাত্মিকতা লাভের প্রশ্ন, যা সৃষ্টির অন্য কারোও মধ্যে নেই। একমাত্র বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত পবিত্র পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাই এ জাতীয় যাবতীয় প্রশ্নাবলীর সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম। তাই বলা যায় বৈবাহিক জীবন ব্যাবস্থা যে শুধু কামনা-বাসনা দমন করে তা নয়, জাতীয় সত্তার পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার সাথে সাথে জাতীয় গুনাবলীগুলোকেও উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলে দুর্বার গতিতে। বৈবাহিক যোগসূত্র ছাড়া নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় মানব নামে অমানুষের জন্ম হতে পারে, প্রকৃত মানবের জন্ম হতে পারে না, এটা শত ভাগ নিশ্চিত সত্য।

বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারীকে করা হয়েছে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। কারণ পুরুষ নিজ জীবনে আপন ভূবনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলেই একজন সহযোগিনীর প্রতি একান্ত মুখাপেক্ষী, নারীর অবর্তমানে পুরুষের হৃদয় শূন্য কোঠা সমতুল্য। একজন সুস্থ্য-সবল, সতী সাধ্বী ধর্মপরায়ণা নারী ও ধর্মপরায়ণ পুরুষ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই কেবল তার এ শূন্য কোঠা পূর্ণ হতে পারে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও পরিপোষক। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর তার নিদর্শনাবলীর মাঝে এও হলো একটি নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি লাভের জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তা ভাবনা করে" (সূরা রুম: ২২)। নারী পুরুষের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের নির্ভরযোগ্য এক আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। কোন পুরুষ কেবলমাত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ পবিত্রময় আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করতে পারে। তাই বিবাহকে বলা হয় শান্তির প্রতীক। এটি তখনই শান্তির প্রতীক হবে যখন দু'টি আত্মা প্রশান্তিপ্রাপ্ত আত্মা হবে। একজন আহমদী মেয়েকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি দিতে পারে একজন আহমদী ছেলে। আমাদের কাছে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যারা অ-আহমদী ছেলেদের বিয়ে করে নিজেতো ধ্বংস হয়েছেই সেই সাথে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক সময় মনে হয় অ-আহমদী ছেলেটি দেখতে শুনতে, পড়ালেখায়, ধন-সম্পত্তি সব দিক থেকে অনেক ভালো তাহলে তাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়? কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা যায় এ সম্পর্কের মাঝে ছেদ দেখা দেয়। আর এ ধরণের সম্পর্ক কিভাবে টিকতে পারে, যে সম্পর্ক করা হচ্ছে অবৈধভাবে। যার অনুমতি আহমদীয়া জামা'তে নেই। আর একজন আহমদী মেয়ে কোনভাবেই অ-আহমদীর ঘরে গিয়ে সুখ পাবে এটা চিন্তাও করা যায় না। তাই আমরা আহমদী, আমাদেরকে বিয়ে করতে হবে আহমদীকেই। এটাই সব

একজন আহমদী মেয়ে অ-আহমদীর ঘরে গিয়ে সুখ পাবে এটা কোনভাবে চিন্তাও করা যায় না। তাই আমরা আহমদী, আমাদেরকে বিয়ে করতে হবে আহমদীকেই। এটাই সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অভিভাবক যারা আছেন আপনারা কি কেউ এটা সহ্য করতে পারবেন, যখন আপনার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আপনার পিতা-মাতাকে জামা'ত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে? এটা সহ্য করার মত নয়। তাই আগে থেকেই মাথায় এ বিষয়টি ঢুকিয়ে রাখুন কোনভাবেই অ-আহমদীর চিন্তা যেন মাথায় না আসে। আর না হয় ইহকাল পরকাল দু'টিই হারাবেন।

বিয়ে সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন: সাধারণত রমণীদের চারটি গুনের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। যথাঃ (ক) তার ধন-সম্পদ, (খ) তার বংশমর্যাদা, (গ) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণ নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধুলায় ধূসরিত হবে। (আবু দাউদ)

ধার্মিকতা বিহীন নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য সেই পরিত্যাক্ত বিল্ডিং এর ন্যায় যার বাহিরে চাকচিক্য মানুষকে মুগ্ধ করলেও ভিতরে রয়েছে বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারে বসবাস। ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ নারীর বাহ্যিক অবস্থা যেমনই হউক না কেন ভিতরে তার মনি-মুক্তা আর হিরা-পান্নায় পরিপূর্ণ। যা মানুষের ইহকাল ও পরকালের অফুরন্ত পাথেয়। তাই আমাদের আহমদী মেয়েদেরকে ধর্মপরায়ণা হতে হবে আর ধর্মপরায়ণা হলেই আমরা উত্তম জীবন সঙ্গী লাভের আশা করতে পারি।

শুধুমাত্র নারীর ধার্মিকতার দ্বারাই দাম্পত্য জীবন সুখী হবে এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। কেননা বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনের সর্বাঙ্গিন সাফল্যের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভুমিকাই সমান। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা দেখ কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছে, সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে, এরপর তারা উভয়ে বাকি অর্ধেকের জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করুক"। (বায়হাকি)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুশরিক পুরুষ এবং মুশরিক নারীদের সাথে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ একজন মুশরিক স্বামী তার স্ত্রীর ওপরতো বটেই ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উপরেও তার শিক্ষার কুপ্রভাব বিস্তার করবে। একই ভাবে একজন মুশরিক স্ত্রী নিশ্চয় সন্তান-সন্ততিদের নিজের পৌত্তলিকতার শিক্ষায় লালন পালন করে বংশটাকেই সকল পারলৌকিক মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করবে। এছাড়া মুসলিম পুরুষের স্ত্রী যদি অমুসলিম হয় অথবা মুসলিম নারীর স্বামী যদি অমুসলিম হয় তবে তাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনবোধ ইত্যাদি পরস্পর বিপরিত মুখি হবে। একইভাবে আহমদী মেয়ের স্বামী যদি অ-আহমদী হয় বা আহমদী ছেলের স্ত্রী যদি অ-আহমদী হয় তাহলেও দেখা দিবে বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি। এছাড়া এর ফলে ঐক্য, সমঝোতা ও মনের মিল ব্যহত হবে ও পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করে দিবে। একজন দরিদ্র নারী যদি মুসলমান এবং ধার্মিক হয় তবে সে একজন ধনাট্য সুন্দরী অমুসলিম নারী অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম। অনুরূপ ভাবে একজন হতদরিদ্র মুসলিম তথা ধার্মিক পুরুষও অমুসলিম ধনাঠ্য পুরুষ অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম। ঠিক তেমনি একজন আহমদী নারী বা পুরুষ যদি পড়া-লেখায় বা ধন-সম্পদের দিক থেকে কম হয় তারপরেও সে অ-আহমদীর তুলনায় অনেক গুনে বেশি সন্মানিত এবং উত্তম কারণ সে আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ মেনে যুগ মসীহকে মেনেছে। তার হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের ভয় থাকে। একজন সত্যিকার আহমদীর মাধ্যমে অপরের ক্ষতি হবে এটা কেউ ভাবতেও পারে না।

ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর আদরের দুলালি, নয়নের মনি, কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুয যহুরা (রা.)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে। হযরত অবু বকর ছিদ্দিক (রা) তাঁর কন্যা হযরত রাবেয়া (রা.)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে। যাদের উভয়ের নুন আনতে পানতা ফুরাত। তারপরও এদের কাছে এজন্যই বিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরা বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে দরিদ্র হলেও আধ্যাত্মিকভাবে এরা ছিলেন পাহাড় সমুতুল্য। তাই আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব অনেক তাই মানব সৃষ্টির আদিতে বৈবাহিক যোগসুত্রের গোড়াপত্তন করা হয়। কারণ এই সহ জীবন যাপনের পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। সকল দিক বিবেচনা করেই পবিত্র কুরআনে মানব সম্প্রদায়কে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যুগল প্রেমিক আর প্রেমিকার জন্য তুমি বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছুই খুঁজে পাবে না' (ইবনে মাজা)।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন ধরণের সম্পর্ককে হারাম আখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এটি মানব স্বভাব বিরুদ্ধকাজ। এতে কোন পুণ্য নেই। অথচ আজ রাস্তা-ঘাটে বের হলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখতে হয়। বাহিরের মেয়েদের চেয়ে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখতে হবে। অন্যরা কি করে তা না দেখে আমাকে অন্যের জন্য আদর্শ হতে হবে। আমাদের মাঝে কিছু এমনও আছেন যারা পড়া-লেখার নামে অ-আহমদী ছেলেদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যান। এটা মোটেও ঠিক নয়। সহশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় খলীফা নিষেধ করেছেন আর একান্তই যদি করতে হয় তাহলে অবশ্যই হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিতে

হবে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন মেয়ে বাহিরে যেতে চাইলে তারও অনুমতি নিতে হবে। যেমন আহমদী মেয়েদের দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে হুযূর আনওয়ার (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা হলো-এ বিষয়ে হুযূর (আই.)-বলেন, "আমি সাধারণত কেবল ঐ সকল মেয়েদেরকে দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশুনার অনুমতি দেই যারা পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করতে চায়। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কোন অভিভাবক বা নিগরান ছাড়া মেয়েদের বিদেশ পড়তে পাঠানোর অনুমতি নেই।" [জেনারেল সেক্রেটারী, সার্কুলার নং ২৮/১৫৪২ (২০০)]

ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর অবাধ মেলামেশার কারণে কতিপয় যুবক-যুবতীদের হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসার বীজ বোপিত ও অঙ্কুরিত হয়ে তা এক মহাপ্রেম বৃক্ষে পরিনত হতেও দেখা যায়। বর্তমান ফেইস বুক নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। অথচ আহমদী ছেলে-মেয়েদেরকে ফেইসবুক ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণভাবে হুযূর (আই.) নিষেধ করেছেন। এবং এসব অবৈধ যোগাযোগের মাধ্যমে দেখা যায় এ প্রেম বৃক্ষের ফল সামাল দিতে কাজী অফিস, কোর্টে গিয়ে সমাজের অগোচরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়ে যায়। এ ধরনের বিবাহ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এবং আহমদীয়া জামা'তে গ্রহণ যোগ্য নয়। এ ধরণের কাজকে ইসলামে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু যুবাইর মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এমন একটি বিবাহের ঘটনা উপস্থিত করা হলো, "যে বিবাহে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যতীত আর কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি বললেন, এটি গোপন বিবাহ। আমি ইহাকে জায়েয বলি না। যদি আমার এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে প্রকাশ করতাম তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, ২৬ নং হাদীস)

হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল হবে। আর তিনি (সা.) এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে সম্পূর্ণ মোহরানা প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের আমীর তার অভিভাবক হবেন, কেননা যার কোন অভিভাবক নেই দেশের আমীরই তার অভিভাবক"। (আবু দাউদ ৩য় খন্ড) বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ের, এখন ভেবে দেখুন, আমি আহমদী মেয়ে, আমি একজন অ-আহমদীকে বিয়ে করার জন্য চিন্তা করে থাকি, তাহলে আমার ক্ষেত্রে কি হবে?

এছাড়া কিছু এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, আহমদী মেয়ে বা ছেলে গয়ের আহমদী মৌলভী বা কোর্টে গিয়ে বিয়ে পড়িয়েছে। যখন একজন আহমদী মেয়ে অ-আহমদী ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করে তখনতো তার বিয়ে অ-আহমদী মৌলভী বা কোর্টেই হয়ে থাকে, কারণ কোন আহমদী মওলানা এমন বিয়ে পড়াতে পারেন না। তাই যখনই অ-আহমদী দ্বারা বিয়ে পড়ানো হয় সেই সময় থেকেই সে আর আহমদী থাকে না। যেমন গয়ের আহমদী মৌলভী বা কোর্টে বিয়ে পড়ানোর বিষয়ে হুযূর আনওয়ার (আই.) যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাহলো-গত ১৬ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখ বাংলাডেস্ক লন্ডন থেকে মোকাররম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হয়েছে যে, "জনৈক আহমদী গয়ের আহমদী মৌলভী দ্বারা বিয়ে পড়ানোর প্রেক্ষিতে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেছেন, ভবিষ্যতে যদি কেউ গয়ের আহমদী মৌলভী দ্বারা বা কোর্টে বিয়ে পড়ায় তাহলে তাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নামা নিতে হবে যে, আমি লজ্জিত, আমি গয়ের আহমদী ইমাম দ্বারা নিকাহ পড়িয়ে কার্যত মুরতাদ হয়ে গেছি আর অনুশোচনা করছি। আমি পুনরায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখেল হতে চাই"। [জেনারেল সেক্রেটারী, সার্কুলার নং ২৮/২০০৩ (২২০)]

যারা জামা'তের বাহিরে বিয়ে করে বা বিয়ে দেয় তাদের সম্পর্কে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন "যারা জামা'তের বাহিরে বিয়ে করে বা বিয়ে দেয় তাদের বেত্রাঘাত করার মতো কোন সুযোগ আমাদের নেই। তরবিয়তের ওপর জোর দিতে হবে আর জামা'তের সদস্যদেরকে বার বার বুঝাতে হবে। এ সম্পর্কে খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ ও লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনকে নিজ নিজ কর্ম পরিধিতে কমিটি গঠন করে রিশতানাতা সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলুন। সর্বত্র রিশতানাতা ফোরামের ব্যবস্থা করুন, আলোচনা করুন, এ সংক্রান্ত সমস্যার চুল চেরা বিশ্লেষণ করুন, বিয়ের বয়সে উপনীত ছেলে মেয়ের তালিকা প্রনয়ণ এবং জামা'তের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো, ইত্যাদী ইত্যাদী। প্রত্যেক অঞ্চলে অংগ সংগঠনগুলোর উচিত হবে নিজ নিজ গণ্ডিতে ছেলে-মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাকে বুঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া। পিতামাতাকে নিজ নিজ সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলুন। ছেলে-মেয়েদের বুঝান যে, এদিক সেদিক না দেখে আহমদী জীবন সাথী সন্ধান করুন। যদি কারো সাথে সমতার মিল না থাকে অর্থাৎ ছেলে যদি বেশি শিক্ষিত হয় আর মেয়ে কম শিক্ষিত বা বিপরীত হয় তাহলে কুরবানীর মন মানসিকতা থাকা উচিত।" (পত্র নং বিডিএল-২৭, ১৩ জুলাই, ২০১০)

আমরা যদি যুগ খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তম তরবিয়ত দিয়ে মানুষ করি তাহলে কখনই আমাদের সন্তানরা বাহিরে বিয়ে করতে পারে না। আমাদের সন্তানদের বাহিরে বিয়ে করার পিছনে আমাদের পিতা-মাতারা অনেকাংশেই দায়ী। আমরা যদি ছোট থেকেই তাদেরকে এর ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে অবগত করাতে থাকতাম তাহলে হয়তো তারা এমনটি করতো না। এছাড়া দেখা যায় মেয়ে বা ছেলে বিবাহের বয়সে উপনিত হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের বিষয়ে কোন চিন্তা করছি না বা আরো ভালো পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করতে থাকি। এসব না দেখে আমাদেরকে একজন সত্যিকারের আহমদীর সন্ধান করা উচিৎ।

masumon83@yahoo.com

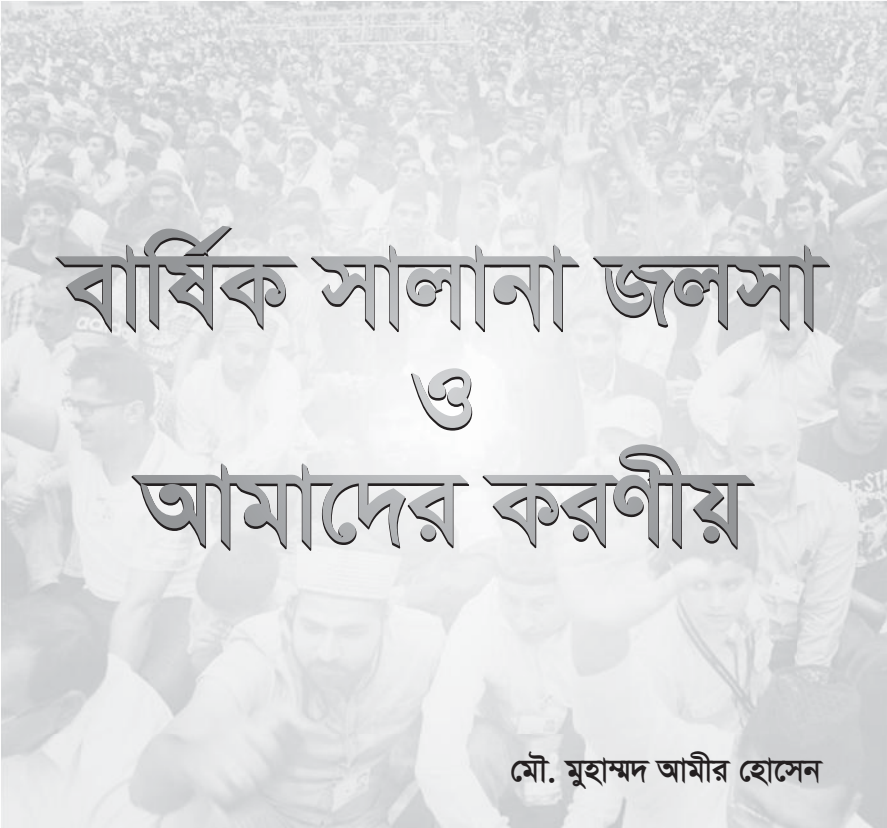

বার্ষিক সালানা জলসা ও আমাদের করণীয়

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

প্রথমে আমি মহান আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই বলে যে, তিনি আমাদেরকে এমন একটি যুগে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যে যুগে মসীহ্‌র আগমন হওয়ার কথা। আমরা আহমদীরা বড়ই সৌভাগ্যবান, প্রতি বছর আমরা কোন না কোন জলসায় যোগদান করে থাকি। আমাদের নিকট জলসা খুবই পরিচিত শব্দ। পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে পড়েছি আগেকার রাজা বাদশাহগণ জলসা করতেন। তাদের রাজ মহলে একটি হল রুম বা কামড়া থাকতো যেখানে তারা রাজ্যের রাজা ও সভাসদগণ মিলে সেই জলসা উপভোগ করতো। তা ছিল সুন্দরী নর্তকী মেয়েদের স্বল্প ভূষণে বিভিন্ন অলংকার পড়িয়ে নাচাতো দর্শকরা বাহ্ বাহ্ করতো এমনকি এক পর্যায়ে তারা নর্তকীদের উদ্দেশ্যে মোহর ছিটাতো খুশি হয়ে। সেই জলসা ছিল খুবই ঘৃণ্য প্রকৃতির। সেই যুগে রাজার ভয়ে সমাজের লোকেরা বা রাজ্যের অধিবাসীরা মুখ খুলে কিছু প্রকাশ করতে পারতো না। রাজা বাদশাহদের রঙ্গমঞ্চের জলসার সাথে আমাদের জলসা অর্থাৎ ইসলামী জলসার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের বাৎসরিক যে জলসা হয় তা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে। যা থেকে উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতামন্ডলী তাক্‌ওয়ার মানকে উচ্চ করে আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছার চেষ্টা করে থাকে। পরস্পর নিজেদের মাঝে ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে। জলসার কয়েকটি দিনে নিজেকে আল্লাহ্‌র রাহে বিলীন করে দিয়ে গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে থাকে। জলসার দিনগুলোতে আহমদীরা অনেক ব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অতিবাহিত করে থাকে। বিশেষ করে নেকীর প্রতিযোগিতায় একে অপরের আগে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। মু'মিনদের জামা'তে এমনই হওয়া উচিত। এর মাঝেও অনেকের মধ্যে দুর্বলতাও দেখা যায়। যা কখনো কাম্য নয় বা আমরা কামনা করি না।

সালানা জলসার প্রবর্তন করেন আহমদীয়া জামা'তের মাঝে এই জামা'তেরই পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। সর্ব প্রথম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানে। উক্ত জলসাতে মাত্র ৭৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কাকতালীয় ভাবে এ বৎসর অর্থাৎ ২০১৪ইং কাদিয়ানে ১২৩তম যে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও ছিল ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর। কাদিয়ানে শুরু হওয়া জলসা মাত্র ৭৫ জনের মাধ্যমে যার ধারাবাহিকতা আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এতে হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বে যে সালানা জলসা হয় তার কিছুটা প্রকার ভেদ রয়েছে। লন্ডনে যে জলসা হয় খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর উপস্থিতিতে তা হয় আন্তর্জাতিক জলসা। দেশে দেশে যে জলসা অনুষ্ঠিত হয় তা দেশীয় বার্ষিক জলসা। এছাড়া স্থানীয় জলসা, আঞ্চলিক জলসা এমনকি সীরাতুন নবী (সা.) জলসাও বিভিন্ন স্থানে পালন করা হয়ে থাকে। যারা জলসার গুরুত্ব বুঝেছেন তারা প্রতি বছর এই দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এমনও শোনা যায় অনেকে প্রতি মাসে কিছু না কিছু অর্থ জমা করে রাখেন জলসায় যোগদানের জন্য। এটি একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও চিন্তা চেতনা। প্রত্যেকের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া উচিত। মু'মিন সর্বদা যা ভালো ও কল্যাণদায়ক তা গ্রহণ করে থাকে।

সূধী পাঠক! আমরা যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্তর্ভুক্ত আমাদের সব সময় নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগতশীল হয়ে চলা উচিত। জাগতিক ধ্যান-ধারণা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি যেন ফাঁটল সৃষ্টি না করে। জগতে অনেক মানুষ নিজেদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য বিপদ গামীতায় পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ প্রবন্ধে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করা

সূরা আল বাকারার ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা

তাক্‌ওয়া (আল্লাহ্‌র ভয়-ভক্তি ভালোবাসা) অবলম্বন করতে পার। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মাঝে বড়ই উপকৃত হলো মানব সম্প্রদায়। একমাত্র মানুষই সৃষ্টির উদ্দেশ্যবালীর চরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আর তিনি হলেন আমাদের প্রিয় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তিনি (সা.) যেভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন তা অন্য কারো পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। তবে আমরা তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে কিছুটা হলেও ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। জলসার দিনগুলোতে সমবেতভাবে বড় জামা'ত আকারে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সুযোগ গড়ে ওঠে। বিশেষ করে ওয়াক্তি নামায ছাড়াও বাজামাত তাহাজ্জুদ (নফল ইবাদত) নামায হয়ে থাকে। অত্যন্ত আবেগঘণ পরিবেশে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার এক অনুপম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় আমার মনে অনেক কষ্ট হয়। এখনো অনেকে আমরা সেদিনগুলোতে নামাযের জন্য উঠি না। এমন কি ফজর নামাযও অনেকে বাজামাত পড়তে অবহেলা দেখায়। এটা একেবারেই বেমানান। জলসাতে আসবো আর বাজামাত নামাযে অংশ নিবো না এটা কি করে হয়।

আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগী হওয়া

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই ভালোবাসেন যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, ক্রোধ দমন করে ও অপরকে মার্জনা করে। জলসার এটিও একটা উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আহমদীর একথা স্মরণ করা উচিত যে, আমি জলসাতে অংশগ্রহণ করবো আর এতে আমার কোন অবদান থাকবে না তা কি করে হয়। তাই জলসার পূর্বেই সালানা জলসার ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করা জরুরী। সেই সাথে কারো সাথে মনোমালিন্য হলে বা থাকলে তা মিটিয়ে ফেলে ক্রোধকে দমন করা ও অপরের প্রতি মার্জনার দৃষ্টিতে ব্যবহার করা। কেননা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশনা রয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৩৫নং আয়াতে রয়েছে যে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন। অতি স্পষ্টভাবে উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে খরচের বিষয়টি খোলসা করা হয়েছে। মানুষ সচ্ছল বা অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে কে কত বেশী অর্থ দান করলো বা খরচ করলো সেটি মুখ্য নয়। বলা হয়েছে তুমি সর্বদা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতে থাকো। জলসায় অধিক লোক সমাগত হওয়াতে অনেকের ব্যবহার অথবা কথাবার্তায় রাগ সৃষ্টি হতে পারে। সেই রাগ বা ক্রোধকে দমন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ক্ষমার বিষয়টির প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। উল্লেখিত আয়াতে 'আফউন' এক ধরনের ক্ষমা। এক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা তিরস্কৃত, আহত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন সেই অপরাধীর অপরাধকে মন থেকে মুছে ফেলে কিংবা স্বেচ্ছায় ভুলে যায় তখন বলা যেতে পারে, নিগৃহিত ব্যক্তি 'আফউন' অবলম্বন করেছে। যখন শব্দটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করা হয় তখন এর তাৎপর্য দাঁড়ায়, পাপীর পাপকে এমন ভাবে মার্জনা করা যে পাপের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। এ আয়াতে 'আফউন' এর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম অবস্থা হলো ঃ যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হলো তিনি নিজের রাগকে সংযত করলেন। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তিনি অপরাধীকে নিজ হতেই ক্ষমা করে দিলেন। তৃতীয় অবস্থা হলো, তিনি তাকে কেবল ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং অপরাধীর প্রতি দয়া দেখালেন এবং তার কিছু উপকার সাধন করলেন।

প্রিয় পাঠক! এ তিনটি স্তরের 'আফউন' এর দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাতি হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর জীবনের একটি ঘটনায় দেখতে পাই। তাঁর এক গোলাম অপরাধ করলে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। গোলাম এ আয়াতাংশ আবৃত্তি করলো 'যারা ক্রোধ দমন করে'। এটা শোনামাত্র হাসান (রা.) থেমে গেলেন। গোলাম তখন আবৃত্তি করলো, 'মার্জনা কর'। সাথে সাথে হাসান (রা.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অত:পর গোলাম আয়াতের শেষাংশটি পাঠ করলেন, 'আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।' আল্লাহ্‌র এ কথা শোনামাত্র তিনি গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন (বয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬)। এ ঘটনা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সকলের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠুক এই কামনা করি।

আর একটি বিষয় এখানে তুলে ধরতে চাই, তাহলো জলসায় আগত লোকজনের মাঝে কেউ যদি কোন অন্যায় করেই ফেলে তাহলে আমরা কি করবো বা কি করা উচিত। নিজেরা এর প্রতিকার করবো? নাকি কুরআন সম্মত সমাধান করবো? অনেক লোক একত্র হলে সমস্যা হতেই পারে। সুতরাং তাই বলে আমরা হট্টোগোল করবো! না তা করবো না বরং বিষয়টিকে ঠান্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবো এ সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার উদাহরণ দেখতে পাই। সূরা আশ্ শূরার ৪১নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তবে (তারা মনে রাখে) অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকুই যতটুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

এই আয়াতে ইসলামের দন্ড-বিধির ভিত্তি রয়েছে। ইসলামের অনুশাসন হলো, একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো, ঐ অপরাধীর নৈতিক সংশোধন। যদি ক্ষমা দ্বারা তার নৈতিক পরিবর্তন আনা সহজ মনে হয় তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি শাস্তি দানের মাধ্যমে তার সংশোধন হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়াই কর্তব্য। তবে শাস্তি কোন মতেই অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সর্বাবস্থায় এইরূপ উপদেশ দেয় না যে, "এক গালে চর দিলে অপর গাল পাতিয়া দাও" কিংবা চোখের বদলে চোখ তুলিয়া ফেল।" বরং ইসলাম বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে, মধ্য পথ অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়।

কুরআন পাঠ ও দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া

জলসার নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আমরা নামায আদায়ের মাধ্যমে ও জলসার অধিবেশনে তেলাওয়াত করার মাধ্যমে কুরআন পড়া শুনে থাকি। এছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত তেলাওয়াতের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সেই সাথে অবসর সময়ে বেশী বেশী মসনূন দোয়া পড়া উচিত, কোন কিছুকেই যেন আমরা খেলাচ্ছলে পরিত্যাগ না করি। পবিত্র কুরআন মজিদ হতে জানা যায়, মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের প্রতি আমরা এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের জন্য (প্রয়োজনীয়) উপদেশ বাণী রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা আল্ আম্বিয়া-১১)। উক্ত সূরার ১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আর আমরা আকাশকেও পৃথিবীকে এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হলো মানব সম্প্রদায়। তারা কখনো পৃথিবীতে খেলা-তামাশা করতে পারে না। তাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। কেননা মানবজাতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজেকে প্রকাশিত ও বিকশিত করেছেন। সেই মানুষ দ্বারা যদি কোন অন্যায় হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাবেন।

এজন্যই আমাদেরকে কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এ কুরআনে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ বাণী প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত দু'টির প্রথমটি মর্ম কেবল এটাই নয় যে, কুরআন অস্বীকারকারীরা দুর্দশায় পড়বে এবং এর অনুসারীরা অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করবে এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব গৌরবের নিম্নতম ধাপ থেকে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হবে। পক্ষান্তরে এই বাস্তব ঘটনা এক নির্ভুল প্রমাণও প্রতিষ্ঠি করবে যে, কুরআন বানোয়াট নয়, কবিতার ছন্দ কিংবা অলীক স্বপ্নের কাহিনী নয়। পরন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার সত্য কালাম। দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম হলো, এই বিশ্বজগৎ আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়াচ্ছলে সৃজিত হয় নি। এর সৃজন সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনাও বিচার-বিবেচনা এর সৃষ্টির অন্তরালে মহাজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটন করে। সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু এই মানবকেও অবশ্যই এক মহান ও পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধিত্বকারী। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দর্পণ-স্বরূপ, স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া মানবের নিজ সত্তায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কেননা তিনি আমাদেরকে এমন একটি ধর্মীয় জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যা সারা বিশ্বে ২০৬টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, একমাত্র নেতার (খলীফা) অধীনে আমরা একই পরিবারের মত জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করছি। এ অবস্থা অন্য কোন ফেরকার মাঝে পরিলক্ষিত দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা যত কৃতজ্ঞকারী হবো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ততো বেশী কল্যাণ দান করবেন। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ পেশ করছি। সূরা ইব্রাহীমের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আর (স্মরণ কর) তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছিলেন। 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো দান করবো। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আমার আযাব বড়ই কঠোর।

প্রশ্ন হলো– আমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না? আল্লাহ্‌র ফজলে আহমদীয়া জামা'ত সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে জলসা করে আসছে। আর এ জলসার দ্বারা আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছি। নিজেদের মাঝে আমূল পরিবর্তন আনার সুযোগ পাচ্ছি। সন্তানের তরবিয়ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। জাতির নিকট ইসলাম তথা কলেমার দাওয়াত পৌঁছানোর সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে সালানা জলসা। তাই কোন অবস্থাতে যেন আমরা এটিকে খাটো করে না দেখি। জলসায় আগত সকলের প্রতি আকুল আবেদন। আপনারা জলসার সব ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখবেন এবং প্রতিটি কার্যক্রমের সফলতার জন্য দোয়া জারি রাখবেন। জলসায় যোগদানের পূর্বেই সন্তানদের মাঝে এ বিষয়ে অবগত করিয়ে দেয়া যে, তোমরা মহত এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছো, তাই সেখানে যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে তোমরা সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে। ইবাদত, তেলাওয়াত, দোয়া ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকবে। সেই সাথে আমরা নিজেরাও যেন একথাগুলো ভুলে না যাই। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি খেয়াল রাখি, অধিবেশনে বসা, পরস্পরের প্রতি সালাম বিনিময় করা, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা, একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়া, সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, আদবের সাথে খাবার খাওয়া, কোন কিছু অপচয় না করা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। তবেই আমরা সুন্দর একটি সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো।

জলসাগাহে বসা ও বক্তৃতা শোনা

জলসা সালানার একটি মৌলিক বিষয় হলো বক্তার বক্তৃতা শোনা। একজন বক্তা অনেক পরিশ্রম করে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করে তার ওপর অর্পিত বিষয়াবলীকে সুন্দর ভাবে দর্শক শ্রোতার মাঝে পেশ করার বা উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকেন। যদি শ্রোতামন্ডলী বক্তার প্রতি মনোযোগী না হয় তাহলে বক্তা তার বিষয়াবলীকে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারেন না। তখন উভয়ের অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। হয়তো কোন কোন বক্তার কথা আপনার নিকট ভালো লাগবে না। তবুও জলসাগাহে বসে থাকা উচিত। বক্তার পরিশ্রমকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। শুধু যে পছন্দসই বক্তার কথা শুনবো আর বাকীদের কথা শুনবো না এমনটি যেন আমাদের মাঝে পরিলক্ষিত না হয়। এতে বাচ্চারা প্রভাবিত হবে এবং তারাও এ অভ্যাস গড়ে তুলবে। আমাদের জলসার অপর একটি উদ্দেশ্য হলো, জেরে তবলীগ ভাইদের আনা তাদেরকে পাশে বসিয়ে বক্তৃতা শুনানো। তাদের মনের মাঝে লুকায়িত প্রশ্নের উত্তর হয়তো বক্তৃতা শুনার মাঝে পেতে পারেন। আমাদের কাজই হবে সত্যকে নিজে জানা ও অন্যকে মানার সুযোগ করে দেয়া।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ আ'রাফের

১৮২ ও ১৮৭ নং আয়াত পেশ করছি। প্রথমটি অর্থ হলোঃ আর আমাদের সৃষ্টির মাঝে এমন এক দল আছে যারা (লোকদেরকে) সত্যের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দান করে এবং এরই মাধ্যমে সুবিচার করে। আর অপরটির অর্থ হলো– আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাকে হেদায়াত দেয়ার কেউ নেই। তিনি তাদের ঔদ্ধত্যে দিশেহারা অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেন।

মহতী এই জলসার মাধ্যমে আমরা মূলত তবলীগের কাজও করে থাকি। প্রতি বছর কোন না কোন ভাইকে আমরা জলসাতে নিয়ে আসি। তারা জলসার অনুষ্ঠান শুনেন, প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন অনেক সময় মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রশ্নও করেন। যথাযথ উত্তর পেয়ে আবার অনেকে বয়আত নিয়ে আহমদীয়া সিলসিলাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হন। এগুলো আমাদের চলমান ধারা। সত্যকে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়াই আমাদের মহত কাজ। এর মধ্যে অনেকে আবার বিরোধিতা করে বসে। সত্যকে না মেনে পথভ্রষ্টতার পথ বেছে নেয়। তার প্রতি আমরা চাপ সৃষ্টি না করে দোয়াই করতে পারি। আল্লাহ্ যেন এ ধরনের লোকদের হেদায়াত দান করেন, আমীন।

যেহেতু জলসার বিষয়ে লেখা তাই কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরছি। এ অধম সর্ব প্রথম ১৯৮১ ইং সনে বাংলাদেশের ৫৭তম জলসাতে যোগদান করি। তারপর হতে প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় জলসাতে আসি। এছাড়া অনেক স্থানীয় জলসা, আঞ্চলিক জলসাতেও অংশ নেই। অনেক স্থানীয় ও আঞ্চলিক জলসাতে একাধিক বার বক্তৃতা দেওয়ারও সুযোগ হয়েছে। এছাড়া ২০০৮ইং সনে হুযূর (আই.)এর অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক খেলাফত জুবিলী জলসা লন্ডনে যোগদান করার তৌফিক হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। খলীফার উপস্থিতিতে জলসার গুরুত্বই আলাদা তাও আবার আন্তর্জাতিক জলসা। প্রতি বছর কেউ কেউ আন্তর্জাতিক জলসায় যোগদান করেন এবং খলীফার সান্নিধ্য লাভ করার তৌফিক পান। এরপর রয়েছে কাদিয়ানের জলসা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম স্থানের জলসা আলাদা একটি মর্যাদা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে প্রতি বছরই আহমদীরা এই জলসার অপেক্ষা করে থাকেন। ভিসা পাওয়া সাপেক্ষে যোগদান করেন। জলসা উপলক্ষে আমার কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ হয় নি তবে মার্চ ২০১৪ সালে রিফ্রেসার্স কোর্স উপলক্ষে দেড় মাস কাদিয়ানে ছিলাম এবং বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থান দর্শন করা ইবাদত ও দোয়া করার তৌফিক হয়। আমাদের সবারই কাদিয়ান যাওয়া উচিত। নিজেদের ঈমানকে সতেজ করার জন্য কাদিয়ান একটি উৎকৃষ্ট স্থান।

অনেক সময় আমি দেখেছি যে, আমাদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যারা সঠিক ভাবে জলসার অধিবেশনে উপস্থিত হয় না। বিভিন্ন স্থানে গল্প-গুজবে সময় পার করে অথবা বৃথা কাজে সময় ব্যয় করে থাকে। আমাদের এমনটি করা উচিত নয়। আমরা সময় ও অর্থ ব্যয় করে জলসাতে যোগদান করি। জলসায় এসে যদি কোন ফায়দা লাভ না করতে পারি তাহলে কি লাভ আমাদের জলসাতে এসে। আমাদের মধ্যে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও ছোট ছোট বাচ্চারা জলসাতে এসে থাকেন। আমাদের সবারই দায়িত্ব জলসাকে সাফল্য মন্ডিত করা। আর সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা সম্মিলিতভাবে জলসার প্রত্যেকটি সেশনে বসে মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনব ও প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে বসব। আগত মেহমানদের সাথে রাখব। তবেই জলসার মান-মর্যাদা আমরা বজায় রাখতে পারবো, না হয় এটি আমাদের নিকট মেলার মত মনে হবে।

৯১তম জলসা এবং কিছু কথা

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় জলসা ৯০ পেরিয়ে ৯১-তে পদার্পণ করছে। এটি সত্যি বড়ই সৌভাগ্যের কথা, আনন্দের কথা, গৌরবের ও অহংকারের কথা। আর কয়েক বৎসর পর শততম জলসা উদযাপিত হবে। তখন হয়তো আমরা অনেকেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জামা'ত শতবর্ষ পার করেছে। কিন্তু আমরা কি লাভ করেছি, সকলের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে। আমরা কি লাভ করেছি আর কী করি নি সবকিছুই আমাদের সামনে রয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করলেই এর জবাব পেয়ে যাবো। এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি নি। আর পারিনি বলেই বাংলাদেশের মত ছোট্ট একটি দেশের ১৬ কোটি মানুষের মাঝে আমাদের প্রচার পৌঁছাতে পারি নি। বড়ই দুঃখজনক, বড়ই পরিতাপ, বড়ই আফসোস। একথা সত্য যে, আমরা সংখ্যার দিক থেকে দুইশত ছয়টি দেশে আমাদের প্রচার করতে সক্ষম হয়েছি। সমষ্টিগত ভাবে আমরা পৃথিবীতে প্রায় ২৫ কোটি সদস্য আছি কিন্তু এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা হতে অনেক কম। তাই দ্রুত এর বৃদ্ধির জন্য আমাদের দোয়া ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ইং সনে মাত্র ৪০ জন সদস্যের বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়াতের যাত্রা শুরু করেছিলেন। আগামী মার্চ ২০১৫ইং আমরা ১২৬ বৎসর অতিবাহিত করবো। আমাদের সকলের মাঝে তবলীগি চেতনা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আমরা সবাই যদি এ কাজে অংশ নেই তাহলে অতি দ্রুত জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। সাথে সাথে তরবিয়তের ও ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৯১তম জলসায় আমাদের এই অঙ্গিকার হোক যে, আমরা প্রত্যেকে নিয়মিত তবলীগ করবো, নিজেদের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি করুন, আমীন।

আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই এক সময় বিরাট ফল প্রকাশ করবে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করে বলেন, যে হেদায়াত গ্রহণ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে। আর যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের অকল্যাণের জন্যেই বিপথগামী হয়ে থাকে। আর কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। আর আমরা কোন রসূল না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে এটি বলা হয়েছে যে, আযাব বা শাস্তি বাইরে থেকে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যন্তর থেকেই জন্ম

নেয়। জাহান্নামের আযাব এবং জান্নাতের পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে মানবের ইহলোকে নিজের ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত মূর্তপ্রকাশ ও প্রতিরূপ। এরূপে মানুষ ইহকালে নিজেই নিজের ভাগ্যের রচয়িতা এবং পরকালে সে স্বয়ং বলা যেতে পারে, নিজেই নিজের পুরস্কার দাতা বা শাস্তিদাতা।

প্রত্যেকেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখ দুর্দশা নিজেকেই বহন করতে হবে। কারো বদলি স্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কারো কোন উপকারে আসবে না। এ আয়াত খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। আমাদের বর্তমান যুগে পৃথিবী একের পর এক পুন:পুন: নজীরবিহীন ভয়াবহ প্লেগ-মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব দুর্যোগের সম্মখীন হয়ে চলেছে এবং মানবজীবনকে তিক্ততায় দুর্বিসহ করে তুলেছে। এসব চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে নেমে আসার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। আমরা আমাদের এই মহতী জলসার মাধ্যমে মানবজাতিকে সেই সতর্ককারীর দিকেই আহ্বান করছি। যিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের জেলা গুরুদাসপুর কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। সূরা জুমুআর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক নবী করীম (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমনকারী হিসাবে নিজেকে শেষ যুগের মহামানব ও সংস্কারক এর দাবি করেছেন। শত বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'ত এই সত্যের প্রতি অবিচল। সবাই আমরা কোন বা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি এবং ঈমানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছি। সুতরাং জলসা সর্বদিক থেকে কল্যাণময়, জলসাতে যোগদান করতে পারা ও যাবতীয় অনুষ্ঠানে শরীক থাকা মঙ্গলজনক। আমরা সর্বদা যেন এ কথাগুলো স্মরণ রাখি। এবারের জলসাতে হয়তো আমরা অনেককেই দেখতে পারব না। বিগত বৎসরে অনেকেই ইহধাম ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দরবারে না ফিরার দেশে চলে গেছেন। তাদের জন্য তো আমরা দোয়া করতে পারবো। সেই সাথে অনেক নতুন মুখ আসবে তাদের সাথে পরিচয় হতে পারবো। সবাই আমরা একই পরিবারের মত জলসার কয়দিন আনন্দঘন পরিবেশে থাকতে পারা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। এজন্য জলসার কার্যক্রম সর্বদাই কল্যাণমূলক ও ফলপ্রসূ।

কে আমার অন্তর্ভুক্ত?

শুধু শুধু জলসায় আসা, তিন চারদিন অবস্থান করা, লঙ্গরখানার খাবার খাওয়া এটি জলসার উদ্দেশ্য নয়। জলসার উদ্দেশ্য হলো নিজেকে একজন সত্যিকার আহমদী হিসাবে তুলে ধরা। আমরা দাবি করি যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান। এটা শুধু মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না বরং নিজের মাঝে সেই নমুনা প্রদর্শন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ কথাটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, কে আমার অন্তর্ভুক্ত, সে-ই, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে। যে বক্রতা পরিহার করে এবং ন্যায়-নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে শয়তানের দাসত্ব হতে মুক্ত হয় এবং খোদা তা'লার এক অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যারা এইরূপ করে তারা আমার মধ্যে আছে এবং আমি তাদের মধ্যে আছি। কিন্তু এইরূপ করতে কেবল সে-ই সামর্থ হয় যাকে খোদা তা'লা নফ্‌স পবিত্রকারীর ছায়ায় নিয়ে আসেন। তখন তিনি তার নফ্‌সের দোযখে নিজের পা রেখে দেন। তখন সে এইরূপ ঠান্ডা হয়ে যায় যেন তার মধ্যে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করে। এমন কি খোদার আত্মা তার মধ্যে অবস্থান করে এবং একটি বিশেষ জ্যোতির্বিকাশের সাথে 'রাব্বুল আলামীন' (নিখিল বিশ্বের প্রভু) তার হৃদয়ে অবস্থান করেন। তখন তার পুরাতন মনুষ্য জ্বলে যায় এবং তাকে একটি নতুন ও পবিত্র মনুষত্ব দান করা হয়। খোদা তা'লাও এক নতুন খোদা হয়ে তার সাথে এক নতুন ও বিশেষ রঙে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সে এই পৃথিবীতেই বেহেশ্‌তী জীবনের পবিত্র উপকরণ পেয়ে যায়।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪, ৩৫)।

হে আহমদী জামা'তের সদস্য বৃন্দ একটু চিন্তা করে দেখুন আমরা উক্ত অবস্থায় নিজেরা আছি কিনা? হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর জামা'তের অন্তর্ভুক্তদের কতটা ভালোবাসেন তা নিম্নোক্ত অংশটুকু পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি দোয়া করতেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকব। দোয়া এটাই যে, খোদা তা'লা আমার এই সম্প্রদায়ভুক্তদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, তার রহমতের হাত লম্বা করে তাদের হৃদয় তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিন এবং সকল দুষ্টামী ও বিদ্বেষ তাদের হৃদয় হতে অপসারিত করে দিন এবং পরস্পরের মধ্যে খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। আমি বিশ্বাস করি যে, এই দোয়া কোন সময় কবুল হবে এবং খোদা আমার দোয়াসমূহকে বিনষ্ট করবেন না। হ্যাঁ, আমি এই দোয়াও করছি যে, যদি আমার জামা'তের কোন ব্যক্তি খোদা তা'লার জ্ঞানে ও ইচ্ছায় চির অভিশাপ গ্রস্থ হয় যার জন্য এটা নির্ধারিত নয় যে, সে খাঁটি পবিত্র ও খোদা-ভীতি অর্জন করবে, হে সর্বশক্তিমান খোদা, তাকে আমার তরফ হতেও ফিরিয়ে দাও যেভাবে সে তোমার তরফ হতে ফিরিয়ে গেছে এবং তার জায়গায় অন্য কাউকেও নিয়া আস যার হৃদয় কোমল এবং যার প্রাণে তোমার অন্বেষার স্পৃহা আছে (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)। আল্লাহ্‌র ইবাদত, আনুগত্য, বিনয় ও নামায কায়েম করা জলসার মুখ্য উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা আবশ্যক।

শেষ কথা

সুধী পাঠক! আমাদের জীবনে প্রতি বছরই জলসা আসবে আবার তা এক সময় শেষ হয়ে যাবে। আমরা যেন জলসার দিনগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অতিবাহিত করি। জলসা সকলের জীবনে আমুল পরিবর্তন আনুক এই কামনা করি। জলসা সকলের জীবনের পরিবর্তনের কারণ হোক।

পবিত্র কুরআন এই কথা বলে যে, অথচ তাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে সদা তাঁর দিকে বিনত হয়ে থাকতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল, আর এ হলো চিরস্থায়ী ধর্ম। (সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ: ৬)

“কুরআন শরীফের জ্যোতি, কল্যাণ এবং এর প্রভাব সদা সর্বদা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত”

কুরআন করীমের প্রভাব

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

জামালও হুসনে কুরআন নূর জানে হার মুসলমান হে,
ক্বামার হে চাঁদ আওরো কা হামারা চাঁদ কুরআন হে।

অর্থাৎ, কুরআনের সৌন্দর্য ও রূপ প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের নূর,
অন্যদের চাঁদ তো (আকাশের) চাঁদ, আমাদের চাঁদ। কুরআন

কুরআন করীম হচ্ছে ইসলাম ধর্মের কামেল বা পূর্ণাঙ্গীন শরীয়াত যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ যার প্রভাবে মানুষ সূফী, ওলী আল্লাহ্, দরবেশ, পীর এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দায় পরিণত হতে পারে। পবিত্র কুরআন করীমের প্রভাবের কথা আল্লাহ্ কুরআন করীমে অসংখ্য বার উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা আল আহকাফের ৮নং আয়াতে বলেন– আর যারা তাদের কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করেছে তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়া হয় তারা বলে 'এতো সুস্পষ্ট যাদু।' আল্লাহ্ তা'লা আরোও বলেন– আমরা যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করছি যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে (সূরা আল হাশর ঃ ২২)।

স্বয়ং মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এটি বুখারী কিতাবুততাফসীর-এ উল্লেখ আছে, তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)কে বলেছেন কুরআন শুনানোর জন্য। তিনি (রা.) বলেন– অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনতে আমার ভালো লাগে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– আমি আপনাকে কি শুনাব, আপনার ওপরই তো কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন– আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম কিছুক্ষণ পরেই তিনি (সা.) আমাকে থামিয়ে দিলেন আর তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন অঝরে চোখ দিয়ে পানি ঝড়ত। আর এভাবে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেন যার কারণে আশেপাশের লোকেরা একত্রিত হয়ে যেত।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ : হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণও পবিত্র কুরআন করীমের প্রভাবেই হয়েছে। একদিন হযরত উমর (রা.) তরবারী হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে হত্যা করার জন্য। পথিমধ্যে তার বন্ধু নাইম বিন আব্দুল্লাহ্ বলল, হে উমর প্রথমে তুমি তোমার ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ফাতেমা ও তোমার ভগ্নীপতি দুজনই মুসলমান হয়ে গেছে। একথা শুনে উমর (রা.) তার বোনের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। বোনের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছেই তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন ঘরের ভিতর সুললিত কণ্ঠে কোন কালাম আবৃত্তি করছে। এই কালাম অর্থাৎ কুরআন করীম পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন হযরত খাব্বাব (রা.)। উমর (রা.) ঘরে প্রবেশ মাত্রই খাব্বাব (রা.) আড়ালে লুকিয়ে পরেন। উমর (রা.) বললেন, তোমরা নাকি

ইসলাম গ্রহণ করেছ, একথা বলতেই তিনি তার ভগ্নীপতিকে মারতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তার বোনের মুখে একটি ঘুষি লাগে ফলশ্রুতিতে নাক ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন উমর (রা.)-এর বোন নির্ভয়ে বললেন হ্যাঁ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, প্রাণ থাকতে এই ধর্ম আমরা ছাড়বো না। তোমার যা মনে চায় তুমি তা করতে পার। বোনের চেহারা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে উমর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন এবং বললেন আমাকে তা শুনাও যা তখন তোমরা পাঠ করছিলে। হযরত ফাতেমা (রা.) তখন তাঁর হাতে কুরআন করীমের সেই পাতাগুলি দিলেন, উমর পড়তে থাকলেন এবং গভীর মনোনিবেশ করলেন ও অভিভুত হলেন। এগুলো সূরা হাদীদের আয়াত ছিল যা উমর (রা.)-কে যদু করেছিল।

কুরআন করীমের আধ্যাত্মিক প্রভাবের দুরুনই হযরত উমর (রা.)-এর মাঝে এই অসাধারণ পরিবর্তন এসেছিল। যার ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। সীরাত ইবনে ইসহাকে সূরা ত্বা-হা এবং সূরা তাকভীর পড়ার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইমাম হাসান (রা.) বর্ণনা করেন– একবার হযরত উমর (রা.) নামায পড়ছিলেন। যখন সূরা তুরের ৮নং আয়াত আসল তখন তিনি এই আয়াত দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে যায়। বাহ্যত হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত কঠিন স্বভাবের ছিলেন কিন্তু যখনই কুরআন করীমের কোন আয়াত বা অংশবিশেষ তার সামনে পাঠ করা হতো তার হৃদয় নরম হয়ে যেত।

কবিতা রচনা পরিহার করা :– পবিত্র কুরআন করীমের প্রভাবে আরবের বিখ্যাত কবিগণও তাদের কবিতা রচনা থেকে বিরত থেকেছিলেন। হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.), আমের বিন আকওয়া (রা.) তোফায়েল বিন আমর (রা.), আসওয়াদ বিন সারি (রা.), কা'ব বিন জহির (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এরা প্রত্যেকেই আরবের বিখ্যাত কবি ছিলেন কিন্তু কুরআন করীমের সামনে তারা মাথা অবনত করেছেন।

লাবিদ আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। একবার হযরত উমর (রা.) তার কাছে কয়েকটি পংক্তি শোনার আগ্রহ করেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন– যেখানে খোদা তা'লা আমাকে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখিয়েছেন সেখানে পংক্তি পাঠ করা আমার জন্য শোভনীয় নয়। (সীরাতুন নবী আল্লামা শিবলী কর্তৃক-তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১)

আল্লামা শিবলী আরবের কতক সাহিত্যিক, কবি ও নেতাদের ঘটনা উল্লেখ করেন যারা কুরআন করীমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন আর কতক ঈমান আনতে বাধ্য হয়।

যিমাদ আযদি ঃ যিমাদ আযদি ঝারফুঁক করতেন। তিনি এটি শুনেছেন যে (নাউযুবিল্লাহ) হযরত মুহাম্মদ (সা.) পাগল হয়ে গিয়েছেন। আর একথা শোনার পর যিমাদ আযদি রসূল করীম (সা.)-এর চিকিৎসার জন্য আসেন। তখন রসূল করীম (সা.) সংক্ষেপে হামদ ও কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, এটি শোনার পর তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তিন বার রসূল করীম (সা.)-এর কাছ থেকে এটি তিনি শোনেন। তারপর বলেন, খোদার কসম! আমি গণকদের কথা, যাদুকরদের মন্ত্র এবং কবিদের কবিতা শুনেছি কিন্তু তোমার কথা তাদের থেকে ভিন্ন ও অদ্ভুদ ধরনের। এটি তো সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত প্রভাব ফেলবে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, একবার আবু জেহেল ও কুরাইশদের বড় বড় নেতারা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর তাহরীক বা ঘোষণা দিনে দিনে ক্রমশ উন্নতি লাভ করছে। এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে, যে যাদু, গণকের কাজ এবং কবিতা বলতে পারে যেন জানা যায় যে, এই ব্যক্তি [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)] কি জিনিস? কুরাইশদের নেতা উতবা বিন রাবিয়্যাহ বলল যে, এই সবগুলো কাজই আমার জানা আছে, তোমরা যদি বলো, তাহলে আমি গিয়ে দেখতে পারি।

অতএব সে নবী করীম (সা.)-এর নিকটে গিয়ে কিছু শর্ত উপস্থাপন করল সন্ধির জন্য। এর উত্তরে রসূল করীম (সা.) সূরা হামীম আস সাজদাহ পড়া শুরু করলেন। রসূল করীম (সা.) শুধুমাত্র কিছু আয়াত পাঠ করলেন এতেই সেই ব্যক্তি রসূল করীম (সা.)-এর মুখে হাত রাখলেন এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বললেন যে, যথেষ্ট হয়েছে এখন থেমে যান। যখন তিনি ঘরে ফিরে আসেন তারপর বেশকিছু দিন তিনি ঘরের বাইরে যান নি। তখন আবু জেহেল গিয়ে তাকে বলল যে, "উতবা তোমার কি হয়েছে! মুহাম্মদ (সা.)-এর খাবার খেয়ে তোমার কি পদস্খলন হয়েছে।" উতবা বলল, 'তুমি জানো যে, আমি সবচেয়ে ধনী, ধন সম্পদের লালসা কখনই আমাকে পরাস্ত করতে পারে না। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) আমার প্রশ্নের উত্তরে যে বাণী উপস্থাপন করল তা না কোন কবিতা ছিল আর না কোন গণকের কাজ ছিল আর না এটি কোন যাদু ছিল। আমি এমন কথা কখনো শুনিনি। তিনি (সা.) যে বাণী আমাকে শুনালেন এতে খোদা তা'লার আযাবের সতর্কবাণী ছিল। আমি তাঁকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে চুপ হতে বলি, আমি ভয় পেয়েছি এ কারণে যে, তোমাদের ওপর যেন আযাব না এসে পরে, লোকেরা বলল যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কথার দ্বারা উতবার ওপর যাদু করেছে।

ওলিদ বিন মুগিরা : ওলিদ বিন মুগিরা কুরাইশদের মাঝে অনেক ধনী এবং প্রভাব সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি একবার রসূল করীম (সা.)-এর কাছে আসল এবং কিছু পড়ে শোনানোর জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি (সা.) পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে শোনালেন। ওলিদ বিন মুগিরা পুনরায় সেই আয়াতগুলো শুনেন। পরিশেষে সে আত্মহারা হয়ে বলল যে, খোদার কসম! এতে ভিন্ন ধরনের মিষ্টতা ও শ্যামলতা রয়েছে। এটি কোন মানুষের বাণী নয়।"

বনু জুহল বিন শিবান এর নেতা মাফরুকের সামনে রসূল করীম (সা.) কিছু আয়াত পাঠ করেন এতে সে মুসলমান হয় নি কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী শুনে সে অনেক প্রভাবিত হয়েছে।

নাজ্জাশী শাহ্ হাবশা : নাজ্জাশীর দরবারে যখন হযরত জাফর (রা.) সূরা মরিয়ম তিলাওয়াত করলেন তখন তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। তারপর বলল, খোদার কসম! এই কালাম এবং ইনজীল দুটোই একই প্রদীপের প্রতিবিম্ব।

হযরত জাবির বিন মুতইম : এই ধরনের আরো অনেক ঘটনা ইবনে ইসহাক সীরাতের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত

জাবির বিন মুতইম বদরের যুদ্ধবন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে এসেছিলেন। তিনি রসূল করীম (সা.)-এর কাছ থেকে 'সূরা তুর' এর দুই একটি আয়াত শুনেছিলেন। আর শোনামাত্রই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত তোফায়েল বিন আমর যিনি দওস গোত্রের লোক ছিলেন তিনিও কুরআনের বাণী শোনার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তোফায়েল বিন আমর এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি। তোফায়েল বিন আমর দওস গোত্রের একজন সম্মানিত ধনাঢ্য ব্যক্তি ও কবি ছিলেন। তিনি কোন কারণে মক্কায় আসেন। কুরাইশরা যখন তাকে মক্কায় দেখল তখন তারা চিন্তায় পরে গেল এমন যেন না হয় যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আর মুসলমান হয়ে যায়। এ কারণে তারা তোফায়েলের নিকট গিয়ে তাকে বলে, তুমি এমন এক সময়ে আমাদের শহরে এসেছ যখন কিনা এখানে এক ব্যক্তি আমাদের মাঝে ফিৎনা ফ্যাসাদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। তার কথা পিতা পুত্রের মাঝে, ভাই ভাইয়ের মাঝে এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। আমরা ভয় পাচ্ছি যে, তুমিও তার যাদু সুলভ কথা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে যাও। আমরা তোমাকে সতর্ক করছি যে, এমন যেন না হয় যে, তুমি তার বশে চলে আস। তোফায়েল বলেন, কুরাইশরা আমাকে এই বিষয়ে এতবার বলেছে যে, আমি তাদের কথাকে সত্য মনে করে অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছি এমনকি আমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কানে তুলা ঢুকিয়ে রাখি, যেন আমার কানে এই যাদুকরের কোন কথা না পৌঁছায় আর আমি এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হই। একদিন সকালে আমি কানে তুলা দেওয়া অবস্থায় মসজিদে হারামে গেলাম, সেখানে মহানবী (সা.)কে মসজিদের এক কোনায় নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। এই দৃশ্য আমার খুবই ভাল লেগেছে আর ধীরে ধীরে আমি মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছলাম।

খোদার মহিমা দেখুন, কত অদ্ভুত, আমার কানে তুলা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু আওয়াজ আমার কানে আসতে লাগল আর মনে মনে বলতে লাগলাম আমি একজন বোধ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ভালো মন্দের বিচার করতে পারি। এতে এমনকি ক্ষতি হবে যে, আমি তার কথা শুনি। যদি ভালো হয় তাহলে গ্রহণ করবো আর যদি মন্দ হয় তাহলে পরিত্যাগ করবো। এই চিন্তা আসার সাথে সাথেই আমি আমার কানের তুলা সরিয়ে ফেললাম আর কুরআন করীম তেলাওয়াত শুনতে থাকলাম। যখন রসূল করীম (সা.) নামায শেষ করে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে চললাম আর আবেদন করলাম যে, আমাকে আপনি আপনার কথা শোনান। রসূল করীম (সা.) আমাকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনান এবং তওহীদের তবলীগ করেন। এর প্রভাব এমন ছিল যে, আমি সেখানেই মুসলমান হয়ে যাই। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন পৃ ১৮৮, ১৮৯)

পরবর্তীতে তোফায়েল বিন আমরের মাধ্যমে তার গোত্রের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সংক্ষেপে আমি পাঠকদের সামনে এই ঘটনা উপস্থাপন করলাম। এমন হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে, সব ঘটনা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

তায়েফের সফরে হযরত খালেদ আল আদওয়ানি (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সূরা তারেক পড়তে শুনেন। কিন্তু তখন তিনি মুসলমান হন নি কিন্তু পুরো সূরা তার মুখস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাবশা থেকে বিশজনের একটি প্রতিনিধি দল রসূল করীম (সা.)-এর কাছে আসেন। রসূল করীম (সা.) তাদের কুরআন করীম পাঠ করে শোনান এতে তাদের চোঁখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। হযরত আবু উবায়দাহ (রা.), হযরত আবু সালমা (রা.) এবং হযরত আরকাম বিন আরকাম (রা.) এই তিনজন সাহাবী কুরআন করীমের প্রভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। (সীরাতুন নবী শিবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯০-২৯১)

কুরআন করীমের আধ্যাত্মিক প্রভাব উল্লেখ করতে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন– কুরআন শরীফের জ্যোতি, কল্যাণ এবং এর প্রভাব সদা সর্বদা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। (মলফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫০)

কুরআন করীমের আধ্যাত্মিক প্রভাবের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এ বিষয়ে আরো অনেক লিখা যেত। ইচ্ছাও ছিল আরো কিছু লেখি কিন্তু প্রবন্ধের দীর্ঘতর বিবেচনা করে এমন আরো অনেক ঘটনা ছেড়ে দিচ্ছি। পরবর্তীতে কোন সময় সুযোগ হলে লিখার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্।

যাইহোক আর একটি ঘটনা উল্লেখ করে প্রবন্ধের ইতি টানছি। এই ঘটনাটি পাঁচ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সালের আসর নামাযের পর হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলহে মাওউদ (রা.)-এর অনুরোধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি এমন ছিল যে, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি কোন স্থানে সফরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একটি জঙ্গল আসল। এই জঙ্গলে একজন চোর থাকত যে কিনা প্রত্যেক মুসাফিরের জিনিসপত্র লুট করে নিত। অভ্যাস অনুযায়ী এই বুযুর্গ ব্যক্তির জিনিসপত্রও লুট করে নিতে লাগল। তখন বুযুর্গ ব্যক্তি কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করে বলল, তোমার রিযক আকাশে বিদ্যমান রয়েছে, তুমি খোদার ওপর ভরসা করো, তাকওয়া অবলম্বন করো আর চুরি করা ছেড়ে দাও। খোদা তা'লা স্বয়ং তোমার চাহিদা মেটাবেন। এতে করে চোরের মনে প্রভাব পড়ল আর সে বুযুর্গ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল ও তাঁর কথার ওপর আমল করল। ফলশ্রুতিতে সে সোনা রূপার পাত্রে ভালো ভালো খাবার পেতে লাগল। সে খাবার খেয়ে পাত্রগুলোকে ঝুপরিতে নিক্ষেপ করত।

ঘটনাক্রমে আবার কোন একদিন সেই বুযুর্গ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই চোর যে বর্তমানে অনেক পুণ্যবান ও মুত্তাকী হয়ে গিয়েছে সে সেই বুযুর্গকে তার সমস্ত ঘটনা বলল এবং কুরআন করীমের আরো আয়াত শোনাতে বলল। এতে সেই বুযুর্গ আরো কিছু আয়াত পড়ে শোনান। পরবর্তীতে সে সারা জীবন কুরআন করীম অনুযায়ী চলেন। (হায়াতে আহমদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী রচিত) (দৈনিক আল ফযল, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৭ অবলম্বনে)

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে কুরআন করীম বুঝে পাঠ করার এবং এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। কুরআন করীমের প্রভাব যেন আমাদের জীবনেও প্রতিফলিত হয় এবং কুরআন করীম যেন আমাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে।

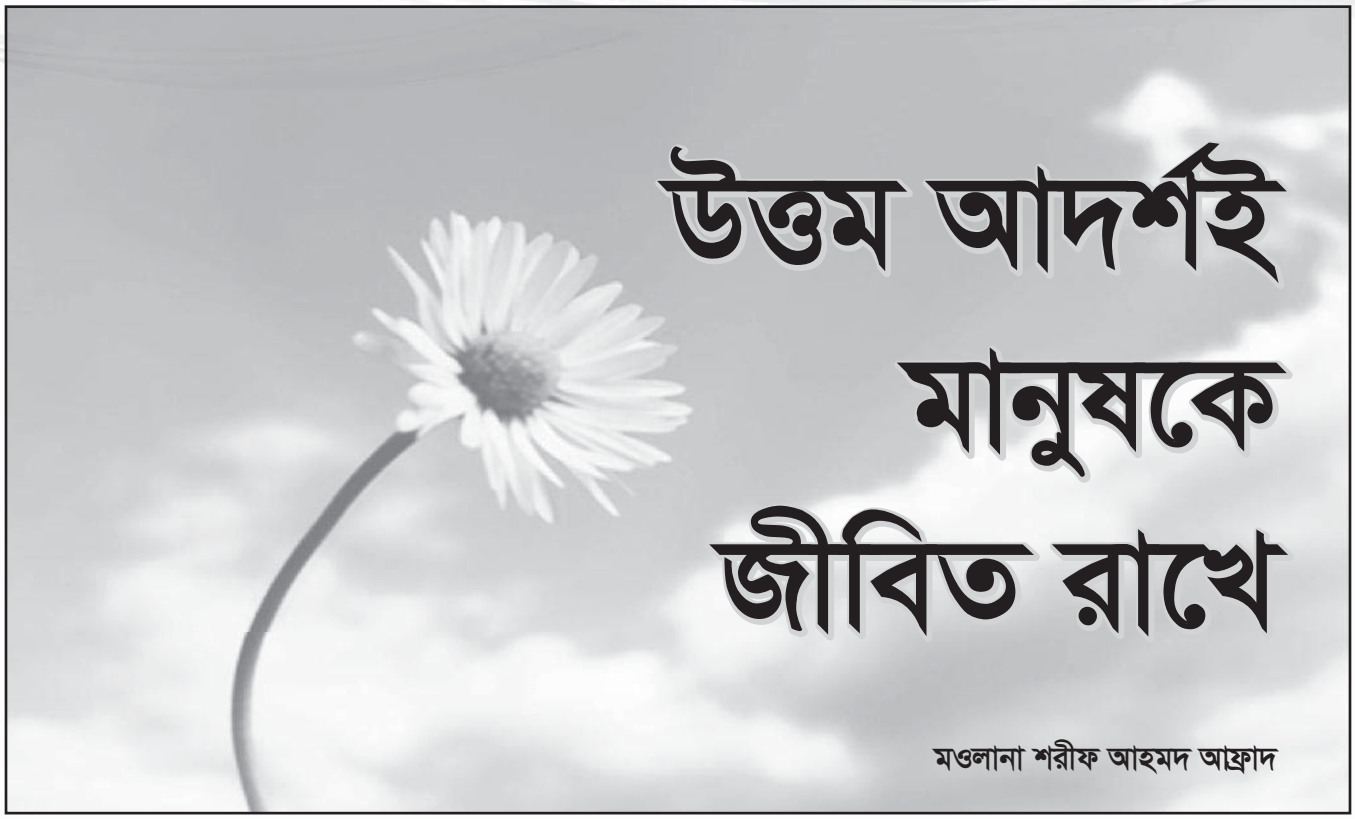

উত্তম আদর্শই মানুষকে জীবিত রাখে

মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

অপরূপ সৃষ্টি প্রভুর
মানুষ কয় তারে
জগৎ নত তারি কাছে হায়!
কৃষ্টি সরোবরে ॥

মহান আল্লাহ্ তা'লার অপার সৃষ্টি মানুষ। এই বিশ্ব সম্ভারে আল্লাহ্ তা'লার অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে। সকলেই আল্লাহ্ তা'লার পরিবার। এই সমস্ত সৃষ্টি পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা "কুন ফাইয়াকুন" এর অধীনে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মানুষকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে মানুষকে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যেমন- "হুওয়াল্লাযি খালাকাকুম মিন তীন" অর্থঃ তিনিই তোমাদেরকে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আনআম : ৩) "খালাকাল ইনসানা মিন সালসালীন কাল ফাখ্‌খার" তিনি মানুষকে খনখনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন (আর রহমান ঃ ১৫)। এরপর মানুষকে মাটি থেকে উদ্ভিদের ন্যায় সৃষ্টি করেন।

যেমন- "ওয়াল্লাহু আম্‌রাতাকুম মিনাল আরযে নাবাতান" অর্থঃ এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভূমি হতে উদগত করেছেন উদ্ভিদের ন্যায় (সূরা নূহ ঃ ১৮)।

এরপর আল্লাহ্ পাক মানুষকে ইনসান নাম দিয়ে আরো একটু মর্যাদা বাড়িয়ে বলেন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফী আহ্‌সানে তাকভীম অর্থঃ নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত তীন : ৫) অতঃপর আল্লাহ্ মানুষকে ইনসান নাম থেকে আরো উন্নতি দিয়ে নাম রাখেন মু'মিন। এই পর্যায়ে এসে মানুষ স্রষ্টার সাথে ভাবের আদান প্রদান করে, যা অন্য কোন প্রাণী করতে পারে না। মু'মিন বিষয়ে আলোচনা করছি– প্রাসঙ্গিক কিছু গোড়ার কথা উল্লেখ করে নেই।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে উন্নত মস্তিষ্ক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আশা, তাদের দিয়ে উন্নত, রুচি সম্মত কাজ করাবেন। তারা সৃষ্টি জগতটাকে শান্তিতে ভরে দিবে। মান রাখবে শ্রেষ্ট সৃষ্টির, পৃথিবীটাকে করবে সুন্দর থেকে আরো সুন্দর। এই সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। আর বললেন–"ইন্নী জায়েলুন ফিল আরযে খলীফা" নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি। (সূরা বাকারা : ৩১)

আসল কথা হলো রক্তপাতের মাঝেও এমন আদর্শবান মানুষ তৈরী হবে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে। তাঁর নির্দেশিত পথে চলবে। সৃষ্টি জগতের নেতৃত্ব দিবে। নিজেদের মাঝে উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে। আশরাফুল মাখলুকাত-সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা নিজের মাঝে ফুটিয়ে তুলবে। ধন্য করবে সমস্ত সৃষ্টি কূলকে।

উক্ত আয়াতে "ইন্নী জায়েলুন ফিল আরযে খলীফা" নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশ্‌তাদের সামনে এ কথা বলার মাঝে একটি হিকমত আছে। ফিরিশ্‌তারা কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মানুষ বানানোর প্রস্তাবটি শুনে সাথে সাথে বলে উঠে নি যে, হে আমাদের প্রভু! তুমি বানাও। বরং তারা বলেছিল–"আমরাই তোমার প্রশংসা গুণ কীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (সূরা বাকারা : ৩১)

কুরআন করীমের এই আয়াতের প্রতি যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষ সৃষ্টিকে ফিরিশ্‌তারা এক ঝঞ্জাল মনে করলো। মানুষ সৃষ্টির প্রস্তাব ফিরিশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করলে তাদের অনিহা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষ সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্ তা'লা তো ফিরিশ্‌তাদের না বলেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন। কারণ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী

নন। সকলেই তার মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তাদের বলার মাঝে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো– কোন কাজ করার শক্তি সামর্থ থাকলেও আমরা যেন অধিনস্তদের সাথে পরামর্শ করি। অধীনস্তরা ভালো, উত্তম পরামর্শ দিতেও পারে অথবা না। তারপরও করা উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লার এই বিষয়টির ওপর যেমন ধর্মীয় ভাবে শুরার ব্যবস্থা আছে। যাতে অধীনস্তদের পরামর্শ নেওয়া হয়। অনুরূপ ভাবে আমীর/প্রেসিডেন্টদের আমেলার সদস্যরা আছে যাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে কাজ ভালো হয়। জাগতিকভাবে রাষ্ট্র প্রধানের অনুসদ বর্গ আছে। আছে যে কোন সংগঠনের অধীনস্তরা। যাদের নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি পরিবারের যিনি কর্তা যার কাছে পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব আছে তারা যদি কোন কাজ করার আগে পরিবারের স্ত্রী সন্তানদের সাথে পরামর্শ করে কাজটি করেন তাহলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। এতে করে অধীনস্তদের থেকে অধিক আনুগত্য পাওয়া যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে উত্তম আদর্শ শিখানোর জন্য অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেন। তাদের কাউকে কাউকে দেন ঐশী কিতাব। যাতে করে নবীর চলে যাওয়ার পর তাঁর আদর্শ থেকে উম্মতের পদস্খলন না ঘটে। নবীর পর আবার করেছেন খেলাফতের ব্যবস্থা। যাকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তকে দ্বিতীয় কুদরত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই খেলাফতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)।

মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উদ্দেশ্য কি? কোন পথে চললে ভালো হবে তা সম্পর্কে অবগত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন– এবং আমি জিন্ন ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে। (সূরা আয্‌যারিয়াত : ৫৭) আবার তিনি বলেন– এবং প্রত্যেকের জন্য কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রয়েছে যার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং (তোমাদের লক্ষস্থল এই যে,) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। (সূরা আল বাকারা : ১৪৯)

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র। আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে হলে মানুষকে তথা আমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেকে। জগতের মোহ থেকে বেড়িয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই প্রচেষ্টা জারি থাকলেই আল্লাহ্ তা'লা সতত তার পানে এসে ধরা দেন। হাদীস শরীফে আছে–আল্লাহ্ তা'লা বলেন–"বান্দা যখন আমার দিকে এক পা আগায় আমি তার দিকে হেটে আসি। বান্দা যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তখন তার দিকে দৌড়ে আসি।" আরেকটি হাদীসে আছে– বান্দা যখন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা খুব খুশি হন যেভাবে মরুভূমিতে উট হারালে অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে পেলে মালিক যেমন খুশি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–এবং যারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের (নিকটে আসার) পথ সমূহ প্রদর্শন করব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের সঙ্গে আছেন (সূরা আন কাবুত : ৭০)

আসলে মানুষকে জীবিত রাখে তার উত্তম আদর্শ এবং ভালো কর্ম। আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত সমস্ত নবী-রসূলগণ এবং তার খলীফাগণ এবং নবীর সাহাবাগণ তাদের উত্তম কর্মের ফলে আমাদের কাছে এখনও জীবিত আছেন। সম্পদ দিয়ে, বংশ দিয়ে মানুষ বেশি দিন জীবিত থাকে না। জীবিত থাকে তার উত্তম আদর্শ দিয়ে। অনেক নবী, আনেক নবীর সাহাবারা আছেন যাদের সম্পদ এবং ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমরা চিনি না, জানি না কিন্তু তাঁদের ধার্মিকতা, তাঁদের আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার ফলে তাঁদেরকে আজও আমরা চিনি। তাই আমাদেরকেও আদর্শবান হতে হবে। সমাজ, দেশ এবং ধর্মের জন্য উত্তম আদর্শ রেখে যেতে হবে। এর জন্য ভালো পথে চলতে হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শিখাচ্ছেন– 'ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কা নাসতাঈন, ইহ দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম' অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। (সূরা আল্ ফাতেহা : ৫-৭)

আপন বিধিরে তুচ্ছ করি
মাতি সবে কোন ভালে
লাখো প্রণাম তুচ্ছ বুলি
সাধে, যবে যে তারে ॥

মানুষকে সংশোধনের জন্য পূর্বেও যেমন নবী প্রেরণ করেছে এই শেষ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহ্‌দীকে প্রেরণ করেছেন। যাতে করে আমরা হেদায়াতের পথ লাভ করি। কিন্তু ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মেনেও আমরা আত্মিক দুর্বলতার কারণে নিজেদের মাঝে উত্তম আদর্শ তৈরী করতে পরি নি। যার ফলে নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তেমনি জামা'তে আহমদীয়াকেও করছি বদনামী। মুসলমানদের মাঝে কিছু লোকের আদর্শগত কাজের কারণে ইসলামকে করছে বদনাম। তেমনি আহমদী মুসলমানের মাঝেও দু'একজন ব্যতিক্রম সদস্য রয়েছে।

একবার আমি ঘড়িলাল থেকে জরশিং যাচ্ছিলাম। এক অ-আহমদী ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলি আমি আহমদী। তাকে তবলীগ করি, বলি আপনিও ইমাম মাহ্‌দীকে মানুন। আহমদী হোন। লোকটি বলল– আপনাদের ইমাম মাহ্‌দী সত্য না–আপনাদের সদস্যদের আচরণ ভালো না, অমুক ব্যক্তি এই এই আচরণ করেছে আমার সাথে। আমি আর কি বলি। আমি তাকে বললাম– ভাই মুসলমানদের মাঝে অনেক চোর আছে না? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। বললাম সেওতো নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। তেমনি ডাকাত আছে না, যারা ডাকাতি করে, মন্দ লোক আছে না, যারা মন্দ কাজ করে। তারাও তো নিজেকে মুসলমান দাবি করে। লোকটি বলল, হ্যাঁ করে। বললাম এর জন্য কি রসূলুল্লাহ্ দায়ী? লোকটি বলল না। আমি বললাম–এমনি আমাদের আহমদী জামা'তেও এমনি দু'একজন আছে যারা এমন কাজ করে। এতে ইমাম মাহ্‌দীর কোন দোষ নেই। তিনি তো আমাদের ভালো শিক্ষাই দিয়েছেন।

যা বলছিলাম আল্লাহ্ মানুষকে ইনসান নাম থেকে আরো উন্নতি দিয়ে নাম রাখেন মু'মিন। পর্যায়ে এসে মানুষ স্রষ্টার ভাবের আদান-প্রদান করে, যা অন্য কোন প্রাণী পারে না। মু'মিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তারাই, যখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের হৃদয়ে ভীত-কম্পিত হয় (সূরা আনফাল : ৩)

ঈমানী পরিপক্ষতার ফলে যখন মু'মিনের অন্তরে ভীতি সঞ্চায়িত হয় তখন তার ভিতর

তাক্‌ওয়ার বাতাস বইতে থাকে। ফলে আল্লাহ্ তা'লা তার দিকে তাকান এবং বলেন–"ঐ সমস্ত লোকের জন্য তাদের প্রভুর নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক রয়েছে। (সূরা আনফাল : ৪) এই পর্যায়ে মু'মিনদের আল্লাহ্ তা'লা আরো নৈকট্য দান করেন, আশ্রয় দেন হৃদয়ের কুটিরে। আর ভালোবাসার বাহু প্রসারিত করে ডেকে বলেন–যে কেউ মু'মিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে নর হউক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো এবং অবশ্যই আমরা তাদের সর্বোত্তম কৃত কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের পুরস্কার দান করবো। (সূরা আন্ নহল : ২৮)।

পাঠক বৃন্দ! অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড মিলিত হলে পানি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এদের মধ্যে পানির অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল এখনও তা আছে। পাথরের ভিতর পূর্বেও আগুন লুক্কায়িত ছিল বর্তমানেও আছে, ঘর্ষণ লাগলেই আগুন জ্বলে উঠে। খেজুর গাছে সুমিষ্ট রস পূর্বেও ছিল আজও আছে। প্রসেজ করে পানি বের করতে হয়। মাটির নীচে সুমিষ্ট পানি অতীতেও ছিল, আজও আছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেই পানি পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং হে মু'মিন আহমদীরা! পূর্বেও মু'মিনের কর্মের ভিতর বিজয় নিহিত ছিল। আজও মু'মিনের কর্মের ভিতর বিজয় নিহিত আছে। সে কর্মগুলো কি? তার সংক্ষিপ্ত রূপ এই। নিকট অতীতে মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। কিভাবে? (১) যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে। (২) এবং যারা সকল বৃথা কার্যকলাপ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩) এবং যারা যাকাত প্রদানে তৎপর। (৪) এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

অতএব হে আহমদীরা! যারা নিজেদের মু'মিন বলে দাবি কর, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতগুলোতে আশার বাণী দিচ্ছেন। নিকট অতীতেও এই ব্যবস্থা নিয়েই বিজয়ী হয়েছিল। তাই তোমরাও ঠিক একই পথ ধর বিজয়ী হবে। তো আসুন, আমরা সকলে উত্তম আদর্শ নিজের মধ্যে ধারণ করে এই পৃথিবীতে নিজেকে জীবিত রাখি।

সেরা জীব হয়েও কেন নই মানুষ,
হাত পা হলেই কি হয় মানুষ।
বিচার, বুদ্ধি পরে ভালোবাসা
আরোও তো আছে অন্যের সুখে সুখি হওয়া।

ইবাদতই কল্যাণলাভের সহায়ক

"আর আমি জিন-ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"

মৌ. এনামুল হক রনি

ইবাদত এর উদ্দেশ্যে মানুষ

মহান আল্লাহ্ পাক পরওয়ার দিগার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে সুন্দর করে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভীম' অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা মানুষকে বিবর্তনের সর্বোত্তম সৃজন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত্‌তীন ঃ ৫) আর এই সর্বোত্তম সৃষ্টিকে তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তাঁর ইবাদত করে। 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লিইয়া বুদুন' অর্থঃ আর আমি জিন ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৭)

আল্লাহ্ পাকের এই সর্বোত্তম সৃষ্টিকূল ইবাদত না করে নিজ খেয়াল খুশি অনুযায়ী পরিচালিত হলে সম্মান ও মার্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়ে নিকৃষ্টে পরিণত হবে এটা আশা করা যায় না।

সুতরাং মানুষ হিসাবে আমাদের উচিত, আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা। ইবাদত থেকে বঞ্চিত থেকে ফায়দা বা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

নবীরা ইবাদত শেখায়

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। আর নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা মানুষের সম্মুখে পেশ করেছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত খাতামান নবীঈন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ইবাদতের পরিপূর্ণতা দানকারী হিসাবে এসেছেন। তাই তিনি (সা.) হলেন, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র জগৎসমূহের জন্য রহমত। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রিয় ধর্ম

দান করেছেন 'ইসলাম'। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন বা ধর্ম হলো ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০)। তাই ইসলামী ইবাদত খোদা তা'লার নিকট সবচেয়ে বেশী গ্রহণ যোগ্যতা রাখে। নবীগণ এই ব্যবস্থার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

ইবাদত ছাড়া নিকৃষ্ট জীবন

এই ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষদের জন্য আল্লাহ্ সহজতর করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে 'ধর্মকে সহজতর করা হয়েছে'। তারপরও এই সহজকে অবহেলা প্রদর্শন পূর্বক সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট জীব হওয়া সত্তেও মানুষ নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হতে পারে। এর প্রকাশ হিসাবে একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, তাদের আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। (মিশকাত, কিতাবুল ইল্‌ম)। তাই আমাদেরকে ইবাদত এবং দোয়ার মধ্যে থাকতে হবে যেন সব ধরনের নিকৃষ্টতার কবল থেকে রক্ষা পাই।

আল্লাহ্‌ই ইবাদত শেখায়

আল্লাহ্ আমাদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাই আল্লাহ্‌র শেখানো দোয়া আমরা প্রত্যহ পড়ে থাকি। যেমন, নামাযে আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করি। এখানে কত সুন্দর করে বলা হয়েছে যে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন' অর্থঃ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' (সূরা ফাতেহা ঃ ৫) কি চমৎকার কথা! আল্লাহ্‌র কাছে বলা হচ্ছে, তোমারই ইবাদত করি আর এই ইবাদত কিভাবে করবো সেইসব কিছু তোমার নিকট চাই।

খোদার কাছে চাও

আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চাইতে শিখিয়েছেন এভাবে–'ইস্তায়িনু বিস্‌সাবরি ওয়াস্‌সালাত' অর্থঃ 'সাহায্য চাও ধৈর্য ও নামায এর মাধ্যমে'। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৪) এই ধৈর্য ও নামায এবং ইবাদতের নানান পদ্ধতি আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শুধু ধৈর্য বা চেষ্টার মাধ্যমে যেমন লাভ হয় না তেমনি শুধু দোয়া কিংবা শুধু তক্‌দীরের ওপর ভরসা করে বসে থাকলেও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–'ওয়াস্‌তায়েনু বিস্‌সাবরি ওয়াস্‌সালাত। ওয়া ইন্নাহা লা কাবিরাতুন ইল্লা আলাল খাশেয়ীন।' অর্থঃ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় বিনয় অবলম্বনকারীদের ছাড়া এটা বড়ই কঠিন। (সূরা বাকারা : ৪৬)

খোদার বান্দা খোদা চেনে

এই বিনয়ী বান্দারা মূলতঃ আল্লাহ্‌র ইবাদতগুজারী বান্দা। তাই এ সকল আল্লাহ্‌র বান্দাদের অনেক সময় মানুষ চিনতে পারে না কিন্তু আল্লাহ্ ঠিকই চিনে। পবিত্র কুরআনে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'আর রহমান (আল্লাহ্‌র) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম। এবং যারা তাদের প্রভূ-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটায়' (সূরা আল ফুরকান : ৬৪-৬৫)।

ইবাদতই বিনয়ী করে

তাহলে আল্লাহ্‌র বান্দাদের পরিচয় ইবাদতগুজারীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আর বিনয়ী বা বিনীত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। অপর একটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে 'আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয় সে তওবা করার (মাধ্যমে) পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হয়' (সূরা ফুরকান : ৭২)। পরিপূর্ণ তওবার মাধ্যমে মানুষ বিনয়ী বা বিনীত হতে পারে। আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) আমাদের জন্য দোয়া করতে করতে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে করতে পা ফুলে যেত।

মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ জাতি

তাই ইবাদত এর জন্য সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা চালানো মুসলমান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে এই মানুষের শ্রেষ্ঠজাতি হলো উম্মতে মুসলেমা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পাককালামে ইরশাদ করেছেন, 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন ওখরেজাত লিন্নাসি তা'মরুনা বিল মা'রুফে ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকারি ওয়াতুমিনুনা বিল্লাহ' অর্থঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ১১১)। শ্রেষ্ঠজাতির কাজ হলো মানব কল্যাণ করা, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

জ্ঞান শিক্ষা প্রশিক্ষণ

মুসলমানগণ শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি হিসাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাজ করার জন্য বা কল্যাণজনক কাজ করার জন্য সুদক্ষ ও পরিপক্কতা অর্জনের নিমিত্তে সময় সময় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন পড়ে। আর সেই প্রশিক্ষণ অর্জন করে দক্ষ হয়ে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয়। পাক কালামে এরূপ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর মু'মিনদের সবার পক্ষে এক যোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাদের প্রত্যেক জামা'ত থেকে একটি করে দল (কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে) কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্মে অধিক বুৎপত্তি লাভ করে এবং নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তাদের সতর্ক করে যেন তারা (ধ্বংস থেকে) রক্ষা পায়। (সূরা আত্‌তওবা : ১২২) এই আয়াত আমাদেরকে কোন অনুষ্ঠান, ইজতেমা, সম্মেলন বা জলসা সমূহে যোগদানের গুরুত্ব তুলে ধরছে, এ সমস্ত অনুষ্ঠান বা স্থানে যোগদান করে আমরা কল্যাণজনক জ্ঞান আহরণ করে মানব সেবায় লাগাতে পারি। তাছাড়া এসব মাহফিল সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে বা কোন স্থানে আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে বা রসূলের শিক্ষা থেকে যদি পড়ে শুনায় বা আলোচনা করেন তাহলে আল্লাহ্‌র রহমতের ফিরিশ্‌তারা তাদের পরিবেষ্টন করে দোয়া করতে থাকেন।

তাহলে আমাদের উচিত হবে, এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রশিক্ষণ নেয়া, তাহলে কল্যাণ লাভ করতে পারবো। আর যদি এর বিপরীত করা হয় বা অলসতা প্রদর্শন করা হয় তবে অকল্যাণ দ্বারা নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসে পতিত হতে হবে।

হুযূর (আই.)-এর বাণী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এক খুতবায় ইরশাদ করেছেন,... 'নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করা আবশ্যক। অন্যথায় যখন আল্লাহ্ তা'লার শেষ সিদ্ধান্ত ক্রিয়াশীল হবে। তখন অন্য কেউ সে পরিণামকে দূর করতে পারবে না। অন্যদের দৃষ্টান্তও সংশোধনের কারণ হয় এবং হওয়া উচিৎ। এটি আহমদীদের দায়িত্ব যে, হিসাবে নেয়া উচিৎ। যেন আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে সোজা পথে চলার সৌভাগ্য দান করেন। আমরা যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলতে পারি। আমরা যেন সর্বদা নিজেদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখতে থাকি এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের শুকরিয়া আদায় করি।" (৩০ অক্টোবর খুতবা জুমুআ ২০০৯)।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হুযূর (আই.)-এর ইচ্ছা সমূহ পুরা করার তৌফিক দিন।

ইসলাম ও মানবাধিকার

সিবগাতুর রহমান

ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কে সমকালীন ঘটনা সমূহের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ভাবে জনমনে এক বিরূপ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। আর এই বিতর্কের জন্যই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্ববাসীর কাছে মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিভিন্নভাবে দিবারাত্রি উপস্থাপন করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসাবে আমার এই ছোট্ট প্রয়াশ।

প্রত্যেক প্রাণীই প্রাকৃতিক ভাবে কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়। মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে প্রতিটি মানুষ যেসব অপরিহার্য অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাই মানবাধিকার, যা লংঘনের কোন সুযোগ কারো নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই জন্মগতভাবে এই অধিকার চূড়ান্তভাবে ভোগ করার অধিকারী। এই অধিকার সার্বজনীন, শ্বাশত, সহজাত ও চিরন্তন। এই অধিকার বিশ্বের কোন দেশ, গোষ্ঠী, দল, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি বিশ্বব্যাপী সকল জাগতিক সম্পর্কের সীমানা পেরিয়ে সকল মানুষের চিরন্তন অধিকার রক্ষায় আপোষহীন।

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এই অধিকার স্বীকৃত। মহান আল্লাহ যখন তাঁর ফিরিশ্‌তাগণকে মানব সৃষ্টির বিষয়ে নিজ পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন তখন কোন কোন ফিরিশ্‌তার আপত্তির জবাবের মধ্যেই এই অধিকারের ইশারা পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটোল, প্লেটো, প্রমুখের দর্শন তত্ত্বে মানব কল্যানের জন্য নীতিমালার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমান যুগে প্লেবিয়ানদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ করে দাস শ্রেণী সহ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মুক্তির জন্য সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের মানবতাবাদী আইন প্রণয়ন মানবাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের বদৌলতে প্রকৃত মানবাধিকারের গোড়াপত্তন হয়। দুনিয়ার প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদ মানবাধিকারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু পরবর্তিতে সূরা জুমায় মহান আল্লাহ্‌র ইশারা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে ইসলামের এই শ্বাশত মানবাধিকার সনদগুলো স্মৃতির পাতায় ঝাপসা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী ভিন্ন জনের ভিন্ন ব্যাখ্যায় ও ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়ে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রতিকূলতায় মানুষ আবার নিজেদের অধিকারের প্রতি সচেতন হতে থাকে। ১৩৫৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে বিনা বিচারে কাউকে সম্পত্তি হতে উচ্ছেদ, শাস্তি প্রদান বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে মানুষের অধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের দেশে দেশে এ জাতীয় ঘোষণাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মানবাধিকারের একটি সনদ ঘোষণার পরামর্শ আসে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করেন। সেই থেকে মানবাধিকারের এই সার্বজনীন ঘোষণা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র গ্রহণ করেন এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩০ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।

প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং অধিকার সমান। ৩-২১ এই ১৯টি অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। ২২-২৭ অনুচ্ছেদ ৬ টিতে ঘোষণা করা হয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, এবং ২৮-২৯ এ ২ টিতে ঘোষণা করা হয়েছে অধিকারের অপর দিক যে দায়িত্ব তার বিবরণ। মানবাধিকার সনদের ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধান বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে এখতিয়ার সম্পন্ন জাতীয়ভাবে কার্যকর বিচারালয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের কার্যকর প্রতিকার পাবার অধিকার থাকবে। মোদ্দা কথা, ব্যক্তির যে স্বতন্ত্র সত্ত্বা রয়েছে, রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের এই স্বতন্ত্র সত্ত্বা ক্ষুন্ন করার ক্ষমতা নেই।

ইসলামে মানবাধিকার এর নামের মধ্যেই নিহিত। ইসলাম আরবি শব্দ যার অর্থ হল শান্তি, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন 'হে মানবজাতি, আমরা একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এবং আমরা ইহাকে উপ-জাতি এবং উপ-গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অন্যকে জানতে পার'। পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবতার জন্য চিরন্তন ভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়।

ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খৃষ্টাব্দে বিদায় হজ্জের ভাষনে লক্ষাধিক জনতার সামনে এই ঘোষণা করেন যে, 'আপনারা সকলেই সমান। সকল মানুষ সে যে জাতি বা উপজাতিরই হোকনা কেন, আর যে যেখানেই থাকেন না কেন সকলেই এক সমান। আল্লাহ আপনাদেরকে একে অন্যের সাহায্যকারী হিসাবে বানিয়েছেন সুতরাং কোন বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না। একজন আরবের কোন অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নাই তেমনি একজন অনারবেরও কোন আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নাই, কিংবা একজন সাদার ওপরে কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই তেমনি একজন কালোর উপরে সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই'। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দুই হাত ওপরে তুলে এক হাতের আঙ্গুলের ওপর আরেক হাতের আঙ্গুল রেখে সকলকে দেখিয়ে বলেন, যেমন দুই হাতের আঙ্গুলগুলো সমান তেমনি আজ থেকে তোমরাও সমান ও এক অন্যের ভাই। শুধু মুসলমানের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য মূলত এখান থেকেই মানুষে মানুষে সাম্যের যাত্রা শুরু। মহানবী (সা.) আরো বলেন, মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান আল্লাহ্‌র দান তাই কারো জীবন নেয়া, কারো সম্পত্তি দখল করা ও সম্মানে আঘাত করা অন্যায়।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের অধিকার নিয়ে রসূল (সা.)-এর শিক্ষা ছিল এমন যে, এক দল খৃষ্টান প্রতিনিধি যারা আরবের নজরান থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল নবীজি তাদেরকে মসজিদে নববী-তে তাদের মত করে ইবাদতের অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী তাঁর লিখা 'শিরাজুম মুনির' পুস্তকে উল্লেখ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দেখে কোন হিন্দু বাড়িতে আগুন লেগেছে আর সে এই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেনি সে আমার সম্প্রদায়ভূক্ত নয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দেখে অন্যায় ভাবে কোন খৃষ্টানকে কেউ হত্যা করতে যাচ্ছে আর সে তাকে বাঁধা দেয় না বা অত্যাচারিতকে সাহায্য করে না সে আমার সম্প্রদায়ভূক্ত নয়। প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর এই লেখায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে চিত্র ফুটে উঠে এটাই হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আজ ইসলামের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচকদের জবাবে বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও লেখনির মাধ্যমে নিয়মিত এর জবাব দিয়ে যাচ্ছেন এবং সাথে সাথে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাদের কাছে উপস্থাপন করে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন।

জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলির সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাষ্টিস এর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্থানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি জনাব স্যার জাফর উল্লাহ খান এ বিষয়ে তার লেখা একটি চমৎকার পুস্তক 'ইসলাম এন্ড হিউম্যান রাইটস'-এ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সার্বজনিন ঘোষণার সকল বিধিসমূহের তুলনা করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পড়ে দেখার জন্য সকল দার্শনিক, লেখক ও সমালোচকদেরকে আন্তরিক আহবান জানিয়েছেন। প্রত্যেকে তার নিজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ভিন্ন মতাবলম্বি রাজনৈতিক অবস্থান, জাতীয় বা সামাজিক অবস্থান, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্যান্য অবস্থা হিসাবে কোন ধরনের পার্থক্য ছাড়া সমঅধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবাধিকার এবং ইসলামের মূল শিক্ষা।

তবে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় আজ থেকে ৬৬ বৎসর পূর্বে বিশ্বে এই স্বীকৃতি এলেও সার্বজনীন মানবাধিকারের নাজুক অবস্থা বিশ্বে আজও বিদ্যমান। সমসাময়িক বিশ্বে আইনের এই বাণী খাতায় আছে কিন্তু মাথায় নাই। মানবাধিকার রক্ষায় অভিভাবকত্বকারী দেশগুলো মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী দায়ী। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো প্রতিনিয়ত নিজ দেশে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোতে বিভিন্ন ভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের নামে তা লংঘনের প্রতিযোগিতায় ভয়ংঙ্কর ভাবে মেতে আছে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও দূর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও দুর্বলের অধিকার হরণের ব্যাধি আজ চরমে।

আজকের বিশ্বে মানবিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশী শিকার বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো। ফিলিস্তিন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, পাকিস্তানসহ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে বহির্বিশ্বের অমানবিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীনভাবে ধর্মের নামে মানবাধিকার চরম ভাবে লংঘিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাজের অংশ হিসাবে বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বাংলাদেশের জাতীয় ও সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে মানবাধিকার লংঘনের যে চিত্র আজ দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ব্যাপারে কথা বলা কমিশনের অবশ্যই উচিৎ। শুধু উচিত নয় বরং কর্তব্য ও প্রাপ্ত দায়িত্বের অংশ।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী প্রকৃত মানবাধিকার সংরক্ষণ করে ইসলামের আসল সৌন্দর্য জগতের সামনে উপস্থাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

তথ্য সূত্রঃ
শিরাজুম মুনির, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)
ইসলাম এন্ড হিউমেন রাইটস, স্যার জাফর উল্লাহ খান
দি মুসলিম টাইমস

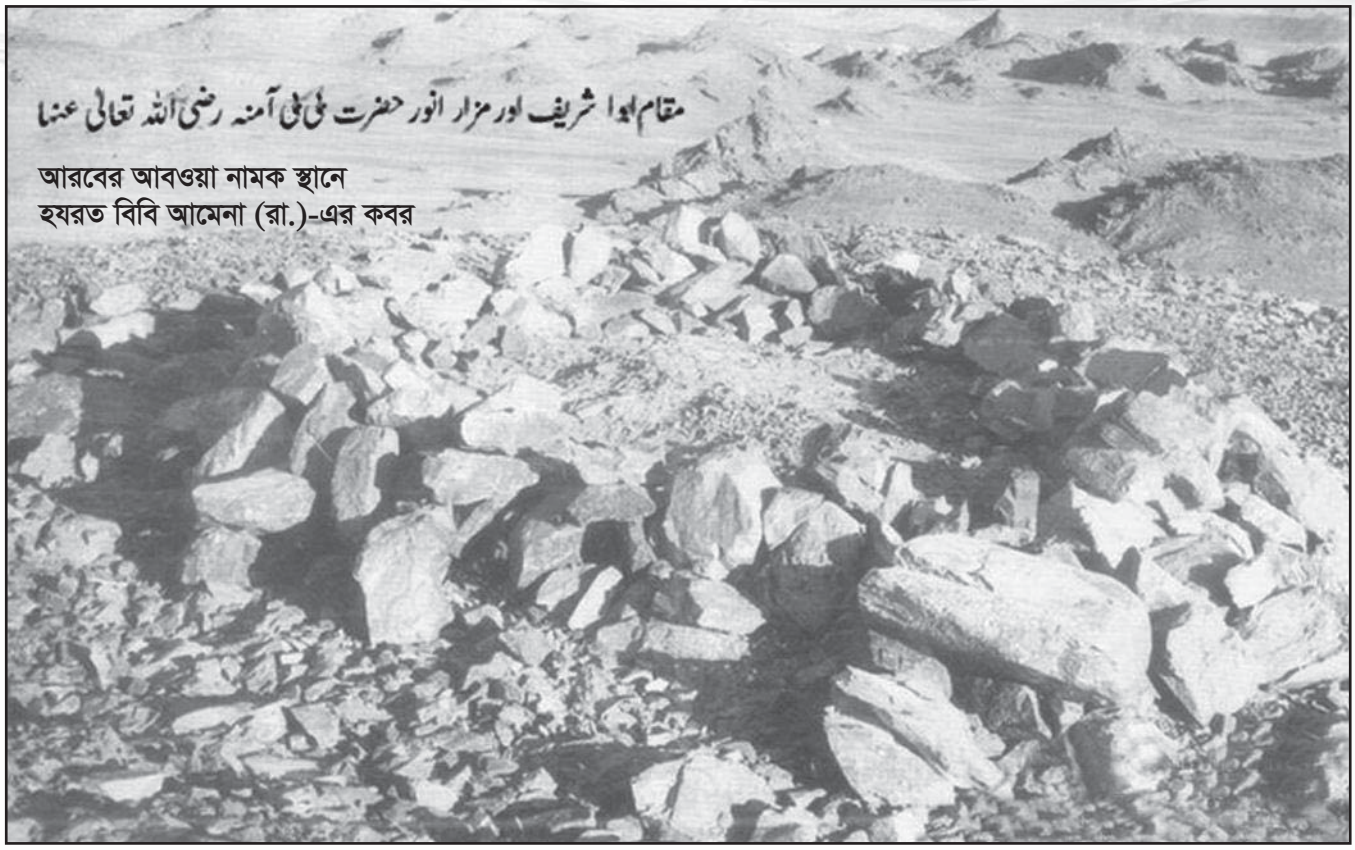

আরবের আবওয়া নামক স্থানে
হযরত বিবি আমেনা (রা.)-এর কবর

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শৈশব কালের পাক-পবিত্র দিনগুলো

মৌ. লুৎফর রহমান

সৌভাগ্যসহ শিশুর জন্ম

আসহাবে ফীল এ ঘটনার পঁচিশ দিন পর ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে মোবারক সকাল বেলা যা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। ফীলের ঘটনার এত কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্মগ্রহণ হওয়া নি:সন্দেহে একটি ঐশী ইঙ্গিত বহন করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা কাবার বিপক্ষে এই প্রকাশ্য হামলাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র ধর্মের মোকাবেলায় মিথ্যা উপাস্যের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় আসছে। বাচ্চার জন্ম হতেই মা আমিনা তার বাবা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে সংবাদ পৌঁছান। তিনি সংবাদ শুনামাত্রই অনতিবিলম্বে আনন্দের আতিশয্যে আমিনার কাছে চলে আসেন। আমিনা তার সামনে বাচ্চাকে দিলেন আর বললেন আমি এক স্বপ্নের মধ্যে তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' দেখতে পেয়েছিলাম। আব্দুল মুত্তালিব বাচ্চাকে নিজের হাতে উঠিয়ে বায়তুল্লায় (আল্লাহ্‌র ঘর কাবা) নিয়ে গেলেন। সেখান গিয়ে খোদা তা'লার শুকরিয়া আদায় করলেন আর বাচ্চার নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ' যার অর্থ সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য। তারপর তাঁকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

মহানবীর দুধপান

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রথম দিকে তাঁর মা আমিনা তারপর সাওবীয়া দুধপান করানোর জন্য স্থায়ীভাবে হালীমার ওপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হালীমার জানা হয়ে গেল, যে বাচ্চা তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর ভাগ্য খুবই উন্নত। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আসার আগে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। কিন্তু তাঁর আগমনের সাথে সাথেই অবস্থা পাল্টে যেতে লাগলো। আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে বরকত দেখা দিতে লাগলো। হালীমার ছেলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে দুধপান করতো তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার এক বড় বোনও ছিলো যার নাম শীমা। মুহাম্মদ (সা.)কে তিনি খুব ভালোবাসতেন। হালীমাও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, আদর ও স্নেহ করতেন। গোত্রের সব মানুষও মুহাম্মদ (সা.)কে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতো।

শৈশবে কাশ্‌ফের দৃশ্য

যখন মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স চার বছর হয় তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে হালীমার শংকা বাড়তে থাকে। মক্কায় নিয়ে এসে তাঁকে মায়ের হাতে তুলে দেন। এ ঘটনা ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি (সা.) তাঁর দুধভাইদের সাথে

খেলছিলেন। (সেই সময় কোন বড় ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিলো না)। হঠাৎ দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখা গেল। তারা মুহাম্মদ (সা.)কে ধরে মাটিতে শোয়ায়ে দিয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর (সা.) দুধভাই আব্দুল্লাহ্ বিন হারিস দৌড়ে গিয়ে তার মা বাবাকে জানায় যে, আমার কুরাইশী ভাইকে ধরে দুই ব্যক্তি বুক চিরে ফেলেছে। হারিস আর হালীমা এ কথা শুনতেই দৌড়ে এসে দেখেন যে, কোন ব্যক্তিতো সেখানে নেই কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এক ভীতগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং চেহারার রং পরিবর্তিত হচ্ছে। হালীমা সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কি হয়েছিলো? মুহাম্মদ (সা.) পুরো ঘটনা খুলে বলেন যে, তারা কোন বস্তু আমার বুকে অনুসন্ধান করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর হালীমা আর হারিস তাঁকে তাদের তাবুতে নিয়ে গেলেন এবং হারিস হালীমাকে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে যে, এই ছেলের কিছু একটা হয়ে গেছে, তাই এটাই সঠিক কাজ হবে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে আসি, সুতরাং হালীমা মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কায় নিয়ে এসে আমিনার হাতে তুলে দিলেন। আমিনা এত তাড়াতাড়ি আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হালীমা তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন এবং এই শংকা প্রকাশ করেন যে হয়তবা এই ছেলের ওপর কোন জ্বীন বা অন্য কিছুর আসর পড়েছে। এই কথা শুনার পর আমিনা বলেন যে, কখনই হতে পারে না। আমার ছেলে অনেক মর্যাদার অধিকারী। যখন সে গর্ভে ছিলো তখন আমি (স্বপ্নে) দেখেছিলাম যে, আমার ভিতর থেকে একটি নূর বের হয়ে অনেক দূরবর্তী দেশসমূহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-৯৬)

দুধ মায়ের সাথে উত্তম আচরণ

যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স চার বছর হয়, হালীমা তাঁর মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এ চার বছরের সেবা হালীমার জন্য কোন সাধারণ সেবা ছিলো না। আর মুহাম্মদ (সা.) ছোট থেকে ছোট সেবাকেও ভুলতেন না। তিনি সারা জীবন হালীমার এই খেদমতকে মনে রেখেছেন এবং সব সময় তার সাথে খুবই উন্নতমানের আচরণ করে দেখিয়েছেন। যখন একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর হালীমা মক্কায় আসেন তো তিনি তাকে চল্লিশটি ছাগল এবং একটি উট দান করেন। নবুওয়ত কালীন সময়ে তিনি (হালীমা) একবার আসেন, তাকে দেখতেই আমার মা, আমার মা, বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চাঁদর খুলে তার নিচে বিছিয়ে দেন। তারপর এক যুদ্ধে (হুনাইনের যুদ্ধ) হাওয়াযিন গোত্রের হাজার খানেক যুদ্ধবন্ধী হয়ে আসে। তিনি (সা.) (হালীমার) আত্মীয়তার কারণে সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছেন আর এক পয়সাও যুদ্ধ বন্ধীদের কাছ থেকে ফিদিয়া নেন নাই। তাঁর এক দুধ বোনকে (যিনি যুদ্ধবন্দী) হয়ে এসেছিলেন পুরস্কারস্বরূপ মালামালসহকারে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মা আমিনার জিম্মাদারী এবং ইয়াসরিব সফর

যখন হালীমা মুহাম্মদ (সা.)কে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিলো চার বছর। এরপর থেকে তিনি মায়ের জিম্মাদারীত্বে থাকেন। যখন তাঁর বয়স ছয় বছর হয় তখন আমিনার আত্মীয় স্বজন বনু নাজারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য ইয়াসরিব যান আর মুহাম্মদ (সা.)কেও সাথে করে নিয়ে যান। উম্মে আইমানও সাথে ছিলেন। হয়তবা এই সফরে আমিনা তাঁর মরহুম স্বামীর (আব্দুল্লাহ্) মাজার দেখারও কারণ ছিলো। যাইহোক, তিনি ইয়াসরিবে যান আর সেখানে কমপক্ষে একমাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। মুহাম্মদ (সা.) সারাজীবন এই সময়টাকে মনে রেখেছেন। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-৯৭)

শৈশবে খেলা করা এবং সাঁতার কাটা

প্রায় ৫০ বছর পর যখন মুহাম্মদ (সা.) হিজরত করে মদীনায় যান তো সাহাবাগণকে সেই বাড়ি বা বাসস্থানের কথা বলেন যেখানে তিনি তাঁর মায়ের সাথে অবস্থান করেছিলেন। আর সেই জায়গার কথাও বলেন, যেখানে তিনি মদীনার বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধূলা করতেন। আর পুকুরও দেখিয়েছেন যেখানে তিনি সাঁতার কেটেছিলেন। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-৯৮)

মা আমিনার মৃত্যু

প্রায় এক মাস অবস্থানের পর আমিনা মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে ফেরত আসছিলেন। কিন্তু স্বামীর মতই তার মৃত্যু সফরের মধ্যেই হয়ে যায়। পথের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আবওয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। নবুওয়তকালীন সময়ে যখন তিনি একবার সেই স্থানে দিয়ে অতিক্রম করেন তখন মায়ের কবরেও যান আর তা দেখে তাঁর (সা.) চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-৯৮)

আব্দুল মুত্তালিবের জিম্মাদারীত্বে মুহাম্মদ (সা.)

মায়ের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ (সা.)-এর সেবিকা উম্মে আইমানের সাথে মক্কায় পৌঁছান। মক্কায় পৌঁছতেই দাদা আব্দুল মুত্তালিব সরাসরি নিজের জিম্মায় নিয়ে নেন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে খুব আদর করতেন। যখন তিনি খানা কা'বার তওয়াফ করতেন তো তাঁকে কাঁধের ওপর বসিয়ে নিতেন। মুহাম্মদ (সা.)-ও দাদার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। আব্দুল মুত্তালিবের অভ্যাস ছিলো যে, কা'বার প্রাঙ্গনে চাদর বিছিয়ে বসতেন। তখন কারো সাহস হতো না চাদরে তার সাথে অন্য কেই বসতে পারে। এমনকি আব্দুল মুত্তালিবের আপন ছেলেও সরে বসতেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় ভালোবাসার জোশের কারণে সোজা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বসতেন।

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু

এই স্নেহ ভালোবাসার মধ্যে মুহাম্মদ (সা.)-এর দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। ঠিক এই মূহুর্তে আব্দুল মুত্তালিবেরও মৃত্যুর পয়গাম এসে গেল। আর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। যখন তার জানাযা হয় মুহাম্মদ (সা.) লাসের সাথে সাথে ক্রন্দন করে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের তৃতীয় আঘাত যা তাঁকে শৈশবকালে সহ্য করতে হয়েছে। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আট বছর। মারা যাওয়ার সময় আব্দুল মুত্তালিব তার আদরের নাতি মুহাম্মদ (সা.)-কে আবু তালেবের হাতে সোপর্দ করে যান আর তাঁকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখার জন্য ওসীয়্যত করে যান। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-৯৯)

সিরিয়া সফর এবং বাহীরা নামক খৃষ্টান ধর্ম যাজকের ঘটনা

মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স যখন ১২ বছর হয় আবু তালেবের এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সিরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু সফর দীর্ঘ এবং কঠিন ছিলো এ কারণে তিনি মনস্থ করলেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কাতেই রেখে যাবেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) চাচা আবু তালেবকে জাপটে ধরে কাঁদতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে আবু তালেবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং তার মন গলে

গেল। আর তাঁকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। সিরিয়ার দক্ষিণে বসরা নামক একটি বিখ্যাত জায়গা রয়েছে। সেখানে পৌঁছার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেই জায়গায় একজন খৃষ্টান রাহেব (ধর্মযাজক) বাস করতেন। তার নাম বাহিরা। যখন কুরাইশের কাফেলা তার দরবারের নিকট পৌঁছে তো তখন সেই রাহেব কাশ্‌ফে (দিব্য দর্শনে) দেখতে পান যে, সমস্ত পাথর আর গাছ তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়ে গেছে। তার জানা ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একজন মহান নবী প্রেরিত হবেন। এজন্য তিনি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝে গেলেন যে, এই কাফেলায় সেই নবী নিশ্চয়ই থাকবেন। তাই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেহারা দেখেই চিনতে পারলেন। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-১০০)

মুহাম্মদ (সা.)-এর মেষ চড়ানো

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন তখন নিয়মানুসারে আবু তালেবের কাছেই থাকতেন। যেহেতু চাচাদেরকে সচরাচর আরবদেশে মেষচড়ানোর কাছে লাগিয়ে দেয়া হতো। এ কারণে সে যুগে তিনিও কখনো কখনো এ কাজ করেছেন। আর যখন নবুওয়ত লাভ করেন তখন বলতেন যে, মেষচড়ানোও নবীগণের সুন্নত। তাই আমি মেষ চড়িয়েছি। এক সফরে তাঁর সাহাবারা জঙ্গলে 'পীলু' (একপ্রকার বৃক্ষ যার ডাল দ্বারা মেসওয়াক তৈরী হয়) জমা করে খেতে লাগলেন এটা দেখে তিনি তাদের বললেন, কালো কালো পীলু খুঁজে বের করে খাও। কেননা আমি যখন মেষ চড়াতাম তো তখনকার আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে সে কাল রঙয়ের পীলু অনেক বেশী ভাল হয়ে থাকে। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-১০৩)

খারাবি থেকে আল্লাহ্ তা'লার হিফাযত

সে সময়ে একটি ঘটানা রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) একরাতে স্বীয় সাথীকে বলেন, (যে মেষচড়ানোর কাজে তাঁর অংশীদার ছিলো) তুমি আমার মেষগুলোর প্রতি খেয়াল রেখো যাতে করে আমি শহরে গিয়ে লোকদের মজলিস দেখে আসতে পারি। সেই সময় রেওয়াজ ছিলো যে, রাতের বেলা লোকেরা কোন ঘরে জমা হয়ে গল্প শুনতো আর গান বা কবিতা ও গজলের আসর বসাতো। আবার কখনো তাতে সারাটি রাত অতিবাহিত করে দিত। মহানবী (সা.) ও শৈশবে কৌতুহল বসত এই ধরণের তামাশার মজলিস দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিকট এইসব বৃথা কাজে খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর অংশগ্রহণ পছন্দ করেন নাই। তাই তিনি (সা.) একস্থানে যান কিন্তু রাস্তায়ই ঘুম চলে আসে আর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েই থাকেন। আরেকবার তিনি যাওয়ার পরিকল্পনা করেন কিন্তু এবারও অদৃশ্য শক্তি ধাঁধা দেয়। নবুওয়তের যুগে মহানবী (সা.) বলতেন, আমি সারাজীবনে শুধুমাত্র দুই বার এই ধরণের মজলিসে অংগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছি কিন্তু দুইবারই আমাকে বাঁধা দিয়ে রাখা হয়েছে। (সীরাতে খাতামান নাবীঈন সা. পৃষ্ঠা-১০৩)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছোট বেলাতেও বিনয়ী ছিলেন

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) বিনয়ী ছিলেন। তাঁর চাচী তো তাঁকে (সা.) খুব বেশি ভালোবাসতেন না। আর না তাঁর দাদা তাকে (চাচী) তাঁর (সা.) সম্পর্কে কোন ওসীয়্যত করেছিলেন। আর না মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে চাচীর কোন রক্তের সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, চাচী তাঁর সাথে কোন ধরণের কঠোরতা করেছেন। তাঁর চাচী ঘরে যখন কোন জিনিষ বাচ্চাদের মধ্যে বন্টন করতেন তো সবার আগে নিজের বাচ্চাদেরকে দিতেন হয়ত বা এজন্য যে তারা ছোট ছিলো। এই সময় সব বাচ্চারাই নিজের মায়ের সাথে চিমটে থাকে আর বলে, আমাকেও দাও। কিন্তু রসূল করীম (সা.) এক পাশে বসে থাকতেন আর এই গোলমাল বা চেঁচামেচিতে অংশ নিতেন না। কখনও কখনও এমন অবস্থায় চাচা আবু তালেবও এসে যেতেন আর তাঁকে একদিকে বসে থাকতে দেখে আবু তালেব মনে করতেন হয়ত বা এই ছেলের ধারণা জন্মেছে যে, এই ঘরে আমার কোন অংশ নেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর (সা.) এর এভাবে বসে থাকা বিনয়াবনতার কারণে ছিলো যা তিনি শৈশবেই লাভ করেছিলেন। যাইহোক আবু তালেবের হৃদয়ে ভালোবাসার জোশকে নাড়িয়ে দিতো আর তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে ধরে সামনে নিয়ে আসতেন।

(তফসীরে কবীর, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অনেক বেশি আশিস, রহমত ও বরকত দান করুন। আর তাঁকে চিরকালের জন্য জীবিত রাখুন, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

ওয়াকফে জাদীদের ২০১৫ সালের বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) গত ৯ জানুয়ারি-২০১৪ জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের ৫৮তম বৎসরের ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগের আহমদীগণের চাঁদা আদায় ও মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং বর্তমান সময়ে মালী কুরবানীর কল্যাণের কথা যারা ওয়াক্‌ফে জাদীদের গত বৎসরের চাঁদা আদায় করেছে, যারা পূর্বের বৎসরের চাঁদা আদায় করেছেন তাদের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেছেন এবং তাদের রিজিকে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য, আমরা আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.)-এর টার্গেট পূর্ণ করতে সক্ষম হই নি। এই বছর আমাদের প্রত্যেকের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে সক্ষম হই এবং হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি। হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জামা'তের কেহই যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন। প্রয়োজনে বছরে ১০ (দশ) টাকা দিয়ে হলেও অংশগ্রহণের জন্য বলেছেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২০ মার্চ ২০১৫ সালের মধ্যে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেট তৈরী করে (নাম ও টাকার পরিমাণসহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, মার্চের শেষ সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.)-এর নিকট পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবগণের এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের সহযোগিতা কামনা করছি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
মোবাইল: ০১৭১৪-০৮৫০৭০, ০১৭৩০-০২৮৫৭৬

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশ তৈয়ব আলী

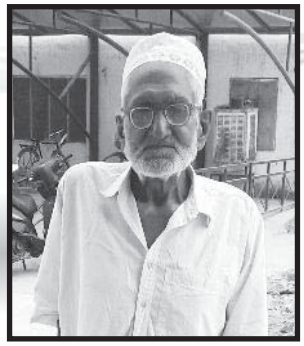

দরবেশ তৈয়ব আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার বেতাল গ্রামের এক আশেকে মসীহ্ ছিলেন মির্যা আলী আখন্দ। তিনি ১৯৩৫ সালে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পর জামা'তের কাজে ফানাফিল্লাহ হয়ে যান। নিজ এলাকায় আহমদীয়াতের সুসংবাদ প্রচারে নিয়োজিত হন। ১৯৩৮ সালে প্রেমারচর গ্রামের মৌলভী আবু মূসা ফজলুল করীম, মৌলভী আবু ঈসা, মৌলভী আবু তাহের এবং মৌলভী তালেব হোসেন সাহেব বয়আত করে আহমদী হওয়ার পর এলাকায় আহমদীয়াতের চর্চার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম জগতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে বিরোধিতা শুরু হয়। বিভিন্ন গ্রামে আহমদীদের সাথে অ-আহমদী বড় বড় মাওলানাদের বহাস হয়।

১৯৩৯ সালে চরখান্দালিয়া গ্রামে ও বৈড়াগিরচর বাজারে অনুষ্ঠিত বহাসে বিরুদ্ধবাদী মাওলানারা পরাভূত হলে এলাকার আহমদীয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পরে। ১৯৪০ সালে প্রেমারচর গ্রামে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বহাসের অনুষ্ঠানটি ছিল জঙ্গে বদরের আদর্শে সমুজ্জ্বল। স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইমাম উদ্দিন মাষ্টার আহমদীদের সাথে বহাস করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনিসিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা তাজুল ইসলামকে নিয়ে আসেন এবং আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের সাথে বহাস হয়। এতে মাওলানা তাজুল ইসলাম যুক্তি তর্কে পরাভূত হন। সত্যের কাজে মিথ্যার পলায়ন হয়।

আর এ সব বহাসের অনুষ্ঠানে যারা উপিস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পবিত্র চিত্তের মানুষের মনে আহমদীয়াতের সত্যতা যাচাইয়ের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একজন প্রেমারচর গ্রামের আব্দুল বারী সাহেবের ছেলে তৈয়ব আলী।

তৈয়ব আলী সাহেব ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় ভাই ও এক বোনের মধ্যে পঞ্চম। তাঁরা হলেন– (১) মোহাম্মদ কেরামত আলী, (২) মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দীন, (৩) ফুল বানু, (৪) মোহাম্মদ সায়েম উদ্দীন, (৫) মোহাম্মদ নূরুদ্দীন, (৬) তৈয়ব আলী এবং (৭) হাফেজ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ।

তাঁর জন্মের পর মাতাপিতা আদর করে ইসলামী আকিদায় নাম রাখেন তৈয়ব আলী। যেন পবিত্র চিত্তের মানুষ হন। তাই তিনি শৈশব থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় তাক্ওয়াপরায়ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। কাজীর চর মাদ্রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়ন করে ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেন। সহোদর ভাই বোন এবং গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়ের সাথে বড় হন। বহাসের অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে আহমদীয়াতের সত্যতা আহরণে অনুরাগ জাগে। তাই মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনের রক্ত চোখের আড়ালে বিভিন্ন আহমদীদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাবের সত্যতা তাঁর পবিত্র মনে দানা বাঁধে।

পরবর্তীতে তিনি জীবিকার অন্বেষণে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে চাকুরী নেন। তখন আহমদীদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। বকশীবাজার দারুত তবলীগে আসা যাওয়া করতেন। সে সময় দারুত তবলীগে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী, সদর মুরব্বী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি মাওলানা সাহেবের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করেন। অবশেষে তাঁর হাতে ১৯৪৫ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী যামানায় আবির্ভূত ইমামুজ্জামানের আনুগত্য স্বীকারে সীরাতাল মোস্তাকিমের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন (সূরা আল্ আনকাবুত : ৭০)। আর শান্তি নিবাসের দিকে আল্লাহ্ তোমাদের ডাক দেন এবং তিনি যাকে চান সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন (সূরা ইউনুস : ২৬)। তিনি যাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বেঁচে নেন এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী (আলে ইমরান : ৭৫)। তৈয়ব আলী সাহেব আল্লাহ্ তা'লার সেই কল্যাণের অধিকারী হন।

তিনি ঢাকায় বয়আত করে নিজ বাড়ি প্রেমারচর গেলে আত্মীয়-স্বজন সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। বড় ভাই নুরুদ্দীন তাকে বেদম পিটায়। অনেক শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এলাকার মৌলভীরা কাদিয়ানী কাফের হয়ে গেছে বলে কুফরী ফতোয়া দেয়। কাদিয়ানী ছাড়ার জন্য মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। তখন প্রেমারচর গ্রামের সতীর্থ আহমদীরা তাঁর প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশে এগিয়ে আসেন। তাঁকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁকে অভয়বাণী শুনান। জামা'তের তালিম তরবিয়তে পবিত্র কুরআনের আলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়– নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাজ হতে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের নিকট হতেও তোমরা নিশ্চয় পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহলে এটা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হবে (সূরা আলে-ইমরান ১৮৭)।

অবশেষে তৈয়ব আলী সাহেব নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাওলানা তালেব হোসেনসহ অন্যান্য আহমদীদের পরামর্শক্রমে ঢাকা বকশীবাজার চলে আসেন। তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান

সাহেব মৌলভী মোবারক আলীর নিকট নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা খোলে বলেন। তখন আমীর সাহেব জামা'তের নায়েব আমীর খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবসহ অন্যান্যদের পরামর্শক্রমে তাঁকে ১৯৪৬ সালে কাদিয়ানে যাবার ব্যবস্থা করেন। ফলে খোদার পথে ঘর ছাড়া তৈয়ব আলী কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেমগণের সান্নিধ্যে নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন। জামা'তের খেদমতে নিজেকে পেশ করা হয়।

এরই মাঝে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কাদিয়ানে জামা'তের সম্পদ রক্ষায় দরবেশের আহ্বান করলে বাঙালি যুবক তৈয়ব আলী নিজেকে সোপর্দ করেন। তিনি অন্যান্য দরবেশগণের সাথে জীবন বাজী রেখে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

১৯৫০ সালে তৈয়ব আলী সাহেব ভারতের কেরেলায় বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম আমেনা বেগম। এ ধর্মপ্রাণ মহিলা আজীবন স্বামীর সুখে দুঃখের সাথী হয়ে আছেন। সহধর্মিণীর মাঝে সহমর্মীতার আদর্শ পরিস্ফুটিত। তাদের এক কন্যা সন্তান আছে। তাঁর নাম আয়েশা বেগম। তিনি মাতাপিতার আদর্শগত শিক্ষায় ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে সকলের প্রশংসিত।

তৈয়ব আলী সাহেব ১৯৬২ সালে নাড়ীর টানে একবার তার জন্মভূমি প্রেমারচর গিয়েছিলেন। তখন আত্মীয়-স্বজন দীর্ঘদিন পর তাঁকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। আহমদীয়াতের কারণে এক সময় যারা তাঁর সাথে বৈরিতা করেছিলেন তারাই রক্তের টানে বুকে জড়িয়ে ধরেন। পৈতৃক সম্পত্তির অংশ গ্রহণে বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ জানান। কিন্তু কাদিয়ান পাগল তৈয়ব আলীর নিকট পার্থিব জীবনের সব কিছুই তুচ্ছ। তিনি উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা– পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? (আল আনআম, ৬:৩৩)। তাই ক'দিন পরই তিনি কাদিয়ান চলে যান।

তৈয়ব আলী সাহেব কাদিয়ানে দরবেশের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পর জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরি করেছেন। অবসর সময়ে দারুল মসীহর সামনে দুধের ব্যবসা করতেন। পরবর্তীতে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

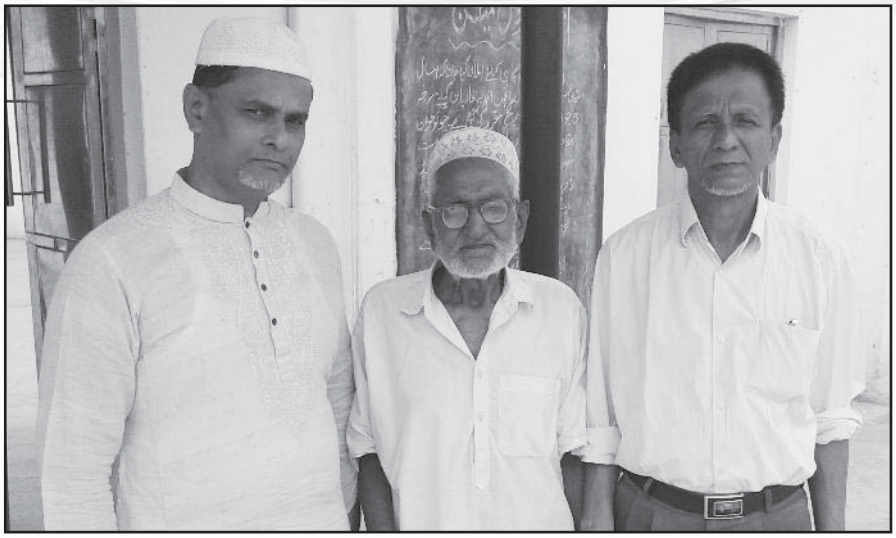

ছবিতে বাম দিক থেকে– নাসির উদ্দিন মিল্লাত, দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেবসহ লেখক

দোয়ার এক পাগল তৈয়ব আলী সাহেব। তিনি সর্বদা বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। তাহাজ্জুদ নামাযে হৃদয় নিংড়ানো দোয়া করা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই দোয়া কবুলিয়তের অসংখ্য আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। নিম্নে এর একটি প্রণিধানযোগ্য ঃ–

একবার তিনি হাঁটুর গিরার ব্যথায় অচল হয়ে যান। দু'পায়ে ভড় করে দাঁড়ানো সম্ভব হতো না। ফলে দরুল মসীহের আযানের ধ্বনী শুনে মসজিদ মোবারক ও মসজিদ আকসায় নামায আদায়ে উপস্থিত হতে পারতেন না। প্রাত:ভ্রমণে বেহেশতী মাকবেরায় গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সহ অন্যান্য বুযর্গদের কবর জেয়ারত করা সম্ভব হয়নি। এটা তাঁকে ভীষণ পীড়া দেয়। তাই চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের নিকট গেলে ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দেন এবং তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা বলেন। তখন তিনি ভাবেন এত টাকা ব্যয়ে অপারেশনে যদি কৃতকার্য না হয় জামা'তের টাকার ক্ষতি হবে। তাই তিনি অপারেশন করতে সম্মত হন নি। খোদার দরবারে দোয়ার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করেন এবং দোয়ায় নিয়োজিত হন। বাসায় শুয়ে শুয়ে চোখের পানি ফেলে দিনরাত দোয়া করতে থাকেন। তাহাজ্জুদ নামাযে বিগলিত চিত্তে হৃদয় নিংড়ায়ে দোয়া করেন। অবশেষে একরাতে স্বপ্নে দেখেন– "তাঁর গৃহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শুভাগমন হয়। তিনি (আ.) বেহেশতী মাকবেরার গুল্মলতা গাছের পাতা হাঁটুতে মালিশ করার জন্য নির্দেশ দেন।" অতঃপর তিনি উক্ত গাছের পাতা এনে হাঁটুতে মালিশ করেন এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হন। তিনি চলাফেরা করতে পারেন। তাঁর এ আরোগ্য লাভ একটি মোজেযা ও ঐশী নিদর্শন। কাদিয়ানের বিভিন্ন আহমদীর নিকট দোয়া কবুলিয়তের এটি আশ্চর্যজনক ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত।

বলাবাহুল্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আব্দুল করিম নামে জামেয়া আহমদীয়ার এক ছাত্রকে পাগলা কুকুরে কামড়ালে তার জলাতঙ্ক রোগ হয়। তখন জলাতঙ্ক রোগীর বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। তাই ছেলেটির আরোগ্যের জন্য দোয়ার আরজ করা হলে হুযূর (আ.) তার জন্য খাস দোয়া করেন এবং দোয়ার আশ্চর্যজনক নিদর্শনস্বরূপ তিনি সুস্থ হয়ে যান। তেমনি আশেকে মসীহ্ তৈয়ব আলী সাহেব হুযূর (আ.)-এর দোয়ার আদর্শে স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ পালনে আরোগ্য লাভ করেন।

বঙ্গবীর, দরবেশে কাদিয়ান, খোদার রাহে জীবন উৎসর্গকারী এবং দোয়া কবুলিয়তের ঐশী নিদর্শন প্রাপ্ত বিশিষ্ট বুযুর্গ তৈয়ব আলী সাহেব ৮৭ বছর বয়সে বর্তমানে জীবত আছেন। কাদিয়ানে দারুল মসীহর সামনে জামা'তের কোয়ার্টারে স্বপরিবারে বসবাস করেন। জামা'ত থেকে তিনি অবসর ভাতা পান। দরবেশে কাদিয়ান হিসাবে বর্তমানে যে ১৮/২০ জন জীবিত আছেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। বাঙালি দরবেশ হিসাবে কাদিয়ানে একমাত্র তিনিই আছেন।

এ বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী দারুল মসীহতে আযানের ধ্বনী হলে এখনও নিয়মিত ছুটে আসেন এবং হৃদয় নিংড়ানো ইবাদত করেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও আদর্শনীয় এবং বাঙালিদের জন্য আলোর দিশারী। আল্লাহ্ তা'লা দরবেশ তৈয়ব আলীকে কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন। (চলবে)

নবীনদের পাতা-

স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল কিছু ঘটনা

সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত, চট্টগ্রাম

আজ আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমার ছোট বেলার কিছু স্মৃতি ও ঘটনা বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মৌলভী পাড়ায় বাংলাদেশের প্রথম মসজিদ 'মসজিদুল মাহ্‌দীতে' জুমুআর নামায, জলসা সহ সব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু মহিলাদের জুমুআর নামাযের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার আব্বার চেষ্টায় মসজিদের পেছনের দিকে পর্দা টাঙ্গিয়ে মহিলাদের জন্য জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর মসজিদের বারান্দা নির্মাণ করা হয়। এই বারান্দা আগে ছিল না। জলসা মসজিদের সামনে খোলা-প্রাঙ্গনে সামিয়ানা টানিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। রান্না খাওয়া দাওয়ার জন্য পাশের নওয়াব মিয়া সাহেবের বাড়ির আঙ্গিনা ব্যবহার করা হতো। মহিলারা আমাদের বাসায় জলসা শুনতে আসতেন। দুই ঈদের নামায হতো লোকনাথ দিঘীর পাড়ে, একটি টেনিস খেলার কোর্ট ছিল সেখানে। মহিলাদের জন্য পর্দা ঘিরে নামাযের ব্যবস্থা করা হতো।

১৯৬৩ সনে খোদ্দামদের ইজতেমা শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সালানা জলসা লোকনাথ দিঘীর পাড়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। মাগরিবের নামাযের পর জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাই স্কুলের কয়েকটি ক্লাস রুম মহিলাদের জলসা শুনার ও বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। যা জলসা গাহের পার্শ্বে অবস্থিত। কিন্তু সন্ধার আগ থেকেই কানাগুসা হতে লাগলো গোলমাল হতে পারে। আব্বা মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব–তখন এস.ডি.ও সাহেবের কাছে গেলেন, নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা করতে।

স্কুলরুমে কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও ছিলাম। খোদ্দামরা এসে বললো এখানে থাকা ঠিক হবে না। তারা তখন জনাব গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবের একজন বন্ধু জনাব আবদুর রউফ উকিল সাহেবের বাসায় আমাদেরকে রেখে আসলো। এর মধ্যেই মারামারি শুরু হয়ে গেল। পুলিশ আসার পর অবস্থা শান্ত হলে আমরা বাসায় ফিরে আসি। যখন জলসা গাহে তান্ডব চলছে, তখন কিছু লোক 'মসজিদুল মাহ্‌দীতে' আগুন দিতে আসে, কিন্তু হঠাৎ আচমকা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এত জোরে বাতাস যে তারা ভয় পেয়ে কেরোসিন, খর সব ফেলে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্ এভাবেই মসজিদুল মাহদীকে রক্ষা করলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল আহত লোকে ভরে গেল। রাতেই ওসমান গনি শহীদ হলেন। পরদিন আবদুর রহিম শহীদ হলেন। তাদের জানাযা মসজিদুল মাহ্‌দী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। শহরে রাতেই ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। আহমদীরা মার খেলো। উল্টা আহমদীদেরকেই আসামী করে মামলা করা হলো। এই ঘটনার পর যারা আগে জামাতে আসতো না তারাও জামা'তে আসা শুরু করলো, জুমুআ মসজিদ সহ সামনের মাঠ ও নামাযিতে ভরে যেত।

আমার ছোট ভাই সৈয়দ সরফরাজ আহমদ তখন ছোট চার বছর বয়স হবে। তার আযান শুনে সদর মুরব্বী জনাব ফারুক আহমদ সাহেব এত খুশী হয়েছিলেন যে ওকে মিষ্টি এনে খাইয়েছিলেন, খুব আদরও করেছিলেন! মাঝে মাঝে খোদ্দামরা এসে ওয়াকারে আমল করে মসজিদ পরিষ্কার করতো। ফরিদ মিয়া সাহেব, ইদ্রিস মিয়া সাহেব সহ অনেকেই আব্বার কাছে সব সময় আসতেন অন্য সবার নাম এখন আর আমার মনে নাই। রাবওয়া থেকে প্রায়ই মেহমানরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসতেন। একবার কোন এক জলসায় খলীফা রাবে' খলীফা হবার আগে তাঁর বিবি সহ এসেছিলেন। তাঁর বিবি আমাদের বাসায় রাতে ছিলেন। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে।

একবার তাহরীক হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ পাকা করা হবে–তখন পাকিস্তান আমল, অনেক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ঢাকায় থাকতেন। তারা অনেক টাকা চাঁদা দিলেন–মসজিদ তৈরী হলো। তাদেরকে দাওয়াত করা হলো, কয়েকজন আসলেন, রেলষ্টেশন থেকে প্রথমেই দাদা মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কবর জেয়ারত করতে আসেন।

আহমদী পাড়ায় যে মসজিদ পাকা করা হয়েছিল সে মসজিদ পরে বিরুদ্ধবাদীরা দখল করে নেয়– যা এখনও আহমদীরা ফিরে পায় নি। মসজিদু মাহদীর পাশেই আমাদের বসত বাড়ী। যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। আমরা পায়ে হেটেই স্কুল, কলেজে যাওয়া আসা করতে পারতাম। আগে মৌখিক ভাবে বসত বাড়ী জামা'তকে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯৯৮ইং সনে রেজিষ্ট্রি করে আমরা তিন ভাই, তিন বোন জামা'তকে দিয়ে দিয়েছি। তখন কিন্তু আমাদের ভাই-বোন কারোরই নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না। ভাড়া বাসায় অথবা চাকুরী সূত্রে সরকারী বাসায় থাকতাম।

আমার বড় ভাই জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেব সম্প্রতি ২১ অক্টোবর ২০১৪ইং সনে ৭২ বছর বয়সে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ভাই কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খলীফা সানী ভাই-এর নাম রেখেছিলেন। বড় ভাই হিসাবে আমাদেরকে খুব আদর করতেন। সব সময় ভালো উপদেশ দিতেন। সিরাজী সাহেব মারা যাবার পর আমার প্রতি আরও বেশী খেয়াল রাখতেন। প্রায় সময়ই বাসায় এসে সাহস দিতেন। ভাই আমাদের অনেক বড় ছায়া ছিলেন। তাকে হারিয়ে, আজ আমরা অনেকেই অসহায়।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব।"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

জলসায় যোগদানের ফলে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দু'টিই অর্জন হয়

মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বল যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান"? (সূরা আয্-যুমার: ১০)। "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানদারদের মধ্য থেকে) যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন" (সূরা আল-মুজাদিলা: ১২)। এখানে আল্লাহ্ তা'লা দু'টি কথা বলেছেন প্রথমটি হলো "যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয়, দ্বিতীয়টি হলো-যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদের মর্যাদা তিনি বৃদ্ধি করেছেন"।

এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত, জ্ঞানের অনেক কিছু থেকে আমরা দূরে সরে আছি। যার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হিসাবে পরিচিত হতে পারি না। আমরা যারা জানি না তারা জানা লোকদের থেকে পৃথক রয়েছি আর এই পার্থক্য শুধু ইহকালেই নয় বরং পরকালেও রয়েছে।

তাই আমাদের উচিত, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাজ থেকে অজানা বিষয়গুলোকে জানা। আমরা যদি নিজেরা জ্ঞানী হতে পারি তাহলে আল্লাহ্‌র নিকটও সম্মানিত বলে পরিচিত হবো। আমরা যেন ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি তার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় যা বাৎসরিক 'জলসা' নামে পরিচিত। এই জলসায় বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা অতি মূল্যবান সম্পদ বিতরণ করেন যা কোন অর্থ দিয়ে লাভ করা যায় না। শুধুমাত্র নিষ্ঠার সাথে শ্রবণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। যারা জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর হতে বের হয় তাদের সম্বন্ধে মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইল্ম (জ্ঞান) হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়ে) আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করে।" (তিরমিযী)।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যারা জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের জন্য কত বড় পুরস্কার রেখেছেন মহান আল্লাহ্ তা'লা, তিনি তাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। এত বড় পুরস্কার রাখা সত্ত্বেও কেন আমরা জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঘর হতে বের হবো না, আমরা কি জান্নাতের রাস্তা সহজ সরল করতে আগ্রহী নই। যদি আমরা জান্নাতের রাস্তা সহজ করতে চাই তা হলে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর প্রকৃত যে ইসলামের জ্ঞান তা একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এই সত্য জামা'তের লোকেরা বৎসরে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন, যা থেকে পুরো বৎসরের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খাদ্য লোকেরা নিতে পারে। যারা আসেন তারা অবশ্যই কিছু না কিছু জ্ঞানের খাদ্য নিয়ে যান, কেউ খালি হাতে ফিরে যান না।

জলসায় আগমনের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন : "এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামা'তের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করে, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেয়" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪)।

"যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করে।"

তাই আসুন, আমরা সবাই জামা'তে আহমদীয়ার জলসায় যোগদান করে–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ায় সামিল হই এবং জ্ঞান অর্জন করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক দুটোই বৃদ্ধি করুক ও জলসা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হোক, সেই সাথে যারা এতে যোগদান করছেন তারা সবাই নিরাপদে যোগদান শেষে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আল্লাহ্‌পাক করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব

ধর্মীয়-অনুষ্ঠান অর্থাৎ সত্যান্বেষীগণের সম্মেলন। ধর্মীয় যে কোন অনুষ্ঠানই সাধারণ কোন অনুষ্ঠান নয়। কোন পিকনিকও নয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই এর মূল লক্ষ্য। মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, "কুনু মা' আস্-সাদেকীন" অর্থাৎ "তোমরা সত্যবাদীগণের সাহচর্য অবলম্বন করো।"

মূলতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে এ অমোঘ আদেশটির সফল বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। এমন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধার্মিক জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। তাঁরা এমন মাহত্মপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করেন, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে বুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। উপস্থিত বুযুর্গদের নসিহতমূলক মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্যও পাওয়া যায়।

জ্ঞানী গুণী জনের মূল্যবান দরস শুনে "ধর্মে বুৎপত্তি লাভ হয়।" প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কামেলের মধ্যে বান্দার মনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্যময় আবেগ তৈরী করে আধ্যাত্মিক প্রেরণার উন্মেষ ঘটায় এবং বান্দার আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষ সাধন হয়। এতে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার ফলে উপস্থিত মু'মিনগণ তাঁদের আত্মাকে পরিশোধিত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেদের উৎসর্গিত করে তোলে। নৈতিকতার উন্নতির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান খুবই বরকতময় ও কল্যাণকর। কল্যাণ মন্ডিত ও সৌভাগ্যবান তারাই যারা এ হ'তে উপকৃত হয়।

"আল্লাহ্‌র হক" ও "বান্দার হক"-আল্লাহ্‌র নির্দেশিত প্রধান এই দু'টি দায়িত্ব আমাদের পূর্ণভাবে পালন করা আবশ্যক। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। মানবজীবনের চরম লক্ষ হাসিলের জন্য একমাত্র পথই হলো ইসলামে প্রবেশ। ইসলামের পবিত্র কলেমায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে বয়আতকারীগণ ইসলামের পবিত্র সেবাকার্যে দ্রুত নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটি আরো সহজ হয়। অনেক ইব্রাহীম তৈরী করাই ইসলামের উদ্দেশ্য এবং এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত ইব্রাহীম (আ.) ও বিবি হাজেরার মত হবার! ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই এই সকল সম্মেলন করা হয়ে থাকে।

যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে সব রকমের কষ্ট বরদাশত করে এমন অনুষ্ঠানে শামেল হন, মহান আল্লাহ্ পাক তাদের তো উত্তম পুরস্কার দান করেনই আর তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই পুণ্য দান করেন। আর তাদের কোন পরিশ্রম ও দুঃখ কষ্ট বিফলে যেতে দেন না। এ সকল সম্মেলনে বহুবিধ কল্যাণজনক উপাদান নিহিত।

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর।" (৪৯ঃ১১) হাদীসে আছে, মু'মিন একজন অপরজনের জন্য আয়না স্বরূপ"। মু'মিনদের সাহচর্য লাভ করার এরূপ সুবর্ণ সুযোগ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। দেখা সাক্ষাতের ফলে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই ইসলামের মূল শক্তি নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের মহা আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা জাতি-বর্ণ কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখা মানে না, ইহা বিশ্বজনীন ইসলামী-ভ্রাতৃত্ব।

এই অনুপম ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ফলে যাবতীয় আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে যায়। ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান, সকলেই এর অবিচ্ছেদ্য-অঙ্গ। অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের প্রতিটি মুহূর্ত যেন সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় হয় এবং পরস্পর সদ্ব্যবহারের কল্যাণ একে অপরের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টিকারীতে পরিণত হবে। আল্লাহ্‌র শান্তির বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া সমাজের ওপর বড় অনুগ্রহ হবে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্ পাক প্রেরিত মহাপুরুষগণের মধ্যে কোন পার্থক্য না করার, কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া যা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে যে অবক্ষয় সেগুলো থেকে পরিত্রাণ দেয়া। বান্দাকে নেক করে তোলে। যে বান্দা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করে দেয়–নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এরূপ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

আল্লাহ্ ওয়ালাদের সান্নিধ্য বান্দাদের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আনে। খাঁটি আল্লাহ্ ওয়ালাদের সাহচর্যে এসে অনেক নগন্য ব্যক্তিও আল্লাহ্ ওয়ালা হয়, সামান্য বীজ ক্ষেত-ক্ষামারে এসে পরবর্তীতে ফসলের স্তুপ হয়ে যায়। তাঁর সাহচর্যে স্বল্প জ্ঞানের মানুষ বড় জ্ঞানী হয়। যেমন–লোহা আগুনের সংস্পর্শে এসে আগুনের রূপ ধারণ করে তেমনি মু'মিনের সান্নিধ্য মানুষকে মু'মিন হতে সাহায্য করে। হুদায়বিয়ার-সন্ধির পরে খালিদ-বিন-ওলীদ ও মুয়াবিয়ার ন্যায় আরো প্রায় দশ সহস্র লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এতো নেক-সান্নিধ্যেরই ফলাফল!!

হাদীসে আছে, "তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে তোমার হাসি তোমার জন্য সদকা তথা পুণ্যস্বরূপ। তেমনি সৎকাজের আহ্বান ও অসঙ্গত কাজ হ'তে বারণ করা তোমার জন্য পুণ্যস্বরূপ, তোমার প্রাপ্য বা ন্যায্য অধিকার হ'তে কিছু তোমার ভাইকে দান করা তোমার জন্য সদকা স্বরূপ।" হাদীসে আছে "আল্লাহ্‌র কিছু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে তাঁর যিক্‌র করা হয়, ঐ সকল মজলিসের যে-ই বসুক না কেন সে-ও ঐ সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না" (মুসলিম)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ধর্মীয়-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়ার এক ভান্ডার রেখে গেছেন এতে যোগদানের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। যোগদানকারীদের মনোবাঞ্ছা যেন আল্লাহ্ পাক পূরণ করেন এবং ইসলামের বিজয় দেন। এ সকল কথা আমাদের প্রত্যেকেরই আমল করতে হবে, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

ইসলামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব অতিব্যাপক

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আগামী ৬,৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দোয়া করি এ জলসা যেন আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে মঙ্গলময় করেন। এছাড়া যারা এতে যোগদান করছেন তাদের সবাইকে যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিরাপত্তার চাঁদরে আবৃত করে রাখেন সেই সাথে বাংলাদেশকে যেন আল্লাহ্ শান্তিময় করেন।

হাদীসে উল্লেখ আছে, যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের লক্ষে বাহির হয় এবং পথে মৃত্যু বরণ করে তারাও শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রতি বছর ধর্মীয় জলসার আয়োজন করে থাকে। সারা বিশ্বে এই জলসা পরিপূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সরাসরি জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে এ জলসায়। যোগদানকারীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আর সাক্ষাৎ লাভে ভাইদের পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এ জামা'তে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন-এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না এটা ঐ বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে।

কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না। (মজমুয়া ইশ্‌তিহারত, ১ম খণ্ড) মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে ধর্মীয় এই জলসায় অংশগ্রহণ করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়ীয়া, নাটোর

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

" আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩শে মার্চ-এর গুরুত্ব ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ই মার্চ, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। আমাদের মাতৃভাষা ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৬তম স্থানীয় সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ১৬-১৭ জানুয়ারী ২০১৫ইং তারিখ রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৬তম স্থানীয় সালানা জলসা আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ)।

১৬ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমুআ মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ, নযম উর্দূ ও বাংলা পরিবেশন করেন যথাক্রমে জনাব মুফতি মাহমুদ মৌসাদ ও জনাব সোলায়মান আহমদ। অতপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের পর 'মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও দোয়ার কবুলিয়াত' এর ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াত ইলাল্লাহ' এর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর অধ্যক্ষ জনাব প্রদীপ্ত খিসা। ঐ দিন বাদ মাগরীব মোবাল্লেগ ইনচার্জ মোহতরম মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরীর পরিচালনায় আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত একটি তবলিগ সেমিনার হয়, প্রশ্নোত্তর সেশনটি এতই আকর্ষণীয় ছিলো যে, হুযূর (আই.)-এর খুতবা শ্রবণের পরও রাত ১১টা পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। এতে মসজিদে ৭৭ জন জেরে তবলিগসহ ৩০০জন সদস্য এবং এমটিএ সংযোগের মাধ্যমে ৫০ জন অ-আহমদী মহিলাসহ প্রায় ৫০০ লাজনা প্রশ্নোত্তর সেশন উপভোগ করেন। আল্লাহর ফজলে সেমিনারে ০২ জন বয়আত গ্রহণ করেন ।

১৭ জানুয়ারী সকাল ৯.৩০মি. এ দ্বিতীয় সেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন-এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. এস এম আবু তাহের। নযম উর্দূ ও বাংলা পেশ করেন যথাক্রমে জনাব কাউসার আহমদ মঞ্জুর এবং জনাব আতায়ে রাব্বি। 'কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য' এর ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ, 'খেলাফতের কল্যান'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ, 'হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার আলোকে বয়আতের তাৎপর্য' এর ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ।

বিকাল ২.৩০মি.-এ তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

তেলাওয়াতে কুরআন পরিবেশন করেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। নযম উর্দূ ও বাংলা পেশ করেন যথাক্রমে জনাব রায়হান আহমদ রুদ্র এবং জনাব নুরুদ্দিন আহমদ। বক্তৃতা পর্বে 'একামতে সালাত' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, 'ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য' বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির অফিসার জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার।

সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২দিন ব্যাপী সালানা জলসা সফল সমাপ্ত হয়। দেশের বিরাজমান বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন জামা'ত হতে ১২২৭জন পুরুষ জলসায় অংশগ্রহণ করে, তন্মধ্যে অ-আহমদী মেহমান ছিলেন ৭৭জন।

এছাড়া এমটিএ সংযোগের মাধ্যমে ৮০টি আহমদী পরিবারে প্রায় ৫০০জন লাজনা ও ৫০জন অ-আহমদী মহিলা জলসা সরাসরি উপভোগ করেন। জলসা বাস্তবায়নে জলসার দশ দিন পূর্ব হতে জলসা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত জামা'তের ১০০জন কর্মী নিরলস পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ্ সবাইকে ঐশী চাদরে আবৃত রাখুন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ২০১৫ সালকে বরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে তাহাজ্জুদ নামায এর মাধ্যমে ২০১৫ সালকে বরণ করা হয়। স্থানীয় জামা'তের সদস্যগণ উৎসাহের সাথে তাহাজ্জুদ নামাযে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত নামাযীর সংখ্যা ৫৮ জন। খোদ্দাম ১৭ জন, আতফাল ১১ জন, আনসার ১২ জন, লাজনা ১৬ জন, নাসেরাত ২ জন। নতুন বছর সবার জন্য বরকত ও কল্যাণময় হোক এ কামনা করি।

এস. এম. সেলিম

তেরগাতীর জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ১৬/১২/২০১৪ তারিখ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। এরপর বক্তৃতা পর্বে 'সাহাবীগণের রসূল প্রেম' এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ, 'সর্বোত্তম দাঈ ইলাল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ' এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরব্বী সিলসিলাহ। তারপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয়। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ ৮৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

খাকদানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ১৪/১১/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদানের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোতাহার মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবী (সা.) এর শানে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব শাহ আলম মৃধা।

বক্তৃতা পর্বে 'সালাত প্রতিষ্ঠায় হযরত নবী করীম (সা.)' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. আব্দুর রহমান। 'হযরত নবী করীম (সা.) এর জীবন হতে তালিম ও তরবীয়ত এবং আহমদী ভাই ও বোনদের দায়িত্ব' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আলী আহমদ মাষ্টার, প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণনগর জামা'ত। 'হযরত নবী করীম (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক' নিয়ে আলোচনা করেন জনাব জালাল আহমদ মাষ্টার। 'হযরত নবী করীম (সা.) এর উত্তম আদর্শ' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর সভাপতির মূল্যবান ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন আহমদী, ২ জন নওমোবাঈন এবং ১ জন অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

নূরনগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ৯ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী), নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ মাসরূর আহমদ (শাওন)। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুহাম্মদ সোহেল রানা, মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, মুহাম্মদ রাজিব হাসান, সাব্বির আহমদ খান, আহমদ সালমান ফার্সী ও মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন মোল্লা।

পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

নাখালপাড়া মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৯ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকার উদ্যোগে মসজিদ বায়তুল হাদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ভূইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সেক্রেটারী তবলীগ ঢাকা। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ জাকির হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন বিশেষ অতিথি। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব লিসান আহমদ। বক্তৃতা পর্বে 'মানবতা প্রতিষ্ঠাকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শিহাম জোহেব বাপী। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার। এরপর রসূল করীম (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শেষে আমি কেন আহমদী হলাম এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন নও মোবাঈন জনাব মোহাম্মদ জুলহাস বেপারী। অনুষ্ঠানে ৭০ জন আহমদীসহ ২০ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৯/১২/২০১৪ থেকে ১১/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাস প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে।

প্রথম দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন তালাত মেহতাব, হাদীস পাঠ করেন মিলা পাটোয়ারী, দোয়া পরিচালনা করেন বিলকিস তাহের। সহজ সরল জীবন যাপন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন বিলকিস তাহের, নযম পাঠ করেন ফায়জানা সুলতানা ইমা।

দ্বিতীয় দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা, হাদীস পাঠ করেন নিশাত জাহান, দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্টে, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর, নযম পাঠ করেন ফার্জানা শাওন। এরপর শিশুর তরবিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করেন আফরোজা মতিন।

তৃতীয় দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন স্নিগ্ধা রহমান, হাদীস পাঠ করেন নিলুফা ওয়াহাব, নযম পাঠ করেন তামান্না হাছিন ও নাফিজা সুলতানা। উক্ত ক্লাসে তিন দিনই দোয়া, উর্দু ও কুরআন ক্লাস নেয়া হয়, ক্লাস পরিচালনা করেন নাছিমা বশির, কুররাতুল আইন, বিলকিস তাহের, নাছিমা বশির, আফরোজা মতিন ও রিনাত ফৌজিয়া। ক্লাসে কুইজ, দোয়া, উর্দু ও কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন ১৩০ জন লাজনা নাসেরাত ও শিশুসহ উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

কবিরপুরে তবলিগী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জানুয়ারী, ২০১৫ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কবিরপুরের উদ্যোগে এক তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী রিশতানাতা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেব তার বক্তৃতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ হিজরীর শিরোভাগে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার বাটালার কাদিয়ান নামক গ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসাবে দাবি করেন এবং ২৩ মার্চ ঐশী নির্দেশেই যে বয়আত নেয়া আরম্ভ করেন তা আলোচনা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ১০জন আহমদী এবং ৮জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন ।

আবু বকর সিদ্দীক

ঢাকায় নও মোবাঈন সম্মেলন ২০১৫ উদযাপিত

গত ১৬/০১/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা-এর সভাপতিত্বে নও মোবাঈন সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইমদাদুর রহমান। অতঃপর ঢাকা আমীর উপস্থিত সকল নওমোবাঈন সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত ও নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এতে বয়আতের অঙ্গীকার ও খেলাফতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব এস. এম রহমতুল্লাহ্। নও মোবাঈনদের তরবিয়তের ওপর বক্তৃতা দেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন। বক্তৃতা শেষে নও মোবাঈনগণ তাদের বয়আতের বিভিন্ন নিদর্শনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। এরপর নও মোবাঈন ও জেরে তবলীগদের প্রশ্নোত্তরপর্ব এবং সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা। উক্ত সম্মেলনে ৩০ জন নও মোবাঈন ও ৫ জন জেরে তবলিগ উপস্থিত ছিলেন।

সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ শ্যামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/১১/২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ শ্যামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। উক্ত জলসায় কুরআন তেলাওয়াত করেন সালমা জাকির। নযম পাঠ করেন ঐশী ও মুন। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেন লাজনা প্রেসিডেন্ট জাহানারা আহমদ, লুৎফা আহমদ, সালমা জাকির, মমতাজ ইসলাম, মমতারা বেগম, মুসাররত নাজনীন আফরিন, ইয়াসমিন, সাবিহা শামীম। এরপার বাংলা নযম পাঠ করেন মনিরা বেগম।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে জনাব খলিলুর রহমান সীরাতুন নবী জলসা সম্পর্কে সকলকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। অতঃপর স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব এর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১৭ জন লাজনা, ৫ জন নাসেরাত, ৯ জন শিশুসহ ৩ জন অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ লুৎফা আহমদ

তেজগাঁও মজলিসে ৭ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪, ৭ দিন ব্যাপী আতফালদের নিয়ে তেজতুরী বাজারে তালিম তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেব ক্লাসের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত ক্লাসে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস, ইসলামী দোয়া, অর্থসহ নামায এবং দ্বিনী মালুমাত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর বাদ এশা স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ক্লাসের সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন এছাড়া স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেবও তরবিয়তী-মূলক বক্তব্য রাখেন। শেষে ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ক্লাসে ১১ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত ভাদুঘর হালকাকে নতুন মজলিস হিসাবে ঘোষণা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের উদ্যোগে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ভাদুঘরকে নতুন মজলিস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জনাব রুকনুজ্জামান মোহতামীম তাজনিদ সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম রাব্বি মোহতামীম উমরে তোলাবা, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার– নায়েব আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রিজিওনাল কায়েদ এর প্রতিনিধি জনাব এস এম এরফান, জেলা কায়েদ জনাব শেখ সাব্বির আহমদ, প্রেসিডেন্ট ভাদুঘর জনাব শেখ ফিরোজ মিয়া, জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর উপস্থিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এরপর সভাপতি সাহেব ১০৮তম মজলিস হিসাবে ভাদুঘর এর নাম ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে কায়েদ ভাদুঘর এর হাতে কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। সভাপতির সমাপনী ভাষণের পর নায়েব আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া দোয়া পরিচালনা করেন।

রায়হান আহমদ রুদ্র

১৭তম রংপুর বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৯/১২/২০১৪ তারিখ হতে ২৩/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত রংপুর বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী সম্মেলন আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সেখানে রংপুর বিভাগের ১৪টি জামা'ত হতে মোট ৭৬ জন ওয়াকফে নও, ৫৯ জন মাতা, ৩৮ জন পিতা উপস্থিত ছিলেন। তাদের পাঠ দানের জন্য বিভিন্ন জামা'ত হতে ৬ জন মোয়াল্লেম ও একজন সদর মুরব্বী নিয়োজিত ছিলেন।

সম্মানিত ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি পুরা ৫ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাসের নিগরানি করেন। একদিন বাজামাত তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা করা হয়।

এতে সকলে মসজিদে অবস্থান করে তাহাজ্জুদে শামিল হোন। পরিশেষে সকল ওয়াকফে নও এবং মাতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে মওলানা আব্দুল মতিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং সভাপতির নসীহত মূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি করা হয়।

আলহাজ্জ তাহের আহমদ

কৃতী ছাত্র/ ছাত্রী

* আমাদের মেয়ে মারিয়া ইসলাম প্রজ্ঞা, পিতা মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু, ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল (মুগদাপাড়া শাখা) থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ফাতেমা ইসলাম রোশনী

* আমাদের ছেলে মোবাশ্বের আহমদ জুমু'আ ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় শাকির মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় সিলেট থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মোয়াল্লেম

* আমাদের কনিষ্ট কন্যা ইসরাত জাহান ইতু সাতক্ষীরা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৪ সালের জে এস সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা তার ভবিষ্যতের সার্বিক সফলতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ মোবাশ্বের হোসেন

* আমাদের একমাত্র কন্যা আমাতুল মোসাব্বের ধরা (ওয়াকফে নও নং ৭২১৬ই), পিতা- কাজী মোবাশ্বের আহমদ, মাতা হাসিনা মোবাশ্বের, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা। ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, সে নারায়ণগঞ্জ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম মুন্সি আব্দুল খালেক সাহেব এর নাতনী। তার শারীরিক, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

কাজী মোবাশ্বের আহমদ

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বগুড়া ও কিশোরগঞ্জের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব খন্দকার আজমল হক সাহেবের স্ত্রী রওশন আরা বেগম গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে সকাল ৯টায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর শহরে মন্সিপাড়া আহমদ মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এ্যাডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশে আহমদীয়া বিস্তারে অন্যতম পুরোধা এবং রংপুর পৌরসভার প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান ও পঞ্চাশের দশকে রংপুরের পাবলিক প্রসিকিউটন (পিপি)।

মরহুমা জামা'তের সেবায় সারা জীবন একান্ত নিবেদিত ছিলেন। কুষ্টিয়ার নাসেরাবাদ ও কিশোরগঞ্জ মহিনন্দ (ডালিম গাজী) সহ বিভিন্ন জামা'ত সৃষ্টি কালের তীব্র মুখালেফাত চলাকালে মজলুম আহমদীদেরকে দোয়া, পরোপকার ও অতিথি পরায়ণতার দ্বারা বিশেষভাবে উপকার করেন। ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ ও সেবার মহান শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন। তিনি শিক্ষিকা ও সাহিত্যমনা ছিলেন। তিনি রংপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর অনেক লেখা মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর ছিল সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত পাঠাগার "কুরআন ও জীবন" গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি তাঁর স্বামীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি জামা'তের সব সদস্য ও সদস্যার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং সবসময় তবলীগ করতেন। নিষ্ঠা, জ্ঞান ও যোগ্যতার সাথে তিনি তাঁর সন্তানের প্রত্যেককে উচ্চ শিক্ষা দানের মাধ্যমে লালন পালন করেন। তাঁর বিশেষ গুণের মধ্যে আরেকটি ছিল তিনি কখনো কারো গীবত করতেন না এবং সকলকে গীবত করা থেকে বারণ করতেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দারুত তবলিগে জানাযা শেষে তাঁকে ঢাকার মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমার রূহের মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম দানের জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

কে, এম তাহ্‌মিদুল হাসান
মরহুমার ছোট ছেলে

বিভিন্ন স্থানে লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন চৌধুরী সাহেবের লিখিত 'মা আমার মা' বই-এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

রংপুর : গত ১৩/১২/২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ রংপুরের উদ্যোগে "মা আমার মা" পুস্তকের ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের দিন উক্ত পুস্তকের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০ জন। **-দিলরুবা জামান**

উথলি : গত ১৬/১/২০১৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ উথলির উদ্যোগে "মা আমার মা" পুস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সেলিনা আক্তার। শেষে উক্ত পুস্তকের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ১০ জন লাজনা বোন অংশ নেন। **-আমাতুল হাফিয শিথি**

তেজগাঁও : গত ২৬/১২/২০১৪ লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে "মা আমার মা" পুস্তকের ওপর স্থানীয় জামে মসজিদে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শারমিন আক্তার শিখা। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে আলোচনাপর্ব শুরু হয়। পুস্তকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এছাড়া স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব পুস্তকের মূল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। শেষে উক্ত পুস্তকের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ১০ জন লাজনা বোন অংশ নেন। দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। **-ফারহানা মাহমুদ তন্বী**

নারায়ণগঞ্জ : লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ বাদ জুমুআ 'মা আমার মা' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দিলরুবা বেগম মায়া-র সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আলোচনাপর্ব শুরু হয়। উক্ত পুস্তিকার ওপর পর্যাক্রমে লাজনা ইমাইল্লার সদস্যাগণ আলোচনা করেন। পুস্তিকার ওপর পরীক্ষায় অংগ্রহণ করেন মোট ২৫ জন লাজনা বোন। সেমিনার ও আলোচনায় ৩৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রীর বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তির ঘোষণা করা হয়। **-উম্মে কুলসুম চায়না**

শুভ বিবাহ

গত ১৯/০৯/২০১৪ তারিখ রুমানা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ শরীফ মিয়া, শালসিঁড়ি, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ মিন্টু, পিতা-মোহাম্মদ আবু তাহের, শালসিঁড়ি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২১৮/১৪

গত ১১/১০/২০১৪ তারিখ কামরুন নাহার (নিশি) পিতা-মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম টিটু, পিতা-মৃত আব্দুল হাই মুন্সি, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২১৯/১৪

গত ০৮/১০/২০১৪ তারিখ আরিফাতুস সুন্নাহ মিষ্টি, পিতা-আয়ুব আলী, কিসমত মেনানগর, রংপুর-এর সাথে জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, পিতা-মরহুম তারা মিয়া, শালসিঁড়ি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২০/১৪

গত ১৭/১০/২৪ তারিখ তারান্নুম রাহাত, পিতা-মাহবুবুর রহমান, ১২ বি, ৩/৬০-৩ মিরপুর, পল্লবী, ঢাকার সাথে মোহাম্মদ ফাহিম মিয়াজী, পিতা-জনাব জামাল মিয়াজী, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২১/১৪

গত ১২/১০/১৪ তারিখ তানিয়া আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক শাহ্, সৈয়দপুর, রাজশাহীর সাথে মোহাম্মদ রাসেল, পিতা-আফসার আলী, সহিনগর-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২২/১৪

গত ০৮/১০/১৪ তারিখ সাহিদা নুসরাত আফরীন, পিতা-সৈয়দ গোলাম সারোয়ার, চক বাজার, চট্টগ্রাম-এর সাথে জুলফিকার আহাসান সিকদার, পিতা-ইরফান উল্লাহ্ সিকদার, ১৮৮-০১৮৭ঃয উৎরাব, ঐড়ষষরং, ঘু ১১৪২৩, ট.ঝ.অ -এর সাথে ৳১০,০০০ মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৩/১৪

গত ০৩/০৫/২০১৩ তারিখ লিমা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, কাফুরিয়া, দস্তানাবাদ-এর সাথে মিলন মিয়া, পিতা-মৃত-হাবিবুর রহমান, নিউসোনাতলার বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৪/১৪

গত ১২/১০/২০১৪ তারিখ তাহেরা খাতুন, পিতা-শহীদুল ইসলাম মোড়ল, বড়ভেটখালী, সাতক্ষীরার সাথে ওয়াছিউদ্দিন, পিতা-ফরীদ উদ্দিন, ভেটখালী, সাতক্ষীরার বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৫/১৪

গত ৩১/১০/২০১৪ তারিখ শাহিদা আরবি আইভি, পিতা-শেখ জাকির হোসাইন, পলাশপোল, সাতক্ষীরার সাথে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পিতামৃত-আফেজউদ্দিন গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৬/১৪

গত ৩০/০৭/২০১৪ তারিখ পারভিন আকতার (হাসি), পিতা-আবুল হাসেম, লাঙ্গল জোরা, জামালপুর-এর সাথে মনির হোসেন, পিতা মৃত-বাদশা মিয়া, বানিয়াজান, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ১,২০,০০১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৭/১৪

গত ১৯/০৯/২০১৪ তারিখ রেশমা আক্তার, পিতা-হযরত আলী গাজি, কুলতলী, হরিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে আবু সাঈদ গাজি, পিতামৃত-কাউছার গাজি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৮/১৪

গত ১০/১০/২০১৪ তারিখ জেসমিন পারভীন, পিতা-ইয়াসীন আলী, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরার সাথে এস এম পারভেজ আহমদ, পিতা- এস এম, এজাজ আহমদ, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২২৯/১৪

গত ১৫/০৮/২০১৪ তারিখ মিথিলা আফরিন, পিতা-মাহফুজুর রহমান, খড়মপুর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মতিউর রহমান, পিতা-খালিদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৪,৮০,০০১/- (চারলক্ষ আশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩০/১৪

গত ০৮/০৩/২০১৪ তারিখ বশীরা সুলতানা (আলো), পিতা-নুর মোহাম্মদ, কানাইনগর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে সাব্বির আহমদ (উজ্জল), পিতা-শেখ ছলিম মিঞা, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩১/১৪

গত ১৮/১১/২০১৪ তারিখ আমেনা বেগম, পিতা-আব্দুল হাই, মধুপুর, কাজীপুর, রংপুর-এর সাথে সালাহ্ উদ্দিন, পিতা-আমিরুল ইসলাম, গনেশপুর, রংপুর-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩২/১৪

গত ২১/১০/২০১৪ তারিখ সুবিয়া আহমদ, পিতা-গিয়াস উদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয় হালকা, চট্টগ্রাম-এর সাথে ফুয়াদ হোসেন, পিতা-জাহিদ হোসেন, ৩নং পাচলাইশ, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৭,০০,০০০/-(সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৩/১৪

গত ৩১/১০/২০১৪ তারিখ ইতি খাতুন, পিতা আব্দুস সালাম খান, সয়াধনগড়া, ভাসানী মোড়, সিরাজগঞ্জ-এর সাথে নাজিম উদ্দিন, পিতা-আব্দুর রশিদ আহমদ, উথলী, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৪/১৪

গত ১৪/১১/২০১৪ তারিখ শিরিনা আক্তার ইকরা, পিতামৃত-মনিরুজ্জামান (আহাদ), কানাইনগর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে সামসুর রহমান চৌধুরী, পিতা-মতিউর রহমান চৌধুরী, জামালপুর, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৫/১৪

গত ০৩/১১/২০১৪ তারিখ জান্নাতুন নুর (শিল্পী), পিতামৃত-আওলাদ মিয়া, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে সুমন মিয়া, পিতা-জিল্লুর রহমান, মৌরাইল (নগরবাড়ী), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৬/১৪

গত ২৯/০৯/২০১৪ তারিখ আখি পারভিন, পিতা-আব্দুল সামাদ মোড়ল, যতিন্দ্রনগর, সাতক্ষীরার সাথে আতাউল করিম, পিতা-মফিজুল ইসলাম, নাটোর-এর বিবাহ ২,৬০,০০০/- (দুইলক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৭/১৪

গত ০৮/১০/২০১৪ তারিখ শারমিন আকতার, পিতা-ইয়াদ আলী মোল্লা, জোরাসিং, খুলনার সাথে মোবারক আহমদ, পিতা-হোসেন আলী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৭০,০০১/- (সত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৮/১৪

গত ২১/১১/২০১৪ তারিখ আয়েশা হোসেন (আভা), পিতা-গোলাম হোসেন, ভাতগাঁও, দিনাজপুর-এর সাথে মওলানা মামুন উর রশিদ, পিতা-আব্দুর রশিদ, মাদারটেক, খিলগাঁও, ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৩৯/১৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৭ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন এর অনুবাদ হল, "নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও এ নবীর জন্য দোয়া করে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি অনেক দরূদ ও সালাম পাঠ করো।"

এরপর হুযূর বলেন, যেখানে খোদা ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা আমাদের প্রিয়নবী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ করেন, তাঁর জন্য শান্তি ও রহমত কামনা করেন সেখানে কিছু মানুষের অন্যায় আক্রমনে কীভাবে তাঁর সম্মান হানী হতে পারে?

হুযূর বলেন, সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি পত্রিকা অফিসে নামধারী মুসলমানরা আক্রমন চালিয়ে ১২জনকে হত্যা করেছে, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। কিন্তু বাক স্বাধীনতার নামে যারা অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে তাদেরও বিবেক খাটানো উচিত। বাক স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, আপনি অন্যের শ্রদ্ধাভাজনকে গালি দিবেন। কোন ধর্মের নেতাকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করার নাম বাক স্বাধীনতা নয়।

অপরদিকে মুসলমানদেরও বিবেক খাটানো উচিত। কোন মানুষের মুখের কথায় আমাদের নবীর সম্মান হানী হতে পারে না। কেননা, স্বয়ং আরশের খোদা আমাদের নবীর ওপর রহমত বর্ষন করেন। তাই কোথায় অন্যায় কিছু হতে দেখলে ভুল প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে খোদার নির্দেশ মোতাবেক রসূলের জন্য বেশি বেশি দরূদ পাঠ করুন। নতুবা যেমনটি আমি গত জুমুআয়ও বলেছি, আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল প্রতিক্রিয়া দেখালে নৈরাজ্যের এমন এক ধারা সূচিত হবে যে, তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। আর এখন এমনটিই হয়েছে, যারা এই পত্রিকার অন্যায় আচরণের কারণে এর বিরোধিতা করেছিল এখন তারাও মানবিক কারণে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। যে প্রত্রিকার প্রচার সংখ্যা হাজারের কোটায় ছিল এখন তাদের প্রচার সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ। তারা পুনরায় নবীকে অসম্মান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

এসব জাহেলদের ধর্মীয় চোখ অন্ধ, নবীতো দূরের কথা এরাতো আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যায় কথা বলতেও দ্বিধা করে না। কাজেই, এমন পরিস্থিতিতে অজ্ঞদের কথায় উত্তেজিত হয়ে হঠকারিতা প্রদর্শন করা মুসলমানদের উচিত নয়। মনে রাখবেন, সবাইকে একদিন খোদার কাছে ফিরে যেতে হবে আর খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে মন্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ করলে সেদিন তারা জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবে, এই পাপের শাস্তি তারা পাবে।

হুযূর বলেন, এই ঘটনা নিয়ে প্রচার মাধ্যমে অনেক মাতামাতি হচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের প্রতিও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। জামা'তের পক্ষ থেকে লেখা প্রবন্ধ এবং সাক্ষাতকার বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকা গুরুত্বের সঙ্গে জামা'তের বক্তব্য ছেপেছে এবং এর মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। আর এটিই মুসলমানের কাজ। অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্যায় নয় বরং আদর্শ দেখাতে হবে। এটি মহানবীরই শিক্ষা। তিনি এভাবেই মানুষের মন জয় করেছেন। আমাদেরও তাই করতে হবে।

হুযূর বলেন, যারা জ্ঞানী ও বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা এখনও পত্রিকার এই ন্যাক্কারজনক কাজের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন, এমনকি তাদের পোপ পর্যন্ত একে অন্যায় আখ্যায়িত করেছেন।

তাই মুসলমানদের উচিত ভুল ও আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে নবীর আদর্শ অনুসারে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং নিজ নিজ গন্ডিতে সত্যের প্রচার ও প্রসারে অগ্রগামী হওয়া।

এরপর হুযূর মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর রচনাবলী হতে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশ পাঠ করে দরূদ পাঠের গুরুত্ব এবং এর ফযিলত বর্ণনা করেন।

মহানবী (সা.) বলেন, "কিয়ামত দিবসে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করে।" তিনি আরো বলেন, "যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে খোদা তার ওপর দশগুণ বেশি কল্যাণ অবতীর্ণ করেন।"

হুযূর বলেন, তাঁর জন্যতো খোদা ও তাঁর ফিরিশতাদের দরূদ পাঠই যথেষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সোয়াবের আশায় দরূদ পাঠের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সুযোগ কাজে লাগানো আমাদের কর্তব্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন, মহানবীর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, খোদার দরবারে দোয়া গৃহীত হওয়া এবং ক্ষমা লাভের জন্য দরূদ পাঠ আবশ্যক। তাই মানুষ যেভাবে প্রিয়জনের কল্যাণ কামনা করে সেভাবে মহানবীর ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর জন্য দরূদ পাঠ করা আবশ্যক। কোনরূপ কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার উর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ আর নবীর ভালবাসায় বিভোর হয়ে দরূদ পাঠ করুন।

দরূপ পাঠের ফলে নবীর সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও শরীয়ত চিরস্থায়ী হবে অরুরূপভাবে দরূদপাঠকারীও খোদার ভালবাসা ও নবীর ভালবাসায় সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

হুযূর আহমদীদের বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার আহ্বান জানান। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৩ জানুয়ারি ২০১৫-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর বলেন, আজও আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাবো।

এরপর হুযূর একাধারে বেশ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠে। তিনি মহানবীর প্রেমে বিভোর ছিলেন। কেউ রসূলকে অসম্মান করলে তাঁর আত্মাভিমানে লাগতো, তিনি কখনোই তা সহ্য করতেন না। এমনকি পন্ডিত লেখারামের সালামের উত্তর পর্যন্ত তিনি দেননি। কেউ এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, লেখরামের কত বড় ধৃষ্টতা সে আমার মনিবকে গালী দেয় আবার আমাকে আসে সালাম করতে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন কিন্তু একবার তাঁর আদরের ছোট ছেলের মুখ থেকে অজ্ঞাতে রসূল সম্পর্কে কোন কথা বের হয়ে গেলে তিনি এতে খুবই অসন্তুষ্ট হন।

একবার লাহোরে আর্যসমাজীদের একটি জলসায় জামা'তের লোকদের নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তারা নিশ্চিত করে যে, রসূল (সা.)-কে অবমাননা করে তারা কোন কথা জলসায় বলবে না। কিন্তু জলসায় তারা মহানবীর অসম্মান করে। এটি জানতে পেরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ সানীকে বলেন, আপনাদের আত্মাভিমান কি করে আপনাদের সেখানে বসে থেকে রসূলকে গালী দেয়া হচ্ছে তা শোনার অনুমতি দিল। তিনি খুবই রাগ করেন ফলে মৌলভী নূরউদ্দিন সাহেব তাঁর কাছে ক্ষমা চান।

এরপর খৃষ্টান পাদ্রি আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে মোবাহেসার মূল কারণ ছিল রসূল প্রেম। সে মহানবী (সা.)-কে দাজ্জাল বলেছিল বিধায় তিনি তাকে মোবাহিলার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ তওবা বা অনুশোচনার কারণে নির্ধারিত ১৫ মাসের মধ্যে শাস্তি না পেলেও পরবর্তিতে অন্যায় থেকে বিরত না হওয়ার কারণে শেষ বিজ্ঞাপন দেয়ার ৭মাসের মধ্যেই সে ঐশী আযাবের শিকার হয়ে প্রাণ হারায়।

হুযূর বলেন, এরপরও আপত্তিকারীরা যদি বলে যে, মির্যা সাহেব নিজেকে রসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন তাহলে এটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা সম্পর্কেও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন। বিশেষভাবে ডাকখানার মোকদ্দমার উল্লেখ করে হুযূর বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সরলতা এবং সত্যবাদীতা দেখে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপেক্ষা করে বিচারক তাঁকে নির্দোষ হিসেবে মুক্তি দিয়েছেন।

হুযূর বলেন, এসব ঘটনা শুধু উপভোগ করার জন্য শোনা উচিত নয় বরং তিনি (আ.) আমাদের সামনে যে উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন তা নিজ নিজ বাস্তবায়ন আবশ্যক। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বসবাস করে যেসব আহমদীরা মিথ্যা বলে সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে তাদের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

হুযূর আরো বলেন, জুমুআর খুতবা নামাযেরই অংশ তাই এসময় কারো কথা বলার অনুমতি নেই। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ইমাম কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নতুবা মুক্তাদিরা কোন কথা বলবে না। একান্ত প্রয়োজনে ইশারা করা যেতে পারে। বিষয়টি আপনারা নিজ নিজ বাড়িতে সন্তানদের শেখাবেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তিনি মহানবীর প্রেমে বিভোর ছিলেন। কেউ রসূলকে অসম্মান করলে তাঁর আত্মাভিমানে লাগতো, তিনি কখনোই তা সহ্য করতেন না।

ঘানার ৮৩তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে জামা'তের রীতি অনুসারে ঘানার ৮৩তম বার্ষিক জলসা 'বাগে আহমদে' গত ৮ থেকে ১০ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় ত্রিশ হাজার আহমদী নারী-পুরুষ এতে যোগদান করেন। দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন গোত্রের চীফ মহোদয় এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও এতে যোগদান করেন।

এই জলসা একটি ঐতিহাসিক জলসা কেননা, ঘানার সাবেক আমীর মওলানা আব্দুল ওয়াহাব বিন আদম সাহেবের মৃত্যুর পর বর্তমান আমীর মওলানা মুহাম্মদ বিন সালেহ সাহেবের নেতৃত্বে এটিই প্রথম জলসা।

পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের পর স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন তারানা পরিবেশন করা হয়। এরপর ঘানার আমীর সাহেব জলসা উপলক্ষ্যে প্রেরিত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর আশিসপূর্ণ বাণী পাঠ করে শোনান। এতে হুযূর (আ.) মরহুম মওলানা আব্দুল ওয়াহাব বিন আদম সাহেবের স্মৃতিচারণ করে জামা'তে আহমদীয়া ঘানার সদস্যদের খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা, ধর্মসেবায় রত থাকা এবং নতুন আমীরের পুরো আনুগত্য এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি Mr. John Dramani Mahama জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঘানায় আহমদীয়া জামা'তের নিঃস্বার্থ সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আল্লাহ্‌র ফযলে তিনদিনের এই জলসা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ১০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্‌ তা'লা এই জলসার কল্যাণ পুরো বছরজুড়েই জামা'তের ওপর বর্ষণ করতে থাকুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

খোদ্দামুল আহমদীয়া, গাম্বিয়ার বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গাম্বিয়ার ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বানজুল থেকে প্রায় ১৭৫ কি:মি: দূরে তাহের আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল 'মানসা কোনকো'তে এর আয়োজন করা হয়। সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া, গাম্বীয়ার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে বিভিন্ন অ-আহমদী অতিথি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মধ্যে পাকি বাহ্‌'এর ইমাম সাহেব, জাতীয় সংসদ সদস্য Hon. Njie Darboe of Jarra West এবং গভর্নর LRR Salif Puye অন্যতম। এবার ইজমেতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল "মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে সৃষ্টির সেবা"। তাই মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের আলোকে সকল তরবীয়তি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। ইজতেমার মূল আকর্ষণ ছিল খোদ্দাম ও আতফালদের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা, এতে সবাই সানন্দে অংশ গ্রহণ করে। ইজতেমাতে অনেক আনসার সদস্যও যোগদান করেন তাই তাদের জন্য একটি মনোজ্ঞ মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার ব্যবস্থা করা হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বার্ষিক শূরা অনুষ্ঠিত হয় আর এতে বিভিন্ন মজলিস থেকে আগত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

ইজতেমার শেষ দিনটি ছিল কাদিয়ান জলসারও শেষ দিন ছিল এবং এ উপলক্ষে হুযূর আনোয়ার (আ.) লন্ডন হতে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন, এমটিএর কল্যাণে ইজতেমা গাহে উপস্থিত সবাই মনোযোগ দিয়ে হুযূরের মূল্যবান বক্তব্য শ্রবণ করেন।

ইজতেমার সংবাদ দেশের প্রচার মাধ্যম ফলাও করে প্রচার করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্যে হিউম্যানিটি ফার্স্টের উদ্যোগে ইবোলা ভাইরাস মোকাবিলায় তহবিল সংগ্রহ

একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা, যা বিশ্বজুড়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৪ সন থেকে সংস্থাটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণ সাহায্য দিয়ে আসছে। সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাস সংক্রামণের ফলে হাজারো মানুষের মৃত্যু ঘটেছে নিম্নমানের জীবনযাত্রা ও সুচিকিৎসার অভাবে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট এ মহামারী প্রতিরোধে বিভিন্ন অর্থ তহবিল সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ পুরোপুরি নিধনে তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি নৈশ্য ভোজের আয়োজন করা হয়। সিয়েরালিওনে ইবোলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রথমবার এ ধরনের উদ্যোগ নেয়। নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার পরামর্শে, এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ মাস ব্যাপী অর্থ সংগ্রহ কর্মকান্ডে এ অনুষ্ঠানে আগতদের কাছে ২৫ পাউন্ড মাথাপিছু টিকেট মূল্য ধার্য করা হয়। মোট ১ লক্ষ পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ অভিযানের অংশ হিসাবে ১০ হাজার পাউন্ড এ অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত হবে বলে আশা করা হয়।

আল্লাহ্‌ তা'লার রহমতে ৩৭০টিরও বেশি টিকেট বিক্রি হয় এবং সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাসহ মোট ৪২০ জন অতিথি এতে যোগদান করেন। সম্মানিত অতিথি বক্তাগণ হলেন, সাবেক এমপি লর্ড স্টিল যিনি লিবারেল পার্টির নেতা ও বর্তমানে আফ্রিকার সংসদীয় দলের প্রধান: স্বাস্থ্য মন্ত্রী নরমান ল্যাম্ব এমপি; যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত সিয়েরালিওনের রাষ্ট্রদূত ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত। একটি দাতব্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয় যাতে পণ্যসমূহ ছিল স্বণামধন্য প্রতিষ্ঠান-এস্টন মার্টিন, গ্রসভেনর হাউস, ক্লাইভ ক্রিশ্চিয়ান, জেগার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মিস্টার জন মুল্টনের দানকৃত।

১০ হাজার পাউন্ড টার্গেট থাকলেও এই অনুষ্ঠান থেকে ৩০ হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়। অত্যন্ত সফল এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ উদ্যোক্তা কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশ্বজুড়ে হিউম্যানিটি ফার্স্টের আন্তরিক প্রচেষ্টা চলমান।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا
وَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَیۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا
مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ
اَقۡدَامَنَا وَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَنَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا
اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 14 & 15 Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th February, 2015 Tk. 40.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, www.alislam.org, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com